NOT FOR SALE

কিশোর সাহিত্য সমগ্র

দ্বিতীয় খণ্ড

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

NOT FOR SALE

THIS COPY IS NOT FOR SALE.

©ASOKE CHATTERJEE

NOT FOR SALE

কিশোর সাহিত্য সমগ্র

(দ্বিতীয় খণ্ড)

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

শশধর প্রকাশনী

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

NOT FOR SALE

Kishore Sahitya Samagra
by Harinarayan Chattopadhyay
Price : Rs. 150.00

Published by :
Rama Bandyopadhyay
Sasadhar Prakashani
10/2B, Ramanath Mazumder Street
Kolkata-700 009

প্রকাশিকা :
রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০১৩

প্রচ্ছদ : সৌরিশ মিত্র

হরফবিন্যাস :
গঙ্গা মুদ্রণ
৫৪/১বি, শ্যামপুকুর স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৪

মুদ্রাকর :
গ্রাফিক্স রিপ্রোডাকশন
চিন্তামণি দাস লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

বিনিময় : ১৫০ টাকা মাত্র

আমা
করি সক
কেটে গে
রাত গভী
বাল্লার বা
মূর্তির ক
ও মিঠুর

বোল
বিভিন্ন উ
সেরকমই
নেয়। কি
কি করে

পাথ
ভদ্রলোকে
কাছে আ
লোকের
দিপালী

রামচ
চাঁদা আদ
গিয়ে সব
মারামারি
নয় গঙ্গায়

বন্ধুর
হল। তার
অনেক প
ভীষণ ভ
পুকুরের
পাওয়া য

NOT FOR SALE

ভূমিকা

আমার পিতা ৺হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কিশোর সাহিত্য সমগ্র প্রথম পাঠ আশা করি সকলের পড়া হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। গল্পগুলি আপনাদের মনের ভেতর দাগ কেটে গেছে। এটি দ্বিতীয় পাঠ। এতে আছে পাথরের চোখ, বোলতার হুল, রামযাত্রা, রাত গভীর, হলুদ আতঙ্ক, গ্রহ থেকে, শিকার, কৈলাস কাহিনী, জেলেপাড়া যাত্রাপার্টি, বাল্লার বাহাদুরী, পিকনিক, হীরুদার গোয়েন্দাগিরি, বাদশার কাণ্ড, সর্পিণী, অমানুষিক, মূর্তির কবলে, এ যুগের রূপকথা, বাঘ-বাঘিনী, মার্জার কাহিনী, সিংহ জাতক, উদ্বন্ধন ও মিঠুর কীর্তি। উপন্যাস ও গল্প নিয়ে বইটি সুন্দরভাবে সাজান হয়েছে।

বোলতার হুলে পারিজাত বক্সি একজন ডিটেক্‌টিভ। বোলতা একজন ক্রিমিনাল। বিভিন্ন উপায়ে সে চুরি করে বাড়ির লোকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করত। সেরকমই লালীকে কিডন্যাপ করে টাকার জন্য। বাড়ির লোকেরা পারিজাতের স্মরণ নেয়। কিন্তু তা জানতে পেরে বোলতা হুমকি দেয়। তারপর লালীকে পারিজাত বক্সি কি করে আবার তার আত্মীয়দের কাছে ফিরিয়ে দেয় তারই কাহিনী।

পাথরের চোখে বৈশাখী ব্যানার্জী একজন মহিলা ডিটেক্‌টিভ। একজন ভদ্রলোকের ব্রোঞ্জের তৈরী ময়ূরের চোখের দামী পাথর চুরি যাওয়ায় তিনি বৈশাখীর কাছে আসেন। ভদ্রলোকের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী দিপালী দেবী মঙ্ শান নামে এক দুষ্টু লোকের প্ররোচনায় কিভাবে ময়ূরের চোখের পাথর সরিয়ে ঝুটো কাঁচ বসিয়েছিলেন দিপালী দেবী, বৈশাখী কিভাবে তা বের করেছিলেন তারই রহস্য কাহিনী।

রামযাত্রা হাসির গল্প। তিলক রামযাত্রা নাটকে পয়সা তুলতে পাড়ায় বাড়ি বাড়ি চাঁদা আদায় করে। নাটকের দিন পাড়ার ছেলে বৌদের ভিড় হয়। কিন্তু রামায়ণ করতে গিয়ে সকলে নিজের পাট ভুলে যাতা নাটক করে। শেষ পর্যন্ত মন্থরা ও ভরতের মধ্যে মারামারি শুরু হয়। লোকেরা এসে ভরতকে ছাড়ায়। সেজন্য সকলে বলে এ রামযাত্রা নয় গঙ্গাযাত্রা।

বন্ধুর বোনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে খাওয়া শেষে পরিবেশনের কাজে হাত লাগাতে হল। তারপর বাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়ান। একদিকে বৃষ্টি তার ওপর যানবাহন নেই। অনেক পরে একটা বাস দেখে উঠে পড়লাম। কিন্তু বাসে কেউ জীবন্ত মানুষ নেই। ভীষণ ভয় পেলাম। বিদ্যুৎগতিতে ছিটকে বাইরে পড়লাম। জ্ঞান হতে দেখলাম পুকুরের পাড়ে শুয়ে। রাত গভীর গল্পে বাসে ভূতেদের সঙ্গে ভয়ংকর গল্প দেখতে পাওয়া যাবে।

NOT FOR SALE

হলুদ আতঙ্ক নামটা শুনে নিশ্চয় সকলে বুজেছেন বাঘই হবে। ঠিকই ধরেছেন। মধু আনবার জন্য পাঁচু এবং গ্রামের কয়েকজন মিলে জঙ্গলে গিয়েছিল। হরিণ শিকার করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বাঘের কবলে পড়ে মরতে হয়েছিল। তার ছেলে চেতন মধু আনতে নয়, বাঘের বদলা নেবার জন্য আবার জঙ্গলে গিয়েছিল, হ্যাঁ শেষ পর্যন্ত বাঘকে মেরে নৌকায় করে বাড়ি ফিরেছিল অবশ্য তার বদলে তার সারা অঙ্গে আঁচড় দিয়েছিল বাঘে।

গ্রহ থেকে গল্পে টুনুর বাবা ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে শহরে গোলমালের জন্য তাকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে জমাট বাঁধা ঘুপসি আস্তানায় তার ভয় করতে লাগল। টুনু একদিন একটা আবিষ্কারের গল্প পেয়ে মামাকে ডাকল বাইরে দেখবার জন্য। কিন্তু জোনাকির আলো ছাড়া তিনি কিছু দেখতে পেলেন না। সে মামাকে বলল অন্য গ্রহ থেকে বেঁটে মানুষরা এখানে এসেছে। মামা হেসে বললেন ঐ দিকটা জলা, মিথেন গ্যাস জ্বলে ঐ রকম দেখায়। এ কথা শুনে টুনু হতাশায় ভেঙে পড়ে।

লোকনাথ বাবু অম্বল সারাতে মহিমপুর যান। সেখানের জল হাওয়ায় সত্যি অম্বল সেরে গেল। ওখানকার জমিদারের সঙ্গে তার আলাপ হয় এবং তাকে শিকারে তার সঙ্গে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। মাচা বেঁধে তারা ওপরে ওঠে। কিন্তু চিতাবাঘ লাফ মারায় জমিদার কোনরকমে ডাল আঁকড়ে ধরে কিন্তু লোকনাথ ঝুলতে থাকে। বাঘ লোকনাথের মুখের কাছে আসতে পকেটে নস্যির কৌটো খুলে বাঘের মুখে চোখে লাগে। কিন্তু মুখটা চাটতে গিয়েই সেই চোঁয়া ঢেঁকুরের গন্ধে বাঘ দৌড় লাগাল। এত কষ্টে সারানো চোঁয়া ঢেকুর বাঘ চেটে সর্বনাশ করল। কিন্তু সেই ঢেকুর দুজনের প্রাণ বাঁচাল। সত্যি খুবই হাসির গল্প। এমন কখনও হয়?

কৈলাস কাহিনী একটি হাসির গল্প। শিবের পেটের যন্ত্রণা সারাতে অনেক ডাক্তার এল, কিন্তু কেন ব্যথা, শিব ধুতুরা ভেবে দুর্গার সিঁদুর কৌটো খেয়ে ফেলেছিলেন। ডাক্তার টাকার বদলে শিবের বাঘছালটা নিয়েছিলেন। কোন মানুষের মনে হয় এ ধরনের পেটে ব্যথা হয় না।

জেলেপাড়া যাত্রাপার্টির গল্পে পাড়ার ছেলেদের পরীক্ষা শেষে তারা যাত্রা করবে ঠিক করল। কিন্তু তারা যা যাত্রা দেখাল দর্শকদের, মনে হয় তাদের দীর্ঘদিন মনে থাকবে।

পিকনিক গল্পে সব বোনরা মিলে ঠিক করল পিকনিক করতে যাবে। বাড়ির পাশে ফাঁকা জায়গায় ঠিক হল। নাচ গানে পিকনিক মুখর। কিন্তু তারা কি অত কষ্টের

NOT FOR SALE

পিকনিক সফল হয়েছিল? ভাতের ভিতর থেকে কোলা ব্যাঙ, চালতা গাছ থেকে পড়ে যাওয়া। দই আর মিহিদানা সারা অঙ্গে। পিকনিকের বহর দেখে বাড়ির লোকেরা তাদের বাড়ি এসে খেতে বলে।

বাদশার কাণ্ড গল্পে বাদশার বাবা ছিলেন ডাক্তার। বাবার অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে বাদশা ডাক্তারি শুরু করেছিল। রুগীর সঙ্গে যখন তার বাবা কথা বলতেন, তখন থেকেই মন দিয়ে সে শুনত। একজন মহিলাকে কাচের গুঁড়ো, সাবু ও মুরগির ডিম সহযোগে ওষুধ করে তাকে দিয়েছিল। মালিশ করে অসুখ সেরে গিয়েছিল। সেজন্য সে বাবার হাঁপানীর অসুখ পেয়ে দৌড়তে লাগল।

সর্পিণী গল্পে নানারকম সর্পের মন্তব্য হতে হতে শেষে মিলি এবং পিসতুত বোন সীমার মধ্যে প্রায় ছোবল দেবার মত হতে মিলির পিসি দুই সাপিণীকে ছাড়িয়েছিলেন।

অমানুষিক গল্পে হৈমন্তী একজন নারী গোয়েন্দা, তেজেশবাবুর খুনের তদারক করতে তাঁর বাড়ি গিয়েছিলেন। হৈমন্তীর মনে হয়েছিল ভেন্টিলেটার দিয়ে কোন জন্তুকে নামান হয়েছিল। এবং খবর নিয়ে রূপচাঁদের দোকানে গিয়েছিল যে এসব বিক্রী করে। তার কাছ থেকে জানা গেল রূপচাঁদ ও তেজেশ গ্যাংটক বেড়াতে গিয়ে অনেক স্বর্ণমুদ্রার সন্ধান পায়। হোটেলে যখন রূপচাঁদ ঘুমোচ্ছিল সেই সময় তেজেশ লাঠি দিয়ে আঘাত করে স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে কলকাতা পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর অভ্রের ব্যবসা করছিল। সে ভেবেছিল বন্ধু বেঁচে নেই। কিন্তু বছর দুয়েক আগে সে রূপচাঁদের মুখোমুখি হয়েছিল। রূপচাঁদ চিনতে পেরেছিল এবং তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছিল একটি বানরের সাহায্যে।

মূর্তির কবলে যারা পড়েছিল সবাই শেষ হয়ে গিয়েছিল, পুলিশও কিছু করতে পারেনি কারণ এ মীমাংসা পুলিশের দ্বারা সম্ভব হয়নি আর পুলিশও এ সব ব্যাপার সত্য বলে মানে না।

রূপকথা গল্পে নয়নপুরের এক প্রজা কলমী শাক তুলতে অন্য দেশে এসে পড়ে। সেখানে রাজা তাকে গুপ্তচর বলে ধরে। তখন প্রজা জানায় তাদের রাজ্যে কলমী শাক শেষ হবার জন্য এ দেশে আসে। কারণ আমাদের রানীর মাথা গরম, ডাক্তার কলমী শাকের ঝোল খেতে বলেছে। রাজা তাকে শাস্তিস্বরূপ রাজার ঘরের কাজ করতে বলে এবং উকুন বাছার কাজ সে পায়।

বাঘ-বাঘিনী গল্পে লেখক ও হাবু সান্যাল শিকারে গিয়েছিল। গাছের উপর মাচা তৈরি করে তার ওপর বসেছিল। হঠাৎ বাঘের আক্রমণ হওয়ায় তাকে হাবু সান্যাল

NOT FOR SALE

বন্দুক ছোঁড়ে। একটা চোখ অন্ধ হয় বাঘের, কিন্তু হাবু সান্যাল ভয়ে একটা গাছে আটকে যায়। অনেক কষ্টে তাকে নামান হয়, বাঘটা মারা যায়। আদিবাসীরা বাঘটা বয়ে নিয়ে আসে। বাঘের চামড়া ও নগদ পঞ্চাশ টাকা তাকে দেবার মনস্ত হয়, সকলে বলে আর ক'দিন থেকে বাঘিনীকেও মেরে যান। কিন্তু তার দরকার হল না; এক বন্ধু খবর আনল বাঘিনীর দেহ ওই ঝরনায় ভাসছে। স্বামীর বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে সে দেহত্যাগ করেছে বলে তার মাথায় সিঁদুর দেওয়া হল।

মার্জার কাহিনী গল্পে ত্রিলোচনবাবু বেড়ালের উৎপাতের জন্য বাজারের থলে করে বেড়াল ফেলতে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার বাড়ি ফেরার সময় একটার জায়গায় সাত আটটা বেড়াল বাড়ি ঢুকল। যা দেখে ত্রিলোচনবাবু রাস্তার উপর ছিটকে পড়লেন।

সিংহ জাতক গল্পে বিখ্যাত শিকারী সঞ্জয় ঘোষাল বলতেন সিংহ শিকার করা সবচেয়ে সোজা। তবে শিকার তিনি যে করতে পারেননি তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল কাগজের পাতায়। তাকে একটা বাদ্যযন্ত্রের দোকানে বসে থাকতে দেখা গিয়েছিল।

উদ্বন্ধন গল্পে মহেশ চক্রবর্তী রিটায়ার হবার পর স্ত্রী যোগমায়ার কাছ থেকে নানা হেনস্তা হচ্ছিল। সেজন্য তিনি একদিন দুঃখে আমগাছে দড়ি বেঁধেছিলেন। স্ত্রী তাই দেখে বলল ঐ আমগাছে এসব করতে গেলে কেউ আর ঐ আম মুখে তুলবে। আর গাছ পেলে না। এ গাছ মালী তুলসী হয়তো অলক্ষণে বলে কেটেই ফেলত।

মিঠুর কীর্তি গল্পে মিঠু লেখক অর্থাৎ পিসেমশাই অনেকরকম প্রশ্ন করে, তিনি কি সম্বন্ধে কি কি গল্প লেখেন নানা কথা। এই সব করতে করতে তার পড়ার সময় মনেই থাকে না। এমন সময় মার ডাক শোনা যায়। মিঠু পড়তে বসেছিল। মিঠু বলল এবার বসব মা, এতক্ষণ পিসেমশাই বকবক করছিল কিনা? সে নিজের দোষটা পিসেমশাইয়ের উপর দেয়।

এই সমস্ত উপন্যাস এবং গল্প পড়ে সকলে আনন্দ উপভোগ করবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

ধন্যবাদান্তে
তপতী দেবী

NOT FOR SALE

সূচীপত্র

উপন্যাস

- পাথরের চোখ ৯
- বোলতার হুল ৬৫

গল্প

- রাম-যাত্রা ১০৫
- রাত গভীর ১১১
- হলুদ আতঙ্ক ১১৭
- গ্রহ থেকে ১৩৩
- শিকার ১৪১
- কৈলাস কাহিনী ১৪৯
- জেলেপাড়া যাত্রাপার্টি ১৫৬
- বাল্লার বাহাদুরী ১৬৭
- পিকনিক ১৭২
- হীরুদার গোয়েন্দাগিরি ১৮৩
- বাদশার কাণ্ড ১৯৩
- সর্পিণী ২০০
- অমানুষিক ২০৭
- মূর্তির কবলে ২১৭
- এ যুগের রূপকথা ২২৭
- বাঘ-বাঘিনী ২৩৮
- মার্জার কাহিনী ২৫০
- সিংহ জাতক ২৬২
- উদ্বন্ধন ২৭৩
- মিঠুর কীর্তি ২৭৭

NOT FOR SALE

NOT FOR SALE

পাথরের চোখ

বৈশালী ব্যানার্জী কৌচে আধশোয়া অবস্থায়। হাতে একটা পত্রিকা। পত্রিকাটি খুব যে তার মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হচ্ছে এমন মনে হলো না, কারণ বৈশালী মাঝে মাঝে চোখ তুলে বন্ধ জানলার দিকে দেখছে। বাইরের বিদ্যুৎ-দীপ্তিতে কাচগুলো আলোকিত হয়ে উঠছে।

বৃষ্টি নেই, শুধু উত্তাল বাতাস, মেঘের গর্জন আর নীল বিদ্যুতের ঝিলিক।

তবু মন্দের ভাল। টানা এক সপ্তাহ ধরে প্রচণ্ড দাবদাহ চলছে। এক ফোঁটা জলের জন্য হাহাকার। নলকূপের চার পাশ ঘিরে মানুষের ভিড়। প্রায় অন্ধকার ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত। ধরিত্রীর জঠর থেকে যতটা সম্ভব জল টানার প্রচেষ্টায় মানুষ প্রায় কাহিল।

বৈশালী আবার পত্রিকায় মনোনিবেশ করল।

দরজার কাছে মৃদু পদশব্দ।

মুখ না তুলেই বৈশালী জিজ্ঞাসা করল, কি রে বাহাদুর?

নেপালী চাকর। বয়স পনের-ষোল। ফুটফুটে চেহারা। পরিষ্কার বাংলা বলে। বাহাদুরের মা-ও এ-বাড়িতে কাজ করেছে। বাহাদুর আছে বছর পাঁচেক।

এক বাবু এসেছে।

বাবু?

বৈশালী জানলার দিকে চোখ ফিরিয়ে ভ্রু কোঁচকাল।

এই দুর্যোগে আবার কে এল?

আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

নিয়ে এসো।

হাতের পত্রিকাটি টিপয়ের ওপর রেখে বৈশালী কৌচে হেলান দিয়ে বসল।

দু-একটা খুচরো চুল কপালের ওপর এসে পড়েছিল, বৈশালী হাত দিয়ে সেগুলো ঠিক করে নিল।

বাহাদুর বেরিয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই একটি প্রৌঢ় ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। পরনে ধুতির ওপর দামী প্রিন্সকোট, তার ওপর আড়াআড়িভাবে মুগার চাদর। গৌরবর্ণ, কপালে চোখের পাশে বয়সের কুঞ্চন। নীল চোখের তারা।

NOT FOR SALE

আপনিই কি বৈশালী ব্যানার্জি?

বৈশালী মাথা নাড়ল। সম্মতিসূচক।

আশ্চর্য!

প্রৌঢ়ের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

কি আশ্চর্য?

আপনার বয়স আমি আরও বেশী ভেবেছিলাম।

কারণ?

কারণ, যে সব কাজের গুরুদায়িত্ব আপনি সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন, তাতে আপনাকে পরিণত বয়স্কাই মনে হয়।

বৈশালী মৃদু হাসল। কোন উত্তর দিল না।

তারপর প্রৌঢ়ের দিকে ফিরে বলল, আপনি বসুন।

বিপরীত দিকে রাখা কৌচের ওপর প্রৌঢ় বসল।

আপনি খুব দামী মোটরে এসেছেন বলে মনে হচ্ছে।

কি করে বুঝলেন?

খুব সহজে। বাড়ির সামনে মোটর দাঁড়াল, অথচ কোন শব্দ পেলাম না। সাধারণ মোটরে এটা সম্ভব নয়। যাক, এই দুর্যোগে বেরিয়েছেন, কী ব্যাপার?

বিপদ কি আর দুর্যোগ বিচার করে আসে?

তা সত্যি। বিপদটা বলুন?

তবু প্রৌঢ় কিঞ্চিৎ ইতস্তত করছে দেখে বৈশালী বুঝতে পারল, তার বয়সের ওপর প্রৌঢ় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারছে না।

আপনার কোন অসুবিধা থাকলে দরকার নেই।

না, না, তা মোটেই নয়—প্রৌঢ় রীতিমত বিব্রত হয়ে উঠল। তারপর চোখ ফিরিয়ে দরজার দিকে বার কয়েক দৃষ্টিপাত করল।

বৈশালী বুঝতে পারল। তাই বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনি যতক্ষণ এ ঘরে আছেন, ততক্ষণ কেউ আসবে না।

প্রৌঢ় যেন একটু আশ্বস্ত হলো।

প্রিন্সকোটের ভিতরের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ভেলভেটে মোড়া একটা বস্তু বার করে টিপয়ের ওপর রাখল।

তারপর বৈশালীর দিকে ফিরে বলল, আমার ধৃষ্টতা মাপ করবেন। দরজাটা বন্ধই করে দিয়ে আসি।

প্রৌঢ় ওঠবার আগেই বৈশালী ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

প্রৌঢ় এবার ভেলভেটের আবরণ খুলে ফেলল।

ব্রোঞ্জের একটি ময়ূর। অপূর্ব কারুকার্য। লাল দুটি চোখ। দীর্ঘ পুচ্ছ নানা বর্ণের পাথর।

NOT FOR SALE

বাঃ, চমৎকার জিনিসটি তো।

চমৎকার ছিল এক সময়ে। এখন এর কিছুই আর অবশিষ্ট নেই বৈশালীদেবী।

বৈশালী এ আক্ষেপের হেতু ঠিক অনুমান করতে পারল না।

প্রৌঢ় ময়ূরটি বৈশালীর দিকে এগিয়ে দিল।

আপনি ভাল করে এর চোখ দুটো দেখুন।

বৈশালী ময়ূরটি হাতে তুলে নিল, তারপর পাশের ড্রয়ার থেকে একটা আতস কাচ বের করে কয়েক মিনিট খুব অভিনিবেশ সহকারে ময়ূরের চোখ দুটি নিরীক্ষণ করল, তারপর টিপয়ের ওপর নামিয়ে রেখে বলল, একটা চোখ খুব দামী রুবির, অন্যটায় ঝুটো কাচ বসানো।

ঠিক বলেছেন।

এর জন্যই কি আপনি আমার কাছে এসেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে তার আগে আপনাকে পুরো ঘটনাটা শুনতে হবে।

বলুন।

বৈশালী কৌচে হেলান দিয়ে বসল।

প্রৌঢ় কাহিনী শুরু করার মুহূর্তে দরজায় শব্দ হলো।

ঠক, ঠক।

প্রৌঢ় চমকে উঠে তাড়াতাড়ি ময়ূরটিকে কোটের পকেটে পুরে ফেলল।

কে?

বৈশালী হাতে অভয়মুদ্রা ফুটিয়ে বলল, বাহাদুর আপনার জন্য চা নিয়ে এসেছে।

চা? চা তো আমি খাই না।

বেশ, কি খাবেন বলুন? কফি, কোকো, ওভালটিন সব ব্যবস্থাই আছে।

না, মানে আমি দুধ খাই। তা ছাড়া, এখন কিছু খাবই না। সন্ধ্যা-আহ্নিক না করে আমি কিছু খাই না।

তাহলে অনুমতি করুন, আমি এক কাপ চা নিই।

নিশ্চয়, নিশ্চয়, এ কথা আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন!

বৈশালী উঠে দরজা খুলে দিল।

তারপর বাহাদুরের ধরে থাকা ট্রে থেকে এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুট নিয়ে কৌচে ফিরে এল।

বলুন এবার।

আপনি শিলাগড়ের নাম শুনেছেন?

শুনেছি। আসানসোল থেকে প্রায় ষাট মাইল। এক সময়ে খুব বর্ধিষ্ণু জনপদ ছিল।

NOT FOR SALE

প্রৌঢ় মাথা নাড়ল।

ঠিকই বলেছেন। আজ শিলাগড় প্রায় মরুভূমি। অন্তত আমার পক্ষে। অতীত দিনের কোন সম্পদই তার নেই। আমরা বাজপেয়ী। বহু পুরুষ আগে সুদূর পাঞ্জাব থেকে অন্নের সন্ধানে এ দেশে এসেছিলাম। আসানসোলে পাথরের বাসনের দোকান শুরু করেছিলাম। গয়া থেকে পাথর আনা হতো। একটু একটু করে গুছিয়ে নিলাম। এই সময়ে আশেপাশের টিলায় ভূতত্ত্ববিদরা কয়লার সন্ধান পেলেন। অবশ্য তাঁরা স্থির নিশ্চয় হতে পারেন নি।

কিন্তু তাতেই বণিকের দল ভিড় জমিয়ে ফেলল।

সেই সময় বরাত ঠুকে আমিও একটা টিলা ইজারা নিয়ে নিলাম।

এক পরিচিত জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কালো রং আমার জন্মগ্রহের অনুকূলে। সেইজন্য গয়ার কালো পাথরের কারবার শুরু করেছিলাম। কয়লাও কালো।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে দেরি হলো না। যে টিলাটি আমি ইজারা নিয়েছিলাম তার আশেপাশ থেকেই সবচেয়ে ভাল জাতের কয়লা বের হলো। অন্যান্য লোকেরা রীতিমত ঈর্ষান্বিত।

খুব বেশী খোঁড়ার প্রয়োজন হলো না। কতকগুলো কয়লার খাদে তার প্রয়োজন হয় না। লম্বালম্বি কয়লার স্তর চলে যায়।

এখানে বৈশালী বাধা দিল।

বুঝতে পারলাম কয়লা আপনাকে প্রভূত অর্থের অধিকারী করল।

প্রৌঢ় ক্ষণেকের জন্য একটু বিব্রত হয়ে গেল, তারপর সে ভাব সামলে নিয়ে বলল, আসল কথায় আসছি বৈশালী দেবী। কয়লার সঙ্গে হাজারীবাগে একটা অভ্রের খনিও কিনলাম। যদিও অভ্র কালো নয়, তবু এ কারবারেও অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হলো। ছেলের এ কারবারে মন গেল না। বিশেষ করে আমার স্ত্রী বিয়োগের পর। সে বর্মায় চলে গেল কাঠের ব্যবসা করতে। সেখান থেকে চিঠিপত্রে লিখল সে দেশে নানা রকমের পাথর পাওয়া যায়। পাথরের ব্যবসা শুরু করলাম। কেনাবেচা করতে করতে নিজের কিছুটা শখ জন্মে গেল—পাথর জমানোর।

এ সব পাথর কি পার্শেলেই আসত?

বৈশালী প্রশ্নের খোঁচা দিল।

না, দামী পাথর একটি লোক নিয়ে আসত।

কে সে লোক?

আমার বড়ছেলের পরিচিত এক বর্মী। নাম মঙ শান। সেই এই দুটো রুবি নিয়ে এল। এমন চমৎকার রঙের আর গঠনের রুবি আমি আর দেখিনি।

NOT FOR SALE

ইচ্ছা করলেই রাজারাজড়ার কাছে খুব চড়া দামে বিক্রি করতে পারতাম, কিন্তু ওই যে বললাম, রত্ন জমাবার একটা নেশা আছে। তাই কারিগর দিয়ে এই ময়ূরের দুটি চোখে দুটি রুবি লাগিয়ে নিলাম।

ময়ূরটি কোথায় থাকত?

আমার শোবার ঘরের সিন্দুকে।

চাবি কার কাছে?

একটি আমার কাছে, বাকিটা আমার স্ত্রীর কাছে।

কথাটা বলেই প্রৌঢ় একটু আরক্ত হয়ে উঠল।

মানে, আমি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছি।

ময়ূরের একটি চোখে যে ঝুটো পাথর বসানো হয়েছে, এটা আপনি কবে টের পেলেন?

দিন সাতেক আগে।

কি করে?

এক জহুরীকে দিয়ে অন্য পাথর যাচাই করছিলাম, সেই সময় ময়ূরটা বের করে টেবিলের ওপর রেখেছিলাম। একবার দেখেই কেমন সন্দেহ হলো। জহুরীকে দেখাতে নিঃসন্দেহ হলুম।

আপনার স্ত্রীকে বলেছিলেন?

আমার স্ত্রী এখানে নেই। মথুরায়। তার মা-বাপের সঙ্গে।

কতদিন তিনি নেই?

প্রায় তিন মাস।

কাউকে আপনার সন্দেহ হয়?

কাকে সন্দেহ করব?

বাইরের কোন লোককে ময়ূরটা দেখিয়েছিলেন?

তা দেখিয়েছিলাম। বাড়ির লোকের মধ্যে আমার স্ত্রী, আমার ছেলে, মঙ শান আর কুমার বাহাদুর দেখেছে।

কুমার বাহাদুর কে?

রতনপুরের কুমার বাহাদুর। তাঁরও রত্নের খুব নেশা। আমার কাছ থেকে অনেকবার পাথর কিনেছেন।

আপনি কি পুলিশে খবর দিয়েছেন?

না, এ ব্যাপার আর পুলিশকে কি জানাব! পুলিশ এসেই তো হাঙ্গামা বাধাবে। কোথা থেকে এসব রত্ন কিনেছি তার কৈফিয়ত চেয়ে বসবে।

কৈফিয়ত দেবার পক্ষে অসুবিধাজনক এমন রত্নও আপনার কাছে আছে?

প্রৌঢ় কোন উত্তর দিল না।

আমার একবার শিলাগড়ে যাওয়া প্রয়োজন। বৈশালী বলল।

NOT FOR SALE

বেশ তো, কবে কখন যাবেন বলুন, আমি মোটর পাঠিয়ে দেব।

খুব দেরি করতে চাই না। ধরুন যদি পরশু যাই!

কোন অসুবিধা নেই। কখন?

খুব ভোরে রওনা হতে চাই।

তাহলে এক কাজ করব। কাল রাত্রে মোটর পাঠিয়ে দেব।

বৈশালী কিছুক্ষণ কি ভাবল, তারপর বলল, আপনার মোটর পাঠাবার দরকার নেই, আমি নিজের গাড়িতেই যাব।

কিন্তু আপনি ভুবন-নিবাস চিনবেন কি করে?

ভুবন-নিবাস!

মানে আমার নাম ভুবন বাজপেয়ী। আমার বাড়ির নাম ভুবন-নিবাস।

আসানসোল পর্যন্ত যেতে আমার কোন অসুবিধা হবে না।

ঠিক আছে। আসানসোলে আমার লোক থাকবে। আপনার মোটরের নম্বরটা বলুন।

এস এস এস সাতশো আটানব্বই। ছাই রংয়ের স্ট্যাণ্ডার্ড হেরাল্ড। আর একটা কথা— ।

বলুন।

আপনার স্ত্রী কবে ফিরবেন?

তিনি কাল ফিরছেন।

ভালই হয়েছে, তাঁর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পাব। আচ্ছা কিছু মনে করবেন না, একটা কৌতূহল—।

ভুবনবাবু উঠে দাঁড়িয়েছিল। আবার বসল।

আমার কাছে আসার পরামর্শ আপনাকে কে দিল?

আপনার খ্যাতি সুদূরবিস্তৃত। কোডারমার বেণীপ্রসাদের দশ লাখ টাকার জড়োয়া গয়নার কথা শুনেছি। সেটা আপনি কিভাবে উদ্ধার করেছিলেন, তাও আমার অজানা নয়। আপনি দয়া করে আমার এই রুবির একটা সুরাহা করে দিন। টাকার জন্য আটকাবে না।

ঠিক আছে। আমি একবার শিলাগড় ঘুরে আসি। তারপর আপনার সঙ্গে কথা বলব।

দূরের গীর্জার পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে নটা বাজল।

ভুবনবাবু এগোতে এগোতে বলল, চলি, আমাকে অনেকটা পথ যেতে হবে। প্রায় পাঁচ ঘন্টার রাস্তা। তাহলে পরশু আমার লোক দশটা থেকেই আসানসোল স্টেশনের কাছে থাকবে।

বৈশালী মাথা নাড়ল, তারপর ডাকল, বাহাদুর!

NOT FOR SALE

বাহাদুর এসে দাঁড়াতেই বলল, বাবু চলে যাচ্ছেন। মোটর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও।

অনেক রাত পর্যন্ত বৈশালী শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ল।

ইংরাজী বই। দেশ-বিদেশের ধনরত্ন সম্বন্ধে।

অনেকগুলো আর্ট প্লেট আছে। নানা জাতের মহার্ঘ রত্নের ছবি। তাদের মূল্য। যাদের হেফাজতে আছে, তাদের নাম-ধাম।

বর্মার রুবি সম্বন্ধে আলাদা একটা অধ্যায় আছে।

বৈশালী সেটা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়ল।

পর পর অনেকগুলো নাম বৈশালীর মনের পটে ভেসে উঠল।

ভুবন বাজপেয়ীর স্ত্রী, মঙ শান, ভুবনবাবুর ছেলে।

পরের দিন বৈশালীর যখন ঘুম ভাঙল তখন বেলা হয়েছে।

জানলা থেকে পর্দাটা সরাতেই রোদের ঝলক এসে ঘরে ঢুকল।

বৈশালী বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখল, টিপয়ের ওপর ধূমায়মান চায়ের কাপ, পাশে প্লেটে ডিম আর টোস্ট।

একপাশে সেদিনের খবরের কাগজ।

চায়ে চুমুক দিতে খবরের কাগজের ওপর চোখ বোলানো বৈশালীর বহুকালের অভ্যাস।

আবহাওয়াবিদদের মতে মেঘ আকাশে থাকবে বটে, কিন্তু সে মেঘে শুধু বর্ষণের বঞ্চনা। আতপতপ্ত দেশের শীতল হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

পড়তে পড়তে বৈশালী হঠাৎ মেরুদণ্ড টান করে বসল।—

শোচনীয় দুর্ঘটনা। শিলাগড়ের বিখ্যাত ব্যবসায়ী ভুবন বাজপেয়ীকে তাঁর মোটরে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। মোটরচালক নিখোঁজ। দামী মোটরটিও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ভুবনবাবুর টাকার ব্যাগ, ঘড়ি, আংটি কিছুই অপহৃত হয় নাই, তাহাতে অনুমিতি হয় যে, চুরির জন্য এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় নাই।

বৈশালী উঠে দাঁড়াল। দারুণ উত্তেজনায় পায়চারি করতে করতে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, ময়ূর, ময়ূরটা কোথায় গেল? সেটার খোঁজ নেওয়া দরকার।

॥দুই ॥

বৈশালী কিছুক্ষণ চুপচাপ জানলার ধারে দাঁড়াল।

দৃষ্টি চলমান জনতার দিকে নিবদ্ধ হলেও, বেশ বোঝা গেল সে গভীর কিছু চিন্তা করছে।

এক সময়ে পর্দার পাশে টেলিফোনের কাছে চেয়ার টেনে বসল।

NOT FOR SALE

ডায়াল করল, তারপর বলল, একবার সত্যেন রায়কে দিন।

তারের ওপারে বোধ হয় সত্যেন রায়।

বৈশালীর কণ্ঠ শোনা গেল।

বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে এত সকালে বিরক্ত করছি মিস্টার রায়। আমি বৈশালী। বৈশালী ব্যানার্জী। হ্যাঁ, এক রকম ভালই আছি। খবর? আজকের কাগজে ভুবন বাজপেয়ীর ব্যাপারটা বেরিয়েছে। ওটার সম্বন্ধে আমার একটু আগ্রহ রয়েছে। ঠিক আছে, আমি আধঘন্টার মধ্যে আপনার কাছে যাচ্ছি। পথে মোটরটা একবার দেখে যাব। আচ্ছা, নমস্কার।

পোশাক পাল্টে বৈশালীর বের হতে মিনিট পনেরো লাগল।

যাবার সময় বাহাদুরকে বলে গেল, আমার একটু দেরি হতে পারে। তুমি খেয়ে নিও।

লালবাজার থেকে বৈশালী খবর নিয়ে জানল যে, মোটরটা ডালহৌসি স্কোয়ারের ফুটপাথেই পড়ে আছে।

বৈশালী যখন গিয়ে পৌঁছল তখনও কিছু কিছু কৌতূহলী জনতা ভিড় করে আছে।

মোটর এক ধারে রেখে বৈশালী নামল।

একটি পুলিশ মোটরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

কিছুটা রেলিং ভেঙে মোটরটা স্কোয়ারের মধ্যে ঢুকে গেছে।

ইমপালা শেভ্রোলে। মরাল-শুভ্র রংয়ের।

বৈশালী একটা গাছতলায় দাঁড়াল।

ভুবনবাবুর দেহ পোস্টমর্টমের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আজ বিকালেই রিপোর্ট আসবে। রিপোর্টে নতুন কোন তথ্য বৈশালী আশা করে না। ভুবনবাবু মৃত এটাই চরম সত্য।

প্রশ্ন হচ্ছে, কে আততায়ী?

যদি ময়ূরটা তার প্রিন্সকোটের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে বুঝতে হবে ভুবনবাবুকে হত্যার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। ব্যবসা সংক্রান্ত কোন রকম রেষারেষি হওয়া বিচিত্র নয়।

বৈশালী এগিয়ে গিয়ে পুলিশের কাছে দাঁড়াল।

নিজের ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা কার্ড বের করে দেখিয়ে চাপা গলায় বলল, আমার সেলাম দরকার নেই, তাহলে লোকদের কৌতূহল বাড়বে। আমি শুধু মোটরের কাছে গিয়ে একটু দেখতে চাই।

বৈশালীর পাশে পাশে পুলিশও এগিয়ে গেল।

বেশী কাছে যাবার প্রয়োজন হলো না। কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল পিছনের সাদা সীট-কভারে রক্তের দাগ।

NOT FOR SALE

তার মানে ভুবন বাজপেয়ী পিছনের সীটে ছিল। চালনচক্র ছিল অন্য লোকের হাতে।

কিন্তু চালক কোথায় গেল?

খুব সম্ভব কোন কারণে মোটরের গতি যখন মন্দীভূত, তখন আততায়ী গুলি ছুঁড়েছিল। চালক হতবুদ্ধি হয়ে ভারসাম্য হারিয়ে মোটর ফুটপাথে উঠিয়ে দিয়েছিল। তারপর রেলিংয়ের সঙ্গে ধাক্কা।

অবশ্য ধাক্কা এমন জোর নয় যে চালক আহত হবে।

চালক সাধারণভাবে পুলিশ স্টেশনে যাবে, এটাই সহজ বুদ্ধিতে ভাবা যেতে পারে। তার গা ঢাকা দেবার কোন হেতু থাকতে পারে না, যদি না সেও এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকে।

চালক কি পিছন ফিরে ভুবনবাবুকে গুলি করেছিল?

আর সেই সময় মোটর পথ ছেড়ে বিপথে গিয়েছিল! সেটাও সম্ভব।

বৈশালী নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, লালবাজার থেকে কেউ এসেছিল?

হ্যাঁ, ফরেনসিক ডিপার্টমেণ্টের লোক এসেছিল। তারা অনেক ফটো তুলে নিয়ে গেছে।

ব্যালিস্টিক ডিপার্টমেণ্টের কেউ?

না। তারা বোধহয় বডির আঘাত দেখবেন। তাতেই বোঝা যাবে।

ঠিক আছে। আমি চলি।

গুঞ্জনরত জনতার মাঝখান দিয়ে পথ করে বৈশালী নিজের মোটরের দিকে এগিয়ে গেল।

নানা কথার টুকরো তার কানে ভেসে এল।

মেয়ে পুলিশ। দেখলি না, পুলিশটা কিছু বলল না। আর আমরা এক পা এগোলেই চেঁচাচ্ছে।

না, না, মেয়ে পুলিশ নয়, তাদের পোশাকই আলাদা। এ বোধ হয় যে খুন হয়েছে তার কেউ।

দূর, তাহলে এ রকম খুশী খুশী ভাব হয়?

অমন বড়লোক আত্মীয় খতম হলে সবাইয়ের খুশী খুশী ভাব হয়।

হাসি চেপে বৈশালী মোটর চালু করল। এবার গন্তব্যস্থল লালবাজার।

এখানে প্রায় সবাই চেনা। অনেকের সঙ্গেই কথা বলতে বলতে বৈশালী সোজা ডেপুটি কমিশনার সত্যেন রায়ের কামরার সামনে এসে দাঁড়াল।

আরদালী ছুটে আসতে জিজ্ঞাসা করল, সায়েব একলা আছেন?

হ্যাঁ, মেমসাব।

NOT FOR SALE

আরদালী একহাত দিয়ে দরজা খুলে ধরল। প্রকাণ্ড টেবিল। ফাইল আর অন্যান্য কাগজের স্তূপ। সত্যেন রায় খুব মনোযোগ দিয়ে কয়েকটা ফটো দেখছিল। পায়ের শব্দে মুখ তুলল।

আরে এসো বৈশালী, তোমার কথাই ভাবছিলাম।

একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বৈশালী বলল, আমার ভাগ্য। হঠাৎ?

হঠাৎ নয়, ভুবন বাজপেয়ীর কেসটার কথা ভাবছিলাম। তুমি যখন ফোন করেছ, বুঝলাম, ভিতরে রহস্য আছে। ভদ্রলোককে এভাবে কে গুলি করল!

এ কথার উত্তর তো আপনাদের বিভাগের দেবার কথা। লোকটি কাল রাতে আমার কাছে গিয়েছিল।

তাই নাকি? ভদ্রলোক শিলাগড়ের বড় ব্যবসাদার তা জানি। আগে কয়লার ব্যবসা ছিল, এখন খাদে তেমন কয়লা নেই। কিন্তু অভ্র আর হীরা চুনি পান্নার ভদ্রলোকের ঢালাও কারবার।

মিস্টার রয়, আপনি তো অনেক কিছুই জানেন।

জানি, কারণ, দিল্লি থেকে টেলেক্স এসেছিল, আন্তর্জাতিক চোরাকারবারী দল কলকাতায় এসেছে। ভুবন বাজপেয়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

তারপর?

তারপর জাল বিস্তার করেছিলাম, কিন্তু পাখী ধরা পড়েনি।

কারণ?

বোধহয় আগে থেকে গন্ধ পেয়েছিল।

আমার একটু সাহায্যের প্রয়োজন।

হুকুম করো।

ভুবনবাবুর জিনিসগুলো একটু দেখব।

জিনিসগুলো মানে?

যেগুলো প্রিন্সকোটের পকেট থেকে আপনারা উদ্ধার করেছেন।

এসো।

সত্যেন রায় বেরিয়ে গেল। পিছন পিছন বৈশালী। কিছুটা এগিয়ে পাশের একটা ঘরে ঢুকে পড়ল।

গোটা দুয়েক সাব-ইন্সপেক্টর বসেছিল। সত্যেন রায় ঢুকতেই তারা তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াল।

বোস, কোণের আলমারিটা খোল তো।

একজন সাব-ইন্সপেক্টর চাবি দিয়ে আলমারি খুলল।

সত্যেন রায় বলতে আরম্ভ করল, একটা মানিব্যাগ ছিল, তাতে প্রায় হাজার দেড়েক টাকা, দুটো আংটি, হাতঘড়ি, আর একটা ভারি মজার জিনিস।

NOT FOR SALE

কি?

একটা ময়ূর।

ময়ূর?

বৈশালী এমন চমকে উঠল যে, আর একটু হলে তার ভ্যানিটি ব্যাগটা হাত থেকে ছিটকে মেঝের ওপর পড়ে যেত।

হ্যাঁ, বেশ কারুকার্য করা। দু'চোখে দুটো লাল পাথর। পেখমেও চমকদার পাথর বসানো।

বৈশালী কোন কথা বলল না।

ময়ূরই যদি পাওয়া গিয়ে থাকে তাহলে ভুবন বাজপেয়ীকে হত্যা করার আততায়ীর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

কিংবা, কোন কারণে ময়ূরটা হস্তগত করা হয়তো তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

আলমারি থেকে বেরল মানিব্যাগ, আংটি, ঘড়ি, শেষকালে ভেলভেটে মোড়া ময়ূর।

পরিবেশ ভুলে বৈশালী তাড়াতাড়ি ভেলভেটে মোড়া ময়ূরটা তুলে নিল।

খুব নিরীক্ষণ করার প্রয়োজন হলো না।

চোখের সামনে তুলে ধরেই বৈশালী বুঝতে পারল।

দুটো চোখে চুনি নয়, লাল সাধারণ পাথর।

আশ্চর্য! এত দ্রুত কি করে ময়ূর বদলানো সম্ভব হলো!

কাল রাতে ভুবনবাবু তাকে যে ময়ূর দেখিয়েছিল, এ ময়ূর সে ময়ূর নয়।

রত্ন সম্বন্ধে বৈশালীর মোটামুটি একটা জ্ঞান আছে।

ঝুটো পাথর আর আসল রুবির পার্থক্য সে বেশে বোঝে।

সত্যেন রায় বলল, ময়ূরটা আমি ইতিমধ্যেই চিমনলালকে দেখিয়ে নিয়েছি। পাথরগুলো সব ঝুটো।

বৈশালী হাসল।

পাথরগুলো যে ঝুটো সেটা বোঝবার জন্য চিমনলালকে ডাকবার দরকার নেই, আমার মতন লোকই সেটা বুঝতে পারে।

জিনিসগুলো সব আলমারিতে তুলে রাখা হলো।

বৈশালী সত্যেন রায়ের দিকে ফিরে বলল, আমি চলি মিস্টার রয়। বিকালে পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা এলে আমাকে একবার খবর দেবেন।

কথাটা বলেই বৈশাখী কি ভাবল, তারপর আবার বলল, পোস্টমর্টেম রিপোর্টে নতুন তথ্য আর কি জানা যাবে! আপনারা তো বলছেন, গুলিতে মৃত্যু। রিভলভারের গুলিতে।

NOT FOR SALE

পোস্টমর্টেম রিপোর্টে নিহতের শারীরিক অবস্থার কথারও উল্লেখ থাকবে। বিশেষ করে তার ভিসারার অবস্থা। চল আমার ঘরে একটু বসে যাবে। চা খাবে এক কাপ।

বৈশালী এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে বলল, আর একদিন এসে না হয় চা খাওয়া যাবে।

সত্যেন রায় কপট গাম্ভীর্যে বলল, তোমাকে তো এখন ছাড়তে পারব না।

কারণ?

কারণ নিহত ব্যক্তির সঙ্গে শেষ তুমি কথা বলেছ। অন্তত আমাদের যতটুকু জানা আছে। কাজেই এ কেসে তুমি একজন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সাক্ষী। তোমার স্টেটমেন্ট আমাদের দরকার।

আপাত-গাম্ভীর্যের সুরে কথা বললেও বৈশালীর পক্ষে সত্যেন রায়ের কণ্ঠের পরিহাসের সুরটুকু বুঝতে অসুবিধা হলো না।

সত্যেনবাবু বৈশালীর পিতৃবন্ধু। বৈশালীর বাবা শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় ইলেকট্রিক কোম্পানীর নামী ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বর্তমানে অবসর গ্রহণ করে হাজারিবাগে রয়েছেন। বৈশালী এদেশের শিক্ষা শেষ করে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডেও কিছুদিন শিক্ষানবিসী করেছিল।

সত্যেনবাবু চেষ্টা করেছিল যাতে সে পুলিশে কাজ নেয়।

বৈশালী রাজি হয়নি।

সে সখের গোয়েন্দা থাকতেই চেয়েছিল।

বৈশালী আবার সত্যেন রায়ের কামরায় গিয়ে ঢুকল।

এবার বল তো ভুবন বাজপেয়ী কেন তোমার কাছে গিয়েছিল?

থেমে থেমে বৈশালী সব ঘটনা বলল।

সত্যেন রায় চেয়ারে হেলান দিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে শুনল। তারপর সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, কিন্তু ময়ূরের এই পাথরের জন্য ভদ্রলোকের এত উদ্বেগের কারণ? দুটো পাথরই তো ঝুটো।

ভুবনবাবু কাল রাতে যে ময়ূর আমার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন সেটা এ ময়ূর নয়। সে ময়ূরের একটা চোখে খুব দামী চুনি বসানো ছিল।

তাহলে সে ময়ূর গেল কোথায়?

যে ভুবনবাবুকে গুলি করেছে সেই সরিয়েছে।

আর এ ময়ূরটা?

সম্ভবত পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য এ ময়ূর নিহতের পকেটে রেখে গেছে।

NOT FOR SALE

সত্যেন রায় মাথা নাড়ল।

সিলি, আততায়ী অতক্ষণ ঘটনাস্থলে ছিল? সামনে রাইটার্স বিল্ডিং, দু'পা গেলেই লালবাজার। গুলির শব্দ হবার পরও আততায়ী ময়ূর বদলাবার জন্য অত সময় নষ্ট করবে?

যদি রিভলবারে সাইলেন্সার দেওয়া থাকে?

কি জানি সর জিনিসটা আমার খুব ছেলেমানুষি মনে হচ্ছে। ফিংগার প্রিন্ট এক্সপার্টরা সব কিছু তন্ন তন্ন করে খুঁজছে, কোথাও কোন আঙুলের ছাপ পায়নি। তার মানে বাইরের কেউ ভুবনবাবুর পোশাক স্পর্শ করেনি। ব্যাপারটা রীতিমত ঘোরালো হয়ে উঠছে। আচ্ছা তুমি এখন কি করবে?

আমার কাল শিলাগড় যাবার কথা।

যাবে?

ঠিক বুঝতে পারছি না কি করব। শিলাগড়ে কি খবর পাঠানো হয়েছে?

হ্যাঁ, সকালেই টেলিগ্রাম করা হয়েছে।

তাহলে লোক আসবে সেখান থেকে। তারা যদি আমাকে যেতে বলে যাব। আজ উঠি।

আচ্ছা এস। তোমার মা-বাবার খবর ভাল তো?

হ্যাঁ, গত সপ্তাহে চিঠি পেয়েছি। ভালই আছে।

বৈশালী উঠে দাঁড়াল।

সত্যেন রায়ের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আরে, তোমাকে চা খাওয়ানোর কথা ছিল।

আজ থাক, আর একদিন হবে। এখন মাঝে মাঝে তো এখানে আসতেই হবে।

বৈশালী বেরিয়ে পড়ল।

সিঁড়ির কাছ বরাবর গিয়েই তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো।

দু'পাশে পুলিশ, মাঝখানে একটি লোক।

লোকটার পরনে সার্ট আর ফুলপ্যান্ট।

পোশাকে ধুলোর ছাপ। এমনকি ধুলোর চিহ্ন মাথার চুলেও।

এক নজর দেখেই বৈশালী বুঝতে পারল।

লোকটি মদে চুর। তাকে প্রায় টেনে ওপরে তোলা হচ্ছে।

বৈশালী একপাশে সরে দাঁড়াল।

পিছনে একজন সাব-ইন্সপেক্টর।

সাব-ইন্সপেক্টরটি পরিচিত।

সে কাছে আসতেই বৈশালী জিজ্ঞাসা করল, মজুমদার, সীধু পানের কেস নাকি?

NOT FOR SALE

ঠিক বুঝতে পারছি না।

একেবারে বৈশালীর পাশে এসে সাব-ইন্টপেক্টর আবার বলল, বেটা ড্রাইভার। পকেটের লাইসেন্স দেখে মালুম হলো। একটা চিঠিও আছে। চিঠির ওপরে ভুবন-নিবাস, শিলাগড় লেখা। সেইজন্য একে স্যারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, না হলে পাঁড় মাতালকে এখানে আনার কি দরকার।

এই তাহলে ভুবন বাজপেয়ীর ড্রাইভার।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৈশালী ভাবতে লাগল।

এখন তার চলে যাওয়া সম্ভব নয়।

ব্যাপারটা দেখে যেতে হবে।

দলের পিছন পিছন বৈশালী সত্যেন রায়ের কামরায় ঢুকল। সত্যেন রায় জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিল। রাস্তার দিকে চোখ ফিরিয়ে।

এতগুলো লোকের পায়ের শব্দে মুখ ফেরাল।

কি হলো?

সাব-ইন্সপেক্টর এগিয়ে এসে বলল, ভুবন বাজপেয়ীর ড্রাইভার স্যার।

অ্যাঁ।

সত্যেন রায় চমকে উঠল।

তারপর লোকটার দিকে ফিরে বলল, কি হে, কি নাম তোমার?

লোকটি উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে সত্যেন রায়কে দেখল, তারপর চোখ নামিয়ে নিল।

কি নবাবপুত্তুর, কথা কানে গেল না?

লোকটি নির্বিকার।

এবার সাব-ইন্সপেক্টর বলল, আমরা অনেক চেষ্টা করেছি স্যার, একটি কথাও বের করতে পারিনি।

মারের চোটে ভূত পালায়, নেশা তো ছার।

তার চেয়ে এক কাজ করলে হয়।

বৈশালীর কথায় সবাই তার দিকে মুখ ফেরাল।

কি?

ডাক্তার রাহাকে একবার ডেকে পাঠান না! একে পরীক্ষা করে দেখবেন।

দেখার আর কি আছে। ডাক্তার রাহা বলবেন স্টমাক পাম্প করতে। ঠিক আছে, ডাক্তার রাহাকে একবার ডাকো তাহলে কেউ।

একজন পুলিশ বেরিয়ে গেল।

NOT FOR SALE

।। তিন ।।

সত্যেন রায় বলল, আচ্ছা বৈশালী, তুমি ডাক্তার ডাকতে বলছ কেন?

লোকটির চেহারা আমার ভাল ঠেকছে না। এ যেন ঠিক মদের কেস নয়। চোখ দেখে মনে হচ্ছে হাসিস কিংবা ওপিয়ম।

সত্যেন রায় হাসল।

ডাক্তার রাহা একেবারে রাস্তার উল্টো দিকে বসে। রাহা ক্লিনিক।

পুলিশের সঙ্গে ডাক্তার রাহা এসে উপস্থিত।

ড্রাইভারের দিকে আঙুল দেখিয়ে সত্যেন রায় বলল, ওই আপনার পেশেন্ট। দেখুন তো কি ব্যাপার?

ডাক্তার রাহা অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করল। চোখের কোণ টেনে, স্টেথস্কোপ বুকে বসিয়ে, নাড়ি টিপে।

ডাক্তার রাহার বাইরের পোশাক দেখে মানুষটাকে চেনা দুষ্কর। অনেকগুলো বিলিতি ডিগ্রী আছে। বিদেশের মেডিকেল জার্নালে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লেখে। বিভিন্ন দেশের নেশার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে।

ডাক্তার রাহা সত্যেন রায়ের দিকে ফিরে বলল, ঠিক যা সন্দেহ করেছি।

কি সন্দেহ করেছিলেন?

বড় রকমের নেশা করানো হয়েছে। খুব বেশী ডোজের মর্ফিয়া কিংবা...

পাদপূরণ করে সত্যেন রায় বলল, হাসিস?

হতে পারে, কিংবা মারজুয়ানা হওয়াও বিচিত্র নয়। সঠিক বলতে পারছি না।

মারজুয়ানা এ দেশে পাওয়া যায়?

পয়সা ফেললে সবই পাওয়া যায়। কলকাতা এক অদ্ভুত মহানগরী।

কথা বলতে বলতে ডাক্তার রাহা ইনজেকশনের সিরিঞ্জ পরিষ্কার করতে লাগল।

এবার বৈশালী জিজ্ঞাসা করল, অ্যান্টিডোট কিছু দেবেন নাকি?

দেখি চেষ্টা করে, তবে কাজ হবে বলে মনে হয় না।

কেন?

জিনিসটা ব্রেন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

গোটা দুয়েক ইনজেকশন দেওয়া হলো।

ড্রাইভার অনড়, অসাড়।

ডাক্তার রাহা যেতে যেতে বলল, থাক্ শুয়ে। ঘন্টা দুয়েক পরে একবার খোঁজ করো।

আমিও চলি। বৈশালীও উঠে দাঁড়াল।

NOT FOR SALE

রাস্তায় নেমে ডাক্তার রাহা বৈশালীকে জিজ্ঞাসা করল, লোকটি কি খুব প্রয়োজনীয় সাক্ষী নাকি?

সম্ভবত।

কি রকম?

আজ কাগজে দেখেছেন ভুবন বাজপেয়ী খুন হয়েছে। নিজের মোটরের মধ্যে দেহ পাওয়া গেছে।

লোকটি বুঝি সেই মোটরের ড্রাইভার?

হ্যাঁ।

বৈশালী মোটরে উঠল।

পাশ কাটিয়ে ডাক্তার রাহাও চলে গেল।

বৈশালী যখন বাড়ি পৌঁছল, তখন রোদ রীতিমত চড়া।

খাওয়া-দাওয়ার পর জানলা-দরজায় পর্দা টেনে দিয়ে বৈশালী বিছানায় গা ঢেলে দিল।

শুল, কিন্তু ঘুমল না।

এত চিন্তা মাথায় নিয়ে ঘুমানো সম্ভব নয়।

এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, ভুবন বাজপেয়ীর হত্যার ব্যাপারে ড্রাইভারের কোন হাত নেই।

যে লোকটি হত্যা করেছেন সে ড্রাইভারের চেনা।

চেনা বলেই ড্রাইভারের এই অবস্থা। যাতে সে আততায়ীর সম্বন্ধে কিছু বলতে না পারে।

আর একবার বৈশালী সমস্ত ঘটনাটা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করল।

মোটরটি যখন চলছিল, তখন আততায়ী হাত তুলে মোটর থামাবার সঙ্কেত করে।

সে ভুবনবাবু আর ড্রাইভার—দুজনেরই পরিচিত।

সুতরাং মোটর থেমেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি ভুবনবাবুকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। খুব কাছ থেকে, কাজেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার প্রশ্ন ওঠেনি।

কিন্তু ড্রাইভারকে ইনজেকশন কে দিল!

সঙ্গে সঙ্গে না দিলে ড্রাইভার চিৎকার করে উঠত। লোক জড় হওয়া বিচিত্র নয়। রাত তখন কত?

ভুবন বাজপেয়ীর হাতের ঘড়িতে এগারোটা কুড়ি। ঘড়িটা ভুবনবাবুর পরমায়ু শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেছে এমন মনে করার কোন হেতু নেই।

কিন্তু আর একটা কথা।

NOT FOR SALE

মোটর যদি থেমেছিল আততায়ীর সঙ্কেতে, তাহলে সেটা ওভাবে ফুটপাথে উঠে রেলিংয়ে ধাক্কা লাগাল কেন?

দুর্ঘটনার চেহারা দেখে মনে হয়, মোটর যখন চলন্ত অবস্থায়, তখন আততায়ী মোটরে উঠেছিল।

একাধিক লোকের আততায়ী হওয়াও সম্ভব।

একজন ভুবনবাবুকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেছিল, অন্যজন ড্রাইভারকে রিভলবার দেখিয়ে নির্বাক করে ইনজেকশন দিয়েছে।

তারপর এক সময়ে নকল ময়ূর রেখে আসল ময়ূর নিয়ে সরে পড়েছে।

টেলিফোনের শব্দে বৈশালীর ঘুম ভেঙে গেল।

শুয়ে শুয়েই বৈশালী হাত বাড়িয়ে ফোনটা নিল।

বৈশালী কথা বলছি।

আমি সত্যেন রায়।

কিছু খবর আছে?

খবর মানে পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা এসেছে।

নতুন কিছু আছে তাতে?

বিশেষ নয়। রিভলভারের গুলিতে মৃত্যু। খুব ক্লোজ রেঞ্জে ফায়ার। ক্ষতস্থানের চারপাশে বারুদের দাগ। তবে একটা খবর আছে।

কি?

ভুবনবাবুর মৃত্যু হয়েছে রাত দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে।

তা হতে পারে, কারণ ভুবনবাবু আমার বাড়ি থেকে রাত নটায় উঠেছিলেন।

আচ্ছা, রাখছি বৈশালী, আমাকে আবার আর একটা কাজে বের হতে হবে।

বৈশালী ফোন রেখে দিল।

দিন দুয়েক পর।

বৈশালী বিকালে বেড়াতে বের হচ্ছিল, হঠাৎ কলিং বেলের শব্দ।

বৈশালী দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাহাদুর সংবাদ নিয়ে আসবে।

ঠিক তাই।

এক মাইজী এসেছে।

মাইজী? নিয়ে এসো।

বৈশালী ফিরে গিয়ে কৌচের ওপর বসল।

কে আসতে পারে? সহপাঠিনীদের কেউ?

NOT FOR SALE

বিশেষ কেউই আসে না।

সকলেই যে যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত।

মক্কেলও অবশ্য আসতে পারে।

দরজায় খুট করে শব্দ।

আসব?

আসুন।

তারপর ঘরের মধ্যে যে ঢুকল, বৈশালী অনেকক্ষণ তার দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল।

গায়ের রং গজদন্ত সদৃশ। ঈষৎ পীতাভ সাদা। দীর্ঘ, ঋজু চেহারা। অনেকটা রজনীগন্ধার স্তবকের মতন। ঘোমটা মাথার মাঝ বরাবর।

আয়ত ভ্রমরকৃষ্ণ দুটি চোখ, পদ্মপাপাড়িনিভ দুটি ঠোঁট। সারা মুখ বুদ্ধিদীপ্ত।

ঢুকেই দুটো হাত জোড় করে নমস্কার করল—নমস্তে।

বৈশালী দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার ফেরত দিল।

বলল, আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না!

আমি ভুবন বাজপেয়ীর স্ত্রী।

আশ্চর্য, দ্বিতীয় পক্ষ সেটা ভুবনবাবু বলেছিল, কিন্তু দুজনের মধ্যে বয়সের এত তফাত সেটা বৈশালী ভাবতেও পারেনি।

এমন সৌন্দর্য সচরাচর দেখা যায় না। তার ওপর সদ্যপ্রাপ্ত বিষাদের ছায়া সে সৌন্দর্যকে যেন আরো পবিত্র করে তুলেছে।

দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন মিসেস বাজপেয়ী।

আমার নাম দীপালী বাজপেয়ী। দীপালী বসতে বসতে বলল।

আপনি মথুরায় ছিলেন শুনেছিলাম।

হ্যাঁ, মা-বাবা তীর্থ করতে গিয়েছিলেন। আমি তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলাম। কয়েকদিন আগে এসেছি।

আপনাকে কতকগুলো কথা জিজ্ঞাসা করব দীপালীদেবী।

বলুন।

আপনি হয়তো ইতিমধ্যে শুনেছেন, ভুবনবাবুর পকেটে একটা নকল ময়ূর পাওয়া গিয়েছে। নকল অর্থাৎ ঝুটো কাঁচ বসানো। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা যে, আততায়ী আসল ময়ূরটা নিয়ে গিয়ে নকল ময়ূরটা রেখে যাবার মতন এত প্রচুর সময় পেল কি করে! গঠনকৌশলে দুটো ময়ূরই এক ধরনের। এতে বোঝা যায় যে, দুর্বৃত্ত আসল ময়ূরটা খুব ভালভাবেই দেখেছে, তা না হলে ঠিক একই রকমভাবে নকল ময়ূর তৈরি করতে পারত না।

NOT FOR SALE

দীপালী খুব মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শোনবার চেষ্টা করল। তারপর খুব মৃদুকণ্ঠে বলল, আপনার অনুমান ঠিক নয়, মিসেস ব্যানার্জি।

অনুমান ঠিক নয়?

না।

কি রকম?

নকল ময়ূরটা বাইরের কোন লোক রেখে যায়নি। সেটা মিস্টার বাজপেয়ীর পকেটেই ছিল।

তার মানে?

মানে, মিস্টার বাজপেয়ী যখনই আসল ময়ূরটা সঙ্গে নিয়ে যেতেন, তখনই নকল ময়ূরটাও তিনি কাছে রাখতেন। ওটা তিনিই কারিগর দিয়ে তৈরি করেছিলেন।

বৈশালী দুটো হাত গালে রেখে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। একটু পরে অনেকটা আত্মগতভাবে বলল, তার মানে মিস্টার বাজপেয়ী জানতেন এই ময়ূরটার ওপর বাইরের লোকের লোভ আছে! তাদের চোখে ধূলো দেবার জন্যই নকল ময়ূরটা কাছে রাখতেন। তাই না?

সম্ভবত।

একটু থেমে দীপালী আবার বলল, একথা তিনি কোনদিনই আমার সঙ্গে আলোচনা করেননি। তবে তাঁর হাবেভাবে আমার সন্দেহ হতো। সব দরজা-জানলা বন্ধ করে যখন ময়ূরটা দেখতেন, কোথাও একটু আওয়াজ হলেই চমকে উঠতেন। তারপর যখন ময়ূরটা নিয়ে মাঝে মাঝে বাইরে যেতেন, দেখতাম ভীষণ সাবধান হতেন। কোথায় যাবেন কাউকে বলতেন না।

আপনাকেও না?

মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে খুব মৃদুকণ্ঠে বলল, না, আমাকেও নয়।

আপনি কি আন্দাজ করতে পারেন, এই ময়ূরের ব্যাপারে কাদের আগ্রহ ছিল?

কিছুক্ষণ নীরব থেকে দীপালী বলল, সকলের কথা বলতে পারি না। তবে একজনের কথা জানি।

বৈশালী মেরুদণ্ড টান করে বসল।

কে সেই একজন?

অতীন।

অতীন? অতীন কে?

মিস্টার বাজপেয়ীর ছেলে।

তিনি বর্মায় থাকেন, না?

NOT FOR SALE

হ্যাঁ, থাকে। কিন্তু দু-তিন মাস অন্তর সে এখানে আসে। কয়েকমাস আগে একটা কলহ আমার কর্ণগোচর হয়েছিল।

কিসের কলহ?

এই ময়ূর নিয়ে। শুধু ময়ূর নয়, কিছু দামী রত্ন নিয়ে।

কি ধরনের ঝগড়া?

মনে হলো বিষয় ভাগাভাগির ব্যাপার। মিস্টার বাজপেয়ীর ধনরত্নের একটা কারবার ছিল শুনেছেন কি?

হ্যাঁ শুনেছি। আন্তর্জাতিক চোরাকারবারীর সঙ্গে তাঁর ব্যবসার লেনদেন ছিল। সেটা কি আপনি জানেন?

না, জানি না। এ আমি বিশ্বাসও করি না।

দীপালীর কণ্ঠস্বর রীতিমত দৃঢ়।

বৈশালী এবার অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করল।

আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না দীপালীদেবী।

দীপালী বৈশালীর দিকে চোখ তুলে দেখল।

এই ময়ূরের চোখের জোড়া রুবির দাম এমন কিছু বেশী নয়। সাধারণ রুবির চেয়ে কিছু বেশী হতে পারে, কারণ সচরাচর এত বড় রুবি দেখা যায় না। কিন্তু এর জন্য এত বড় একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে যাবে, এটাই আমার কাছে খুব বিস্ময়ের মনে হচ্ছে। ভুবনবাবুর কাছে নিশ্চয় এর চেয়ে আরো অনেক দামী রত্ন ছিল, তাই না দীপালীদেবী?

আমার পক্ষে এর কোন সদুত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

আচ্ছা, আপনাদের ড্রাইভার, যিনি ভুবনবাবুর গাড়ী চালাতেন, তিনি কি বিশ্বাসী?

সম্পূর্ণ।

তাঁর নাম কি?

নিখিল কোণার।

কত বছর আছেন আপনাদের কাছে?

শুনেছি, প্রায় বিশ বছর। খুব নির্ভরযোগ্য ড্রাইভার।

হঠাৎ দীপালী সাশ্রুনয়নে বলে উঠল, শুধু আসল ময়ূরটাই নয়, আমার স্বামীর হত্যাকারীকেও আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে।

আপনার স্বামীর হত্যাকাণ্ডের ব্যাপার পুলিশের হাতে। তাঁরা যথাসাধ্য করছেন। কিন্তু আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন? ভুবনবাবুর কাছে কখনো কিছু শুনেছিলেন?

মিস্টার বাজপেয়ী যখন ময়ূরের চোখের একটা পাথর চুরি যাবার কথা আমাকে লিখেছিলেন, তখনই তাঁকে আমি আপনার হাতে কেসটা দেবার

NOT FOR SALE

কথা জানাই। কারণ, এ বিষয়ে আপনার খ্যাতির কথা আমার বাবার কাছে বহুবার শুনেছি।

আপনার বাবার নাম কি?

সূরজমল খেত্রী।

সূরজমল খেত্রী তো বিখ্যাত জহুরী। তাঁর রত্নের কারবার সারা ভারতবর্ষে ছড়ানো। আমার অনেকগুলো কেসে রত্ন যাচাই করার ব্যাপারে তাঁর সাহায্য নিয়েছিলাম।

একটু পরে বৈশালী প্রশ্ন করল, আচ্ছা, যে সিন্দুকে এই ময়ূর থাকত, তার একটা বাড়তি চাবি আপনার কাছে থাকে?

হ্যাঁ, সে চাবি আমি মথুরা নিয়ে গিয়েছিলাম। এই যে সেই চাবি।

দীপালী উঠে দাঁড়িয়ে উঠে কোমর থেকে সাদা রেশমের শাড়িটা সরিয়ে ফেলল। রূপোর কোমরবন্ধ। তাতে অনেকগুলো চাবি আটকানো।

বৈশালী একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ দীপালীর কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙল।

আপনার কত ফি আমার জানা নেই। আপাতত এই টাকা ক'টা রাখুন।

বৈশালী চোখ তুলে দেখল, দীপালীর প্রসারিত হাতে এক গাদা নোট।

বৈশালী হাত নাড়ল।

এখন আপনি টাকাগুলো রেখে দিন। আমি ভুবনবাবুকে বলেছিলাম, আপনাকেও বলছি, একবার আমি শিলাগড়ে গিয়ে নিজের চোখে সব দেখতে চাই। তারপর স্থির করব, কেসটা নেব কি না। যখন কেসটা হাতে নেওয়া ঠিক করব, তখন আমার ফিয়ের কথা আপনাকে জানাব। বসুন, একটু চায়ের কথা বলে আসি।

না, দীপালী বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় নাড়ল, আমি কিছু খাব না। আমার অশৌচ চলছে।

ও মাপ করবেন। আমার খেয়াল ছিল না। বৈশালী বিব্রত কণ্ঠে বলল।

দীপালী জিজ্ঞাসা করল, কবে আপনি শিলাগড়ে আসতে পারবেন?

আমার মনে হয় এখন আপনারা ভুবনবাবুর কাজের জন্য ব্যস্ত থাকবেন। ক্রিয়াকর্ম হয়ে যাক, তারপর যাব।

বেশী দেরী হয়ে যাবে না? আমার ইচ্ছা আপনি আরো আগে আসুন।

বৈশালী কিছুক্ষণ কি ভাবল, তারপর প্রশ্ন করল, আচ্ছা, এই ক্রিয়া উপলক্ষে অতীনবাবু কি বর্মা থেকে আসবেন?

হ্যাঁ; অতীন একমাত্র পুত্র। সব কাজ তো তাকেই করতে হবে।

তিনি কি এখানে কিছুদিন থাকবেন?

NOT FOR SALE

বলতে পারি না। অতীনের যাওয়া-আসা সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না।

অতীনবাবু শিলাগড়ে এলে আমাকে খবর পাঠাবেন।

আমি আপনাকে ট্রাঙ্ক কল করে দেব।

বেশ, সেই ভাল।

আজ আমি চলি। নমস্কার। দীপালী উঠে দাঁড়াল।

আপনি কি আজ রাতেই শিলাগড় ফিরে যাবেন?

না, আজ আমি এখানে এক আত্মীয়ের বাড়ি রাত কাটাব। কাল ভোরে রওনা হব।

॥ চার ॥

দীপালী ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পরও একটা দামী সুরভি বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল। শোকাচ্ছন্ন পরিবেশে এ ধরনের উগ্র গন্ধসার কিছু পরিমাণে অস্বাভাবিক।

বৈশালী জানলায় গিয়ে দাঁড়াল।

রাস্তার ওপর হালকা নীল অ্যাম্বাসাডর। উর্দিপরা এক ড্রাইভার দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে।

দীপালী মোটরে উঠল।

মোটর রওনা হয়ে যেতে বৈশালী কৌচে ফিরে এল।

এখন আর কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না।

বৈশালী চুপচাপ বসে রইল।...

আসতে পারি ম্যাডাম?

কণ্ঠস্বরেই চেনা গেল, তবু বৈশালী মাথাটা ঘুরিয়ে দেখল।

আরে এসো, এসো, তোমার কথাই ভাবছিলাম।

সুশ্রী, গৌরবর্ণ দীর্ঘ চেহারার একটি যুবক ঢুকল।

পরনে সাদা টেরিলিনের সার্ট, চকোলেট রংয়ের টেরিকটের প্যান্ট। উজ্জ্বল দুটি চোখ, ঠোঁটের গড়নে হাসি মাখানো।

সুজিত। বিদেশী একটা ফার্মের কেমিস্ট। বৈশালীর সঙ্গে আলাপ বিলাতে।

এস কেমিস্ট, তোমার কথাই ভাবছিলাম।

কি ভাগ্য আমার!

সুজিত এসে বৈশালীর পাশে বসল।

একটা মুস্কিলে পড়েছি। বৈশালী বলল।

তোমার কাজই তো ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।

শিলাগড়ের কেসটা শুনেছ?

NOT FOR SALE

দোহাই তোমার। আমাকে ওয়াটসন তৈরি করো না। আমি নিজের কাজ নিয়ে যথেষ্ট বিব্রত আছি।

কি খাবে বলো?

আপাতত এক কাপ চা দিয়ে তো শুরু করো।

বৈশালীকে উঠতে দেখে সুজিত বলল, আহা, তুমি উঠছ কেন? বাহাদুরকে বলে দাও না।

কিন্তু বৈশালীকে উঠতেই হলো।

টেলিফোনটা ঝঙ্কার তুলে চলেছে।

বৈশালী ফোন তুলে চুপ করে কি শুনল, তারপর বলল, সেকি ডাক্তার কি বলে?

তারের ওপার থেকে কি উত্তর এল শোনা গেল না।

বৈশালীর মুখ রীতিমত করুণ ঠেকল।

একটু পরে বৈশালী কৌচে ফিরে এল।

সুজিত কিছুক্ষণ তাকে জরিপ করে বলল, খারাপ খবর?

হুঁ। শিলাগড়ের ভুবন বাজপেয়ী কিছুদিন আগে নিহত হয়েছেন। আজ সত্যেনবাবু বললেন, তাঁর ড্রাইভারটিও মারা গেছে।

সেও কি গুলিতে নাকি?

না, কি একটা নারকোটিক প্রয়োগে তাকে প্রায় বোবা করে রাখা হয়েছিল। সেই অবস্থাতেই হাসপাতালে মারা গেছে।

যাক, তোমার একটা সুবিধা হলো। সুজিত বলল।

কি সুবিধা?

সম্ভাব্য অপরাধীর সংখ্যা একজন কমল।

কমল?

তা ছাড়া আর কি! তোমরা তো থিয়োরি অব এলিমিনেশন নীতি অনুসরণ করো। কতকগুলো সম্ভাব্য অপরাধীর তালিকা ঠিক করো, তারপর বাদ দিতে দিতে মারাত্মক এক অবস্থায় উপনীত হও।

কি মারাত্মক অবস্থা?

শেষ পর্যন্ত দেখা যায় শুধু গোয়েন্দাই বাকি আছে।

কথা শেষ হতে দুজনেই হেসে উঠল।

বৈশালী বলল, এক কাজ করো।

কি?

আজ রাতে এখানে খেয়ে যাও।

আপত্তি নেই। তবে মাকে একবার ফোন করে দিতে হবে।

NOT FOR SALE

ঠিক আছে। মাসিমাকে আমি বলে দিচ্ছি।

বৈশালী উঠে গিয়ে ফোন করে এল।

তারপর ফিরে এসে কৌচের ওপর ভালভাবে বসে বলল, সুজিত, অফিস থেকে ক'দিন ছুটি নিতে পারবে?

তা পারি। কেন, দার্জিলিং যাবে?

না, শিলাগড়।

কপট আক্ষেপে সুজিত নিজের কপাল চাপড়াল।

হা হতোস্মি। আমি ভাবলাম—দারুণ অগ্নিবাণে রে, আমাকে নিয়ে শৈলবাসে যাবার বাসনা, তা নয়, সেই শিলাগড়। তোমার ঘটনাস্থলে।

চলই না। রহস্যটা দেখে আসা যাক।

তথাস্তু।

দিন কয়েক পরে বৈশালীর মোটর শহরের বিখ্যাত জুয়েলার্স রতনরাম রাজঘরিয়ার দোকানের সামনে থামল।

বৈশালী নামতেই কর্মচারীরা এগিয়ে এল।

বৈশালী জিজ্ঞেস করল, পুণামচাঁদ আছেন?

হ্যাঁ, আছেন।

বৈশালী তার নামের কার্ড এগিয়ে দিল।

এটা দিয়ে দেবেন।

কার্ড পাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রোপ্রাইটার পুণামচাঁদ বেরিয়ে এল।

আসুন বৈশালী দেবী, গরীবের দোকানে কি মনে করে?

পুণামচাঁদের পিছন পিছন বৈশালী তার কামরায় ঢুকল।

সারি সারি লোহার সিন্দুক। সামনে কাঁচে ঢাকা টেবিল। তার ওপর গোটা তিনেক আতস-কাঁচ।

কি খাবেন বলুন? একট কোকাকোলা আনাই?

কিছু লাগবে না। আপনার কাছে একটা কথা জানতে এলাম।

বলুন, বলুন।

আপনাদের কারবার তো বহুদিনের।

হ্যাঁ, আমার ঠাকুরদা এর পত্তন করেন। এখন তো আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে এক রকম চলছে। লণ্ডনেও আমাদের ব্রাঞ্চ আছে। তবে একটা কথা, রাজারাজড়াদের যুগ শেষ হয়ে যাবার পর তেমন দরাজ-দিল খরিদ্দার নেই। মনে আছে, বাবা গায়কোয়াড়কে একটা হীরা বিক্রি করেছিলেন এক লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার টাকায়। এখন আর সে সব লোক কোথায়!

আচ্ছা চুনি কোন্ দেশের সব চেয়ে ভাল?

NOT FOR SALE

চুনি? বর্মার চুনিরই নাম খুব বেশী? ওখানকার মোগক মাইন বিখ্যাত।

সব চেয়ে মূল্যবান চুনি কত টাকায় বিক্রি হয়েছে বলতে পারেন?

এক মিনিট। আমাকে বই দেখে বলতে হবে।

পুণামচাঁদ ড্রয়ার খুলে কালো মোটা একটা বই বের করল।

হিন্দিতে 'রত্নদর্পণ' বলে একটা পত্রিকা প্রকাশিত হতো, তার বেশ কয়েক বছরের সংখ্যা একত্রে বাঁধানো। কিছুক্ষণ ধরে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে পুণামচাঁদ এক জায়গায় থামল।

বলল, এই যে এখানে রয়েছে। চুনির দাম নিরূপিত হয় তার ঘন রক্তাভা আর গঠন সৌকর্যের ওপর। সব চেয়ে মূল্যবান চুনি ছিল সুপিয়ালার ব্রোচে। বর্মার শেষ স্বাধীন রাজা থিব। তার পত্নী রাণী সুপিয়ালা। বর্মার পতনের পর এক জেনারেল বিলাতে লেডি ব্রুমফিল্ডের কাছে এই চুনিটা বিক্রি করে ত্রিশ হাজার টাকায়। তবে একথাও এখানে লেখা আছে, সব দিক বিবেচনা করে দেখলে এর দাম পনের হাজারের বেশী হওয়া অনুচিত।

তা হলে জহুরীদের মতে এ পর্যন্ত সব চেয়ে ভাল চুনির মূল্য পনের হাজারের বেশী নয়?

তাই তো লিখেছে।

আচ্ছা চলি।

উঠবেন? আপনার শরীর ভাল আছে?

ভালই আছে। ধন্যবাদ।

বৈশালী মোটরে উঠল।

বাড়ি ফিরল না। সোজা গেল ন্যাশনাল লাইব্রেরি। সেখানে বই খুলে কিছু নোট নিল।

পুণামচাঁদ ঠিকই বলেছে, চুনির দাম খুব বেশী নয়।

সব চেয়ে মহার্ঘ চুনির যদি এই মূল্য হয় তাহলে ময়ূরের রুবির চোখের কত দাম হবে? একটা পাথর খুব বেশী হলে পাঁচ হাজার। তার বেশী নয়।

আসল ময়ূরটা থাকলে জহুরীদের কাছে যাচাই করে নেওয়া যেত।

এখন আর সেটা সম্ভব নয়।

এই সামান্য টাকার জন্য এত বড় হত্যাকাণ্ড? দুটো প্রাণ বিনষ্ট হলো।

বৈশালীর মনে হলো, এর মধ্যে আর কোন রহস্য আছে। গূঢ়তর কিছু।

দিন দুয়েক পরেই ট্রাঙ্ক কল এল।

তখনও ভাল করে আলো ফোটেনি।

বৈশালীর ঘুম খুব সজাগ। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

শিলাগড় থেকে দীপালী বাজপেয়ী।

NOT FOR SALE

বলুন, আমি বৈশালী কথা বলছি।

অতীন কাল এসেছে। আমার স্বামীর কাজ মঙ্গলবার। আপনি আজ আসতে পারবেন?

আজ পারব না। কাল ভোরে রওনা হব। ঘন্টা পাঁচেক লাগবে বোধ হয়।

ওই রকম।

আমার সঙ্গে একটি ভদ্রলোক থাকবেন।

ঠিক আছে। শুনুন, বলে দিই, আসানসোলে পার হবার পর সোজা রাস্তাটা গেছে ধানবাদের দিকে। আপনি বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরবেন। শিলাগড়ে পৌঁছে ভুবন-নিবাসের নাম করলেই সবাই দেখিয়ে দেবে। তা হলে কাল আসছেন?

হ্যাঁ।

দীপালী লাইন ছেড়ে দিল।

বেলা আটটা নাগাদ বৈশালী দুটো ফোন করল।

একটা সুজিতকে। কাল রওনা হবার কথা জানাল। ভোর পাঁচটায় বৈশালী রওনা হবে। সুজিতকে বাড়ি থেকে তুলে নেবে। সে যেন তৈরি থাকে।

দ্বিতীয় ফোন করল সত্যেন রায়কে।

কুশল প্রশ্নের পর খোঁজ নিল। ভুবন বাজপেয়ীর খুনের কোন কিনারা হলো?

কই আর হলো! দুজনকে সন্দেহক্রমে ধরা হয়েছে। পুলিশ তাদের ধোলাই দিয়েছে।

আর কিছু?

কতকগুলো জহুরীর দোকানে খানাতল্লাসী করা হয়েছে। এরাই সব চোরাই পাথর কেনা-বেচা করে, কিন্তু কিছু পাওয়া যায়নি। তুমি কিছু কিনারা করতে পারলে?

না, কাল আমি শিলাগড় যাচ্ছি।

পুলিশের সাহায্যে দরকার?

পুলিশের সাহায্য?

মানে, সাদা পোশাকে বডিগার্ড?

না, না। সে সবের দরকার নেই। সুজিত যাচ্ছে আমার সঙ্গে।

পরের দিন ভোর চারটে থেকে বৈশালী তৈরি হতে লাগল। পোশাক পরা শেষ হতে কোমরের চামড়ার বন্ধনীর সঙ্গে ছোট রিভলবার আটকে নিল। এটা বিদেশ থেকে কেনা। এ ধরনের কাজে বৈশালীর সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তবে এ পর্যন্ত ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়নি।

সুজিতের বাড়ির সামনে পৌঁছে দেখল, গেটের সামনে সুজিত দাঁড়িয়ে আছে।

NOT FOR SALE

পিছনে তার মা।

বৈশালী মোটর থেকে নেমে সুজিতের মাকে প্রণাম করল।

আপনি আবার এত ভোরে উঠেছেন কেন মাসিমা?

সুজিতের মা হাসল।

ওমা, উঠব না! তুমি জয়যাত্রায় চলেছ। খুব সাবধান মা। চারদিকে চোখ-কান সজাগ রেখে চলাফেরা করবে।

॥ পাঁচ ॥

ভুবন-নিবাস পৌঁছতে প্রায় বারোটা হয়ে গেল।

বৈশালীর ধারণা ছিল বিরাট এক প্রাসাদ হবে, কিন্তু সেরকম কিছু নয়, দোতলা বাড়ি। পুরানো আমলের। চারপাশে প্রচুর জায়গা। ফলফুলের বাগান।

লোহার গেট আছে। গেটে পাগড়ি-আঁটা দারোয়ান। সেলাম করে গেট খুলে দিল।

বাড়ির সামনের কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করে মেরাপ বাঁধা হয়েছে। ডেকরেটররা তখনও সাজাচ্ছে।

মোটর থামতেই একটি ভদ্রলোক সামনে এসে দাঁড়াল। রং ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, কোটরাগত চোখ, রুক্ষ চেহারা।

আমি অতীন বাজপেয়ী।

কণ্ঠস্বর চেহারার মতনই রুক্ষ।

বৈশালী নিরীক্ষণ করে দেখল। তারপর বলল, আপনি বর্মায় থাকেন?

হ্যাঁ।

বর্মায় কোথায়?

বর্মা সম্বন্ধে আপনার কিছু জানা আছে?

না, বিশেষ কিছু জানা নেই। ভূগোলে যেটুকু পড়েছি।

আমি থাকি কেমেনডাইনে। রেঙ্গুনের কাছেই।

কাঠের ব্যবসা করেন?

ওই সামান্য।

আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

বেশ তো, হবে কথা। আপনারা বিশ্রাম করে নিন।

কথা শেষ করে অতীন ডাকল, চরণ, চরণ।

একটি ভৃত্য এসে দাঁড়াল।

এঁদের অতিথি কুটিরে নিয়ে যাও।

NOT FOR SALE

সুজিত জিজ্ঞাসা করল, মোটরটা কোথায় রাখব?

অতিথি কুটিরের সঙ্গেই গ্যারাজ আছে। অতীন জানাল।

ভুবন নিবাসের পিছনেই একতলা বাড়ি। সঙ্গে দুটি গ্যারাজ।

চরণের নির্দেশে সুজিত মোটরটি একটি গ্যারাজে ঢোকাল।

তারপর এদিকের ঘরের চাবি খুলে দিতে বৈশালী আর সুজিত ঘরের মধ্যে গেল।

একটা বসবার ঘর। কৌচ সোফা সাজানো, সামনে ফালি বারান্দা। ভিতরে শোবার ঘর। পাশাপাশি দু'টি খাট।

শোবার ঘরের ব্যবস্থা দেখে বৈশালী আরক্ত হয়ে উঠল।

মুখে বলল, অতীনবাবুকে বলতে হবে আমাদের আর একটা শোবার ঘর দরকার।

সুজিত বলল, কেন, আমি না হয় বাইরের ঘরে কৌচের ওপর কাটিয়ে দেব। ক'টা রাতের ব্যাপার বল তো?

কি জানি, নিজেই আমি জানি না।

মিনিট কুড়ির মধ্যে অতীন এল।

পিছনে ভৃত্যের হাতে চায়ের সরঞ্জাম।

প্রচুর ফল আর মিষ্টি।

চা খেয়ে নিয়ে আপনারা স্নান সেরে নিন। আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা তো ভিন্ন, নইলে একসঙ্গেই খাওয়া যেত।

আমরা স্নান সেরে এসেছি। আপনারা চা পানের যে এলাহি আয়োজন করেছেন, তারপর এবেলা আর কিছু খাওয়ার প্রয়োজন হবে বলে মনে করি না।

কি যে বলেন! অতীন বিনীতকণ্ঠে বলল।

আমাদের একটা কথা ছিল।

কি বলুন!

আমাদের আর একটা শয়নঘরের প্রয়োজন হবে।

কয়েক মুহূর্ত অতীন বৈশালী আর সুজিতের দিকে ফিরে কি ভাবল, তারপর বলল, ঠিক আছে, পাশের ঘরের বেডরুমটাও খুলে দিতে বলছি। দয়া করে আপনাদের যখন যা অসুবিধা হবে জানাবেন। বুঝতেই পারছেন, এ সময়ে আমরা একটু ব্যস্ত রয়েছি। বাবার কাজের জন্যে।

এখন মিনিট পনের আপনার সময় হবে?

মিনিট পনের? খুব হবে।

দয়া করে বসুন না!

NOT FOR SALE

সামনের কৌচে অতীন বসে পড়ল।

আপনার বাবার কোন শত্রু ছিল?

অতীনের মুখে একটু চিন্তার ছায়া পড়ল।

শত্রু, তেমন শত্রু তো কাউকেই মনে পড়ছে না। তবে ব্যবসা করতে গেলেই তো কিছু শত্রুর সৃষ্টি হয়, জানেন।

আপনাকে স্পষ্ট করে বলতে চাই অতীনবাবু, আমরা বিশ্বাস করি না যে, সামান্য দামের রুবির জন্য কেউ আপনার বাবাকে এভাবে হত্যা করবে। উদ্দেশ্য নিশ্চয় আরো গভীর। সেই উদ্দেশ্য খুঁজে বের করার ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই। আশা করি আপনার কাছ থেকে অকৃপণ সাহায্য পাব।

নিশ্চয়। আমি যতটুকু জানি, সবই আপনাদের বলব।

আপনার সঙ্গে ভুবনবাবুর সম্পর্ক কেমন ছিল?

ভালই।

মাঝে মাঝে বচসা হতো শুনলাম।

অতীনের দুটি ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে এল।

কে বলেছে? কার কাছে শুনেছেন?

বৈশালী কোন উত্তর দিল না।

অতীনই আবার বলল, নতুন মা বলেছে?

বচসা হতো কিনা বলুন না? এবার বৈশালী কণ্ঠস্বরে জোর দিল।

কয়েকবার হয়েছে।

সম্পত্তি নিয়ে?

না, সম্পত্তির ওপর আমার লোভ নেই। আমি একলা মানুষ। বর্মায় আমার যে কাঠের কারবার আছে, তাতে ভালভাবেই চলে যায়।

তবে?

অতীন একটু ইতস্তত করল। কথাটা বলবে কিনা সে সম্বন্ধে দ্বিধাবোধ।

বৈশালীর সেটা বুঝতে অসুবিধা হলো না।

শুনুন, একটা কথা বলি। আমাদের কাছে লুকোচুরি করে কোন লাভ নেই। বরং সব কিছু পরিষ্কারভাবে জানালেই আপনার পক্ষে মঙ্গল।

অতীন নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল।

মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা কি বলছেন বুঝতে পারছি না। কথাটা বলতে এখন আর বিশেষ বাধা নেই।

বলুন—

বাবার ওইসব রত্নের ব্যাপারে কিছু চোরাকারবারির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। আন্তর্জাতিক চোরাকারবারি। বাবার ইচ্ছা ছিল বর্মায় এদের সঙ্গে আমি

NOT FOR SALE

যোগসূত্র রাখি। যাতে তাঁর কারবারটা আরো প্রসার লাভ করে। কিন্তু এ সব ব্যাপারে আমার একেবারেই আগ্রহ ছিল না। আগেই তো বললাম আপনাদের, সামান্য ব্যবসায় আমার চলে যায়। আমি বাবাকে অনেক বুঝিয়েছিলাম, এসব খেলার মধ্যে বিপদ আছে। শুধু মান নিয়ে নয়, প্রাণ নিয়েও টানাটানি। তাছাড়া, পুলিশের নজরও বাবার ওপর ছিল, তাও জানি।

কিন্তু আপনার বাবার তো অন্য ব্যবসাও ছিল?

অন্য ব্যবসা ভাল চলছিল না। যে টিলা ইজারা নিয়ে কয়লার ব্যবসা শুরু করেছিলেন, সেখানে কয়লা বিশেষ পাওয়া গেল না। একটা স্তরেই শেষ। অভ্রের কারবারে শরিকের সঙ্গে গোলমাল চলছিল। কোর্ট অবধি মামলা গড়িয়েছিল। একমাত্র সম্বল ছিল সোনা আর পাথরের ব্যবসা। আমি বর্মা থেকে চুনি জোগাড় করে পাঠাতাম। তাতে বিশেষ কিছু পাওয়া যেত না। লাভ হীরা আর সোনায়। বাবার ঝোঁক ছিল সেদিকে।

চকিতের জন্য বৈশালীর মনে হলো, এমন তো নয় ময়ূরটার অভ্যন্তরে সোনার পাত দেওয়া ছিল, কিংবা সোনার তাল লুকানো ছিল, সেইজন্য তার আকর্ষণ এত বেশী!

কিন্তু না, বৈশালী ময়ূরটা হাতে করে দেখেছে। ওজন মোটেই তেমন বেশী মনে হয়নি। সোনা ওজনে রীতিমত ভারি।

নিন, আপনারা খেয়ে নিন। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমি একবার ওদিকটা দেখে আসি। বলে অতীন বেরিয়ে গেল।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে বৈশালী বলল, সুজিত ব্যাপারটা কি মনে হচ্ছে?

ভদ্রলোকের হঠাৎ এভাবে চলে যাওয়ার ধরনটা আমার ভাল লাগল না। সুজিত বলল।

বাপ অসৎ পথে যাচ্ছেন, আর ছেলে নিবৃত্ত করতে চাইছে, এই নিয়ে বচসা, এটার চেয়ে চোরাকারবারের অংশ নিয়ে চেঁচামেচি, সেটা আরো স্বাভাবিক মনে হয় না?

কিন্তু বাপকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে কি লাভ হলো?

সেটাই ভাবছি। ভুবন বাজপেয়ীর উইলের খবর নিতে হবে।

উইলে কি চোরাই ধনরত্নের উল্লেখ থাকবে?

বৈশালী মুচকি হাসল, অবশ্যই না। চোরাই ধনরত্ন অর্থে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কালো টাকা সাদা হওয়ার মতন।

সুজিত জিজ্ঞাসা করল, ভুবনবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে কখন দেখা হবে?

উৎকণ্ঠিত হয়ো না। ভদ্রমহিলা যখন আমন্ত্রণ করে এনেছেন, একবার নিশ্চয় দেখা দেবেন।

NOT FOR SALE

আরো ঘণ্টাখানেক পরে আহারের ডাক এল। খাওয়ার ব্যবস্থা ভুবন-নিবাসে।

টেবিল-চেয়ার নয়, মোজেইক মেঝের ওপর কার্পেটের আসন। রুপোর থালা গ্লাস।

বৈশালী আর সুজিত গিয়ে বসল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের পর্দা ঠেলে দীপালী এসে দাঁড়াল।

সাদা কাপড়ের ওপর ছোট একটা চাদর জড়ানো। চোখে-মুখে বিষাদের আভা।

আপনাদের খুব কষ্ট হলো।

না, না, কষ্ট আর কি, বৈশালী বলল, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা খুবই চমৎকার।

ঠিক এখন আমাদের পক্ষে আপনাদের তেমন ভাবে তদারক করা কিছুটা অসুবিধাজনক, সেটা মনে রেখে আমাদের ত্রুটি ক্ষমা করবেন।

ওভাবে বলে আমাদের অপরাধী করবেন না। অতীনবাবুর সঙ্গে দেখা হবে না তাই, না হলে আপনাদের ক্রিয়াকর্ম চুকে গেলেই আমরা আসতাম।

অতীনের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

অতীনের নামোচ্চারণের সঙ্গেই দীপালীর কণ্ঠ কিঞ্চিৎ রুক্ষ হয়ে উঠল।

হ্যাঁ, হয়েছে। তিনি অতিথি-কুটিরে আমাদের তদারক করছিলেন।

ইতিমধ্যে পাচক আহার্য নিয়ে আসাতে কথোপকথনে ছেদ পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে দীপালী প্রশ্ন করল, আপনারা কতদিন এখানে থাকবেন?

দিন দুয়েকের বেশী দরকার হবে না।

বিশেষ কিছু যদি দেখতে চান, বলতে পারেন।

ভুবনবাবুর সিন্দুক যে ঘরে থাকত, সে ঘরটা একবার দেখার ইচ্ছা। মানে তার শোবার ঘর।

বেশ, বিশ্রাম করে নিন। বিকালে দেখবেন।

আহার শেষ হতে ভৃত্যের সঙ্গে অতিথি-কুটিরে ফিরে আসতে গিয়ে বৈশালী হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। একেবারে কোণের একতলা ঘরের দরজা সম্পূর্ণ খোলা। একটি সুপুরুষ যুবক জানলার কাছে দাঁড়িয়ে। পরনে সিল্কের গেঞ্জী, গোলাপী পায়জামা।

বৈশালীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই যুবকটি মুখ ফিরিয়ে নিল।

কিছুটা এসে বৈশালী ভৃত্যকে প্রশ্ন করল, এতকলায় যাঁকে দেখলাম উনি কে?

ভৃত্য বলল, ওঁর নাম বলতে পারব না। বেখাপ্পা নাম। উনি বাঙালী নন।

বাঙালী যে নয়, সেটা মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

NOT FOR SALE

মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের মুখ-চোখ, কিন্তু বেশ দীর্ঘ।

বৈশালীর মনে পড়ে গেল।

উনি বোধহয় অতীনবাবুর সঙ্গে এসেছেন?

ভৃত্য ঘাড় নাড়ল। আজ্ঞে হ্যাঁ। দাদাবাবুর কারবারের লোক।

খুব আসেন বুঝি?

হ্যাঁ, প্রায়ই আসেন। বাবুর কাছে খুব আসতেন।

এই সময় বৈশালীর মনে পড়ে গেল, লোকটার নাম মঙ শান।

অতিথি-কুটিরে ঢুকে সুজিত জিজ্ঞাসা করল, এখন তোমার প্রোগ্রাম কি?

এক ঘন্টা দিবানিদ্রা। তুমি এ ঘরে শোও, আমি পাশের ঘরে যাচ্ছি।

বৈশালী শুল বটে, কিন্তু ঘুমাল না। একটা হাত দিয়ে চোখ ঢেকে পড়ে রইল।

অতীন যখন আবার এসে দাঁড়াল, তখন রোদ কমে এসেছে। ভৃত্য বাগানে বেতের চেয়ার-টেবিল পেতে দিয়েছে।

বৈশালী আর সুজিতের চা খাওয়াও শেষ।

কিছু মনে করবেন না, আমি কালকের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, অতীন বলল।

আপনি কতদিন আছেন এখানে?

আমি ভাবছি দিনদুয়েক পরেই রওনা হব, কারণ ওখানে আমার কারবার দেখার কেউ নেই।

তার ওপর মঙ শানও তো এখন এখানে। বৈশালীর এই কথায় অতীন যেন একটু অপ্রতিভ হলো, তারপর সামলে নিয়ে বলল, মঙ শান আমার কাঠের কারবার দেখে না। ও পাথর খুব ভাল চেনে। তাতেই আমাকে সাহায্য করে।

মঙ শানের সঙ্গে একটু আলাপ করতে পারলে খুশী হতাম।

বেশ তো, আমি ডেকে পাঠাচ্ছি।

এক ভৃত্যকে ডেকে অতীন মঙ শানকে আসতে বলল।

আচ্ছা, একটা কথা ভাবছিলাম।

বলুন।

সচরাচর বর্মীরা খুব দীর্ঘকায় হয় না, বরং বেঁটেই হয়, অথচ আপনার মঙ শান বেশ লম্বা।

দেখা হয়েছে আপনাদের সঙ্গে?

আমরা যখন আহার সেরে বের হচ্ছিলাম, দেখলাম একতলার ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন।

ও, মঙ শান ঠিক বর্মী নয়, ও জেরবাদী। ওর বাপ মুসলমান। সুরাটের মুসলমান, আর মা বর্মী। তাই মঙ শান অত লম্বা।

NOT FOR SALE

একটু থেমেই অতীন বলল, মঙ শান অবশ্য এসব ব্যাপারের কিছু জানে না।

কি সব ব্যাপারের?

এই বাবার মৃত্যু সম্বন্ধে।

জানেন না মানে? নিশ্চয় শুনেছেন, সংবাদপত্রেও পড়ে থাকবেন।

তা হয়তো পড়েছে, কিন্তু ওই পর্যন্ত। আর কিছু জানে না।

বৈশালী আর কথা বাড়াল না।

রাস্তার প্রান্তে মঙ শানকে আসতে দেখা গেল।

এবার পরনে দামী সুট। হাতে ফেল্ট হ্যাট।

বৈশালী অতীনের দিকে ফিরে বলল, একটা কথা অতীনবাবু, মঙ শানের সঙ্গে একান্তে দু-একটা কথা বলতে চাই। আপনার থাকবার দরকার নেই।

বেশ।

মনে হলো অতীন যেন একটু অনিচ্ছাসত্ত্বেই স্থান পরিত্যাগ করল।

একটু পরে মঙ শান এসে দাঁড়াল।

বসুন মঙ শান, আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই। বৈশালী ইংরেজি বলল।

চেয়ার টেনে বসতে বসতে মঙ শান বলল, আমার সৌভাগ্য।

আপনি কতদিন অতীন বাজপেয়ীর সহকারী হিসাবে কাজ করছেন?

আমি জুনিয়র বাজপেয়ীর সহকারী নই, আমি তার সহযোগী। পাথর যাচাইয়ের ব্যাপারে আমি তাঁকে সাহায্য করে থাকি।

অতীন বাজপেয়ীর পাথরের চোরা কারবারেও কি আপনি তাঁকে সাহায্য করেন ?

মঙ শানের মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ বৈশালীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে তারপর বলল, তার পাথরের কোন চোরাকারবার আছে বলে তো আমার জানা নেই।

আপনি ভুবনবাবুকে দুটো রুবি দিয়েছিলেন?

দিয়েছিলাম, মানে বিক্রি করেছিলাম। রুবি দুটো খুব দামী।

কত দাম?

আমি ছ' হাজারে এক একটা কিনেছিলাম। বিক্রি করেছিলাম প্রত্যেকটি আট হাজারে।

রুবি দুটো চুরি গেছে জানেন?

শুনেছি।

আপনার কি মনে হয় রুবি দুটোর এত দাম যে, তার জন্য একজন মানুষের প্রাণ নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে?

NOT FOR SALE

মঙ শানের দু' ঠোঁটের প্রান্তে হাসির ক্ষীণ আভা।

মানুষকে কখন কিসের জন্য প্রাণ দিতে হয়, বলা যায়! আমাদের দেশে, মানে বর্মায় এর চেয়ে অনেক অল্প টাকার জন্য মানুষকে খুন করে।

ভুবনবাবুর শত্রু কেউ ছিল বলতে পারেন?

কি করে বলব! আমি তো এদেশে থাকি না। তবে অনেক সময় ছেলেও বাপের শত্রু হয়।

একথা বলছেন কেন?

জুনিয়র বাজপেয়ীর সঙ্গে সিনিয়র বাজপেয়ীর সম্পর্ক খুব ভাল ছিল না। প্রায়ই ঝগড়াঝাটি হতো।

আপনি কি করে জানলেন, আপনি তো এদেশে থাকতেন না?

জুনিয়র বাজপেয়ী বর্মায় ফিরে গিয়ে বাপের নামে খুব মেজাজ দেখাতেন। বলতেন, বুড়ো শকুনের লালসার শেষ নেই।

কিন্তু তা বলে ছেলে বাপকে—

বৈশালীর কথা শেষ হবার আগেই মঙ শান বলে উঠল, আমি তা একবারও বলিনি। আর আপনার কোন কথা আছে? আমি উঠব।

কথার সঙ্গে সঙ্গে মঙ শান দাঁড়িয়ে উঠল।

আপনি আর কতদিন এখানে আছেন?

দিন কুড়ি। রেওয়ার দেওয়ান আসবেন কিছু পাথরের খোঁজে, তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

আমার পাথরের নেশা আছে। কিছু পাথর দেখাতে পারবেন?

কেন পারব না। আপনার বাড়ির ঠিকানা আর সময় দেবেন, গিয়ে দেখিয়ে আসব!

এখানে দেখানো সম্ভব নয়?

না, কারণ পাথরগুলো এখানে নেই। কাজের বাড়ি, এখানে কিছু রাখিনি। আচ্ছা চলি।

মঙ শান উঠে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল।

বৈশালী সুজিতের দিকে ফিরে বলল, কি রকম বুঝছ সুজিত?

॥ চার ॥

কম্পাশের কাঁটার উত্তর দিকে দেখানোর মতন, দীপালীদেবী আর মঙ শান দুজনেরই লক্ষ্য যেন অতীন বাজপেয়ী।

বৈশালী বলল, চল, আমরাও বেড়িয়ে আসি।

NOT FOR SALE

কোথায়? সুজিতের জিজ্ঞাসা।

জায়গাটা ঘুরেফিরে একবার দেখে আসি।

মিনিট পনেরর মধ্যে বৈশালী মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পাশে সুজিত।

খুব ছোট জায়গা। শিলার প্রাচুর্য আছে, তবে গড় কেন তা বোঝা গেল না। মাঝে মাঝে ব্লাস্টিং-এর শব্দও ভেসে আসছে। মারোয়াড়ী আছে, তার ওপর বাঙালী, বিহারী।

মোটর রাস্তার ওপর রেখে দুজনে একটা কাপড়ের দোকানে গিয়ে বসল।

মারোয়াড়ী দোকানের মালিক কাপড় দেখাতে দেখাতে প্রশ্ন করল, আপনাদের এখানে নতুন দেখছি।

সুজিত বলল, হ্যাঁ, আমরা ভুবন বাজপেয়ীর কাজে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছি।

আপনারা কি ভুবনবাবুর আত্মীয়?

না, তাঁর সঙ্গে আমাদের পাথরের ব্যবসার লেনদেন ছিল।

মালিক বিজ্ঞের মতন ঘাড় নাড়ল।

ওঁর কয়লা আর মাইকার ব্যবসায় মন্দা পড়াতে ইদানীং স্টোনের ব্যবসার দিকে ঝুঁকেছিলেন।

বড় আপশোসের ব্যাপার। এই ভাবে ওঁর আকস্মিক মৃত্যু!

মালিক বৈশালীর কথায় সায় দিল।

বড় ধার্মিক লোক ছিলেন। অনেককালের বাসিন্দা। তাঁর সব সওদা এখান থেকেই করতেন।

দুটো বিছানার চাদর কিনে বৈশালী আর সুজিত উঠে পড়ল।

মোটরে উঠে সুজিত জিজ্ঞাসা করল, এরপর?

এরপর ভুবন-নিবাস। দীপালীদেবী আমাদের ভুবনবাবুর শোবার ঘর দেখাবেন।

অতিথি-কুটিরের সামনে এসেই দেখল, একজন ভৃত্য দাঁড়িয়ে আছে।

মা আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

চল, যাচ্ছি।

মুখ হাত ধুয়ে পোশাক বদলে দুজনে ভুবন-নিবাসে চলে এল।

দোতলার বারান্দার কাছে দীপালী দাঁড়িয়েছিল।

আসুন, আসুন। বেরিয়েছিলেন বুঝি?

সমস্ত দিন আটকে আছি, তাই একটু এদিক-ওদিক ঘুরে এলাম।

আসুন, ওঁর ঘরটা দেখিয়ে আনি।

একদিকে খাট। কোণের দিকে একটা সিন্দুক। তাতে সিঁদুরের দাগ। দেয়ালে ভুবন বাজপেয়ীর ফটো। মোটা বেলফুলের মালা দুলছে।

মাঝখানে কাঁচে-ঢাকা সেণ্টার টেবিল ঘিরে গোটা দুয়েক চেয়ার।

NOT FOR SALE

আপনি কোথায় থাকেন?

বৈশালীর প্রশ্নে দীপালী একটু বুঝি আরক্তিম হলো, মৃদুকণ্ঠে বলল, পাশের ঘরে।

ময়ূরটা এই সিন্দুকেই ছিল?

দীপালী মাথা নাড়ল। সম্মতিসূচক।

আপনি কোনদিন সিন্দুক খুলেছেন? ভুবনবাবুর অনুপস্থিতিতে?

না, তার প্রয়োজন হয়নি। আমার চাবি দিয়ে অনেকবার খুলেছি, তবে ওঁর সামনে।

আপনার গয়নাগাঁটি কি এই সিন্দুকে থাকে?

না, ব্যাঙ্কে থাকে। প্রয়োজনমত আমি আনিয়ে নিই।

ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করে বৈশালী জিজ্ঞাসা করল, অতীনবাবু কোথায় থাকেন?

দোতলায় পিছন দিকে।

আচ্ছা, ভুবনবাবুর সঙ্গে অতীনবাবুর যে বচসা হয়েছিল সেটার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবেন?

বাংলায় শুরু হলেও দুজনে ইংরাজীতে কথা বলছিলেন।

ইংরেজী ঠিক ঠিক বুঝতে আপনার কোন অসুবিধা হয়নি?

একটু চুপ করে থেকে দীপালী উত্তর দিল, আমি গ্র্যাজুয়েট।

ও, ওঁরা কি সম্পত্তি সম্বন্ধে কথা বলছিলেন?

হ্যাঁ, অতীন বলছিল, বিষয়ের অংশ তাকে ভাগ করে দিতে হবে।

আর একটা কথা—।

কি বলুন?

ভুবনবাবুর কোন উইল আছে?

যতদূর জানি, নেই।

থাকলে এই সময় নিশ্চয় আপনি জানতে পারতেন।

পারতাম। আমাদের এটর্নী মিস্টার মজুমদারের কাছে খোঁজ নিয়েছিলাম। তিনি বললেন, কোন উইল নেই।

আশ্চর্য।

কেন, আশ্চর্য কেন?

যতদূর জানলাম, ভুবনবাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি। এসব কাজ তাঁর সম্পূর্ণ করে রাখাই উচিত ছিল। কাল থেকে তো আপনারা খুব ব্যস্ত থাকবেন?

হ্যাঁ, তা থাকব। সন্ধ্যার সময় ভাল কীর্তন আছে। যদি এ বিষয়ে আগ্রহ থাকে, আসরে আসবেন।

কলকাতা থেকে কেউ আসছেন?

NOT FOR SALE

কীর্তন-বিশারদ হিমাংশু ভট্টাচার্য আসবেন।

ঠিক আছে, থাকব।

দীপালীর নির্দেশে ভৃত্য দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল।

অতীনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন? দীপালী বলল।

মোটামুটি।

দু-একদিনের মধ্যে তো সে বর্মায় ফিরে যাবে।

প্রয়োজন হলে ফিরে যাওয়া আমরা বন্ধ করে দেব।

মনে হলো দীপালীর চোখে-মুখে চাপা আনন্দের আভাস।

একেবারে হঠাৎ বৈশালী প্রশ্ন করল, আচ্ছা, মঙ শান লোকটি কেমন?

দীপালী ভ্রু কুঞ্চিত করল।

অতীনের সাকরেদ আর কত ভাল হবে! তবে ওর সঙ্গে ভিতরের বাড়ির কোন যোগাযোগ নেই। যখন আসে বাইরের ঘরেই থাকে। ভুবনবাবুর সঙ্গে পাথরের কেনাবেচায় ওর যোগাযোগ ছিল। তবে এমন কিছু নয়। প্রথম দিকে কয়েকটা পান্না কেনার ব্যাপারে সাহায্য করেছিল।

থেমে গিয়ে দীপালী বলল, আমি চলি, ঠাকুরঘরে বাতি দিতে হবে।

বৈশালী আর সুজিত সামনের বাগানে এসে দাঁড়াল।

মণ্ডপ তৈরি শেষ। একটা বেদীর ওপর ভুবনবাবুর ফটো রাখা হয়েছে। কাল পুষ্পভূষিত করা হবে।

সকাল থেকে অনুষ্ঠান শুরু।

অতীন মণ্ডপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তদারক করছে।

বৈশালীদের দেখে অতীন এগিয়ে এল।

কি, কাল আছেন তো?

হ্যাঁ, কালকের দিনটা থাকব। দীপালীদেবী থাকবার জন্য বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন। একজন বিখ্যাত কীর্তনীয়া আসছেন।

বাবার হত্যাকাণ্ডের কোন সুরাহা হলো?

কই আর হলো! ওসব তো পুলিশের কাজ।

আপনার কি কাজ?

বৈশালী হাসল। বলল, ময়ূর উদ্ধার করা।

তার কিছু হলো?

এখনও কাজের ভার নিইনি। কথা ছিল, শিলাগড় দেখে তবে কাজটা নেব কিনা বলব।

ময়ূর উদ্ধারের চেয়েও আমি কিন্তু বাবার হত্যাকারীর হদিস পেতে বেশি ইচ্ছুক।

NOT FOR SALE

স্বাভাবিক। আপনি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

দেখি।

ডেকরেটরের একটা লোকের দিকে অতীন এগিয়ে গেল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বেতের চেয়ারে দুজন বসেছিল। বৈশালী আর সুজিত।

সুজিত হেসে বলল, কি গোয়েন্দা সাহেবা, কেসের কোন কিনারা হলো?

কই আর হলো! আর এত সহজে কি হয়?

কি রকম?

সস্তা গোয়েন্দা কাহিনী পড়নি? এতক্ষণে গোয়েন্দার কানের পাশ দিয়ে গোটা তিনেক বুলেট ছুটত। চায়ে চুমুক দিয়ে একজন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত। সেসব তো কিছুই হলো না। একেবারে নিরামিষ ব্যাপার। আরে!

বৈশালী একটা হাত বাড়িয়ে সুজিতের হাত টিপে দিল।

সুজিত চাপা গলায় প্রশ্ন করল, কি?

ভুবন-নিবাসের দোতলায় দেখ!

সুজিত চোখ তুলে দেখল।

অন্ধকার রাত। দু-একটা নক্ষত্রের ম্লান দীপ্তি।

দোতলার পিছন দিকের বারান্দায় অন্ধকার মূর্তি।

তার হাতে একটা টর্চ। মনে হচ্ছে টর্চ নেড়ে সে যেন ইশারা করছে।

বৈশালী উঠে বাগানের ধারে গেল।

বাগানের সীমানার বাইরে উঁচু-নীচু জমি। কয়লার খাদের কাছাকাছি এলাকা যেমন হয়। পিছনে টিলা।

ছোট একটা ঢিপির পাশ থেকে আর একটা টর্চের আলো দেখা গেল। একবার জ্বলছে, আর একবার নিভছে।

এদিকের ইশারার উত্তর।

মিনিট পনের। তারপর সব চুপ। বারান্দার লোকটা সরে গেল। বাইরের টর্চের আলোও আর জ্বলল না।

বৈশালী চেয়ারে ফিরে এল।

কি বুঝলে?

আলোর সঙ্কেত বলে মনে হলো।

আর সে তো অন্ধও বলতে পারো। বারান্দার লোকটি কে?

অন্ধকারে আর দেখতে পেলাম কোথায়?

না, সহকারী হিসাবে তুমি একটা অপদার্থ।

NOT FOR SALE

বেশ, গোয়েন্দা হিসাবে তুমিই বলো?

বৈশালী হাসল। চরণ আসুক, তারপর বলব।

চরণ একটু পরেই এল, কুঁজোয় ঠাণ্ডা জল ভরতে।

বৈশালী জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা চরণ, ওই পিছন দিকের ঘরে কে থাকেন? ওই যে বারান্দা দেখা যাচ্ছে।

চরণ একবার চোখ তুলে দেখে বলল, দাদাবাবু। ওটা দাদাবাবুর ঘর।

চরণ চলে গেলে সুজিত বলল, আর দেরী নয় বৈশালী, অতীনবাবুর ঘরটা সার্চ করা যাক?

রহু ধৈর্যং। অত তাড়াহুড়ো করো না।

পরের দিন সকালে বৈশালী চা-পানের আগেই ভুবন-নিবাসে এসে হাজির হলো।

সোজা দোতলায় উঠে সামনে একটা ভৃত্যকে দেখে বলল, আমি অতীনবাবুর সঙ্গে দেখা করব।

দাদাবাবু এখনও ওঠেননি।

তুমি উঠাও। বল জরুরী দরকার।

ভৃত্য আর কিছু বলল না। এগিয়ে গেল।

বৈশালী তাকে অনুসরণ করল।

বেশ কয়েকবার দরজায় ধাক্কা দেবার পর ভিতর থেকে জড়ানো গলার শব্দ শোনা গেল।

কে?

বৈশালী উত্তর দিল। দরজাটা দয়া করে খুলবেন। খুব দরকার।

দরজা খুলে গেল।

চৌকাঠের ওপারে রাত্রিবাস পরিহিত অতীন। দুটো চোখ বেশ লাল। দৃষ্টি কিঞ্চিৎ উদ্‌ভ্রান্ত।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বৈশালী ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

আপনার সঙ্গে কতকগুলো কথা আছে।

আমাকে ডেকে পাঠালেই পারতেন!

বৈশালী চোখ বুলিয়ে ঘরের অবস্থাটা দেখে নিল। কোণের দিকে গোল টেবিলে একটা মদের বোতল। পাশে গ্লাস। দুটোই শূন্য।

একটু বাইরে আসবেন?

কোথায়?

বারান্দায়।

অতীন পিছনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তার সামনে বৈশালী।

NOT FOR SALE

কাল একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম।

কি?

আপনি একটু দাঁড়ান এইখানে।

বৈশালীর নির্দেশমত অতীন দরজার পাশে দেয়ালের ধারে দাঁড়াল।

ওই যে উঁচু-নীচু ঢিবি দেখছেন, কাল রাতে ওখান থেকে কে যেন টর্চের আলো ফেলছিল।

ফেলতে পারে। টর্চ হাতে লোকেরা আনাগোনা করে, তাদের হাতের আলো এদিক ওদিক পড়তে পারে।

না, আনাগোনার আলো নয়। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যেন আলোর সঙ্কেত করছিল।

ক'টার সময়?

রাত সাড়ে দশটা।

সাড়ে দশটা? জানি না, আমি তখন বাড়ি ফিরিনি।

তা হলে ভুলই দেখেছি হয়তো। সাত-সকালে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।

মুখে অতীন না—না বললেও, তাকে দেখে এটুকু বোঝা গেল, ভোরবেলা অযথা ঘুমটা ভাঙিয়ে দেওয়াতে সে মোটেই খুশী হয়নি।

বৈশালী নেমে এল।

।। সাত ।।

সুজিত সবে ঘুম থেকে উঠে বাথরুমের দিকে রওনা হচ্ছে, সামনে বৈশালীকে দেখে বলল, কি ব্যাপার, এত সকালে কোথায় গিয়েছিলে?

মর্নিং ওয়াক করে এলাম।

একলাই?

তোমরা যেমন মাঝে মাঝে নারীসঙ্গ বর্জনীয় মনে কর, আমরাও তেমনই কখনও কখনও তোমাদের পরিহার করে চলতে চাই, বুঝলে?

সুজিত কিছু বলল না। বাথরুমে ঢুকে গেল।

এরপর এক সময়ে অতীন এসে দাঁড়াল। হাতে কার্ড।

বড্ড দেরী হয়ে গেল। আরো আগে নিমন্ত্রণ করা উচিত ছিল, কিন্তু আগে আর আপনাদের পাব কোথায়। দয়া করে অনুষ্ঠানে আসবেন। সকাল থেকে কীর্তনের আসর বসবে। অবশ্য রাত্রেই জমজমাট হবে আসর।

বৈশালী বলল, দিনের বেলা আমাদের একটু কাজ আছে। সন্ধ্যাবেলা আসরে আমরা উপস্থিত থাকব।

NOT FOR SALE

খাওয়া-দাওয়ার পর বৈশালী বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে সুজিত। বৈশালীর হাতে স্টিয়ারিং।

সুজিত জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাবে?

আশপাশটা একটু ঘুরে দেখব—আলোর খেলা কোথা থেকে হচ্ছিল।

তোমার কি ধারণা, যারা এসব করছিল তারা দিনের বেলাতেও ওখানে বসে থাকবে?

বৈশালী হাসল। বলল, তা কখনও থাকে না। মানুষ থাকে না, কিন্তু চিহ্ন রেখে যায়। হাত-পায়ের ছাপ কিংবা ব্যবহার করা কোন জিনিস।

তা সত্যি। তা না হলে তোমাদের মতন গোয়েন্দাদের অন্ন যাবে যে। চল।

মোটর একটু দূরে রেখে দুজনে হাঁটল।

উঁচু-নিচু ঢিপির পাশে কাঁটাগাছের ঝোপ। বৃষ্টি হয়নি। শুকনো, খটখটে মাটি। পায়ের ছাপ পড়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বৈশালী নিচু হয়ে ঝোপগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজল।

হঠাৎ কি একটা কুড়িয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এই দেখ।

সুজিত এগিয়ে এল।

কি?

একটা খাম। কারো পকেট থেকে পড়ে গেছে।

বৈশালী খামটা এগিয়ে দিল।

সুজিত দেখল। পুরোনো খাম। একটা ঠিকানা লেখা। স্পষ্ট নয়, কিন্তু পড়া যায়।

অতীন বাজপেয়ী। ফোর্থ স্ট্রীট। কেমেনডাইন। রেঙ্গুন। লোয়ার বার্মা।

এটা এখানে এল কি করে?

বৈশালীকে খুব চিন্তিত মনে হলো। আস্তে আস্তে বলল, কারো পকেট থেকে পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

সুজিত বলল, পড়লে অতীনবাবুর পকেট থেকেই পড়েছে, কারণ তাঁকে লেখা খাম।

বৈশালী এ কথার কোন উত্তর দিল না। শুধু বলল, দাও খামটা।

খামটা নিয়ে নিজের ভ্যানিটি ব্যাগে রেখে দিল।

তারপর হেঁটে একটু দূরে গিয়ে আবার ফিরে দেখল।

কি দেখছ?

কাল রাতে ওই জায়গা থেকেই কিন্তু আলোটা দেখা গিয়েছিল। আমি ওই উঁচু ঢিপিটা নিশানা রেখেছিলাম। রাতের বেলা ঢিপিটা দেখা যায়নি, শুধু একটা অন্ধকার স্তূপ।

NOT FOR SALE

তোমার বক্তব্যটা কি?

কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার হিসাবে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

কি রকম?

আর কিছুদিন আমাকে সময় দাও। যদি সম্ভব হয়, আশা করি, সব বলতে পারব।

তা' ভাল, কিন্তু এবার কোন্‌দিকে?

একবার থানায় যাব।

হঠাৎ?

ভয় নেই, ভিতরে নয়—বাইরে থেকে থানার অবস্থানটা দেখে আসব।

চল।

দুজনে আবার মোটরে উঠল।

সদর রাস্তার ওপরই থানা। ভুবন-নিবাস থেকে বেশী দূরে নয়।

সুজিত বলল, ও সি-র সঙ্গে একবার আলাপ করে এলে হতো না?

দরকার হলে পরে যাব। সত্যেন রায়ের চিঠি সঙ্গে আছে, তাতেই কাজ হবে।

একটু এদিক-ওদিক ঘুরে দুজনে যখন ফিরে এল, তখন জোর কীর্তন চলছে। খুব বেশী লোক নেই। বাড়ির লোকেরা রয়েছে। কিন্তু কীর্তনীয়া দরদ দিয়ে গাইছে।

চলতে চলতেই চোখ ফিরিয়ে বৈশালী দেখল, মঞ্চের একপাশে সাদা কাপড় জড়িয়ে দীপালী চুপচাপ বসে আছে। একমুঠো রজনীগন্ধা ফুলের মতন।

কিই বা বয়স! এই বয়সে জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখে জলাঞ্জলি দিতে হলো। পৃথিবীর সব রঙ মুছে গেল।

সন্ধ্যার সময়ে বৈশালী আর সুজিত দুজনে এসে আসরে বসল।

এখানকার আসর জমজমাট। পুরুষ আর মহিলাদের আলাদা ব্যবস্থা। সুজিত একদিকে বসল। বৈশালী অন্যদিকে।

এবারের আকর্ষণের কারণ আছে।

মঞ্চে হিমাংশু ভট্টাচার্য, তাকে ঘিরে অনেকগুলো মেয়ে। হিমাংশু ভট্টাচার্য গাইছে, আর মেয়েরা কোরাসে অনুসরণ করছে।

বৃন্দাবনের জীবন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা চলে গেছেন। তাঁর বিরহে বৃন্দাবনের গাছপালা, পশুপক্ষী বেদনায় মূহ্যমান। গোপিনীরা উন্মত্তপ্রায়।

সেই বেদনা সঙ্গীতের কথায় সুরে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

বৈশালী এদিক-ওদিক চোখ ঘুরিয়ে দেখল।

NOT FOR SALE

পুরুষদের জায়গায় একেবারে কোণের দিকে মঙ শান বসে। একমনে গান শুনছে। কি বুঝছে কে জানে।

বৈশালী পাশে বসা মহিলাদের দিকেও দেখল।

বেশীরভাগই গ্রাম্য বধূ আর মেয়ে। তারাও গানে তন্ময়।

বৈশালী আস্তে আস্তে উঠল। কেউ লক্ষ্য করছে না। একটু দাঁড়িয়ে আসর থেকে বেরিয়ে এল।

চাকর-বাকর কেউ ধারে কাছে নেই।...

বৈশালী সিঁড়ি দিয়ে উঠল। সামনেই মঙ শানের ঘর। দরজা ভেজানো।

হাত রাখতেই দরজা খুলে গেল। ঘর অন্ধকার।

একবার পিছন দিকে দেখে বৈশালী ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

অন্ধকার চোখে সহ্য হতে আরো এগিয়ে গেল সে।

ব্লাউজের মধ্যে থেকে পেন্সিল টর্চ বের করল।

প্রথমে টেবিলের ওপর, তারপর আলমারির দিকে আলোর রেখা ঘুরতে লাগল। ড্রয়ার টেনে দেখল, বন্ধ।

দেওয়ালের তাকে হাত বোলাতে বোলাতে হাতে কতকগুলো কাগজ উঠে এল। টর্চের আলোয় সেগুলোর ওপর নজর বুলিয়েই ব্লাউজের মধ্যে সেগুলো রেখে দিল।

তারপর হাত বাড়িয়ে তাকের ওপর আরো জিনিসের খোঁজ করতে যাবার আগেই বাইরে জোর পায়ের শব্দ।

দরজা খুলে গেল।

বাইরের আলোর রেখার কিছুটা ঘরের মধ্যে এসে পড়ল।

বৈশালী ত্বরিত পায়ে কোণের দিকের পর্দার আড়ালে আত্মগোপন করল।

ভাগ্য ভাল বৈশালীর।

মঙ শান বেশীক্ষণ ঘরের মধ্যে রইল না। টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বৈশালী এতক্ষণ নিশ্বাস রোধ করে দাঁড়িয়েছিল।

একটা হাত কোমরে। যেখানে আগ্নেয়াস্ত্রটা আটকানো।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে যখন পর্দার আড়াল থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল, তখন তার সারা দেহ ঘামে সিক্ত।

খুব সন্তর্পণে ঘরের বাইরে এল।

আর কীর্তনের আসরে নয় বৈশালী অতিথি-কুটিরে চলে এল।

সুজিত আসরে বসে রয়েছে।

বৈশালী প্রথমে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল।

তারপর টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে কাগজগুলো নিয়ে বসল।

NOT FOR SALE

গোটা পাঁচ-ছয় কাগজ। একটা লণ্ড্রীর বিল, একটা সার্টের ক্যাশমেমো আর একটা চামড়ার ছোট ওয়ালেট। কাগজের সঙ্গে চলে এসেছে।

ওয়ালেটে একটা ঠিকানা—ধর্মতলা স্ট্রীটের কোন এক হামিদ আলির। আর একটা খাম। ওপরে কোন নাম নেই।

ছোট ছোট ভাঁজ করা অনেকগুলো কাগজ। সবগুলো ইংরাজীতে লেখা।

পড়তে পড়তে বৈশালীর দুটি ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে এল। দৃঢ় সংবদ্ধ ঠোঁট। চিঠিগুলো রেখে ওয়ালেটটা ঝাড়ল। যদি কিছু আটকে থাকে।

শুকনো একটা ফল পড়ল বৈশালীর কোলের ওপর।

সাবধানে ফলটা তুলে ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে থেকে একটা শিশি বের করে তার মধ্যে রেখে দিল।

আর একটা কাজ বাকি।

একটা চিঠি সরিয়ে রেখে অন্য কাগজগুলো ওয়ালেটের মধ্যে ভরে নিল।

এখন এই ওয়ালেটটা মঙ শানের ঘরে রেখে আসতে হবে। যেমন করে পারে।

দরজা বন্ধ করে বৈশালী বাইরে বেরিয়ে এল।

আসরে এসে দেখল, মঙ শান একভাবে বসে আছে। সুজিত নেই।

চোখ ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখল, অতীনও নেই।

অথচ সুজিতকে এই মুহূর্তে খুব প্রয়োজন।

মঞ্চের দিকে তাকিয়ে দেখল। হাত জোড় করে দীপালী চুপচাপ বসে আছে।

বৈশালী যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে, তখন দেখল, গেট দিয়ে সুজিত আর অতীন ঢুকছে।

বৈশালী এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় গিয়েছিলে?

সুজিত হাসল।

দুজনেরই গান ভাল লাগে না, তাই বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।

অতীনের দিকে ফিরে বৈশালী গম্ভীরকণ্ঠে বলল, আপনি গান ভালবাসেন না? শেকস্‌পীয়র বলেছেন যারা গান ভালবাসে না, তারা মানুষ খুন করতে পারে।

অতীন কিছুক্ষণ বৈশালীকে জরিপ করল, তারপর বলল, আশা করি রহস্য করছেন।

বৈশালী এ কথার উত্তর দিল না। সুজিতকে বলল, একটা কথা আছে।

অতীন ইঙ্গিতটা বুঝল। আসরের মধ্যে গিয়ে বসল।

সুজিত, একটা কাজ করতে হবে।

কি বলো?

NOT FOR SALE

মঙ শানকে কথায় কথায় আটকে রাখতে পার?

কেন?

ওর ঘরে আমার যাওয়া দরকার।

সর্বনাশ, ওসব করতে যেও না, বিপদে পড়বে।

কিছু হবে না। শীঘ্র যাও। সময় নেই।

সুজিত মঙ শানের দিকে এগিয়ে গেল।

মঙ শানের পাশের চেয়ারে বসে বলল, আচ্ছা আপনি তো বাংলা বোঝেন না!

উঁ, না।

তবে কি শুনছেন?

সুরটা আমার খুব ভাল লাগছে।

আপনাদের দেশে গানবাজনার চল আছে?

আছে বই কি। পোয়ে নাচ আছে। তার সঙ্গে গানও হয়।

যাক, আসল কথাটা আপনাকে বলি।

বলুন।

আপনাকে এই সময় বিরক্ত করছি বলে কিছু মনে করবেন না।

না, না, বলুন কি কথা?

আমার একটা পাথর দরকার।

এতক্ষণ পরে মঙ শানের চোখে মুখে আগ্রহ ফুটে উঠল।

আমাকে জ্যোতিষী বলেছেন, ক্যাটস্ আই ব্যবহার করতে।

মঙ শানের চোখে একটু যেন অবিশ্বাসের রেখা।

কলকাতা শহরে ক্যাটস্ আই পাচ্ছেন না?

পাচ্ছি, কিন্তু কিনতে সাহস হচ্ছে না।

কেন?

যদি ঠকি।

বেশ, আপনার ঠিকানা দিন, আমি দেখা করব।

সুজিত পকেট থেকে কলম বের করে একটা কাগজে খস-খস করে ঠিকানা লিখে দিল।

মঙ শান ঠিকানাটা রেখে দিল।

সুজিত এক সময় আড়চোখে তাকিয়ে দেখল বৈশালী আসরের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সে উঠে দাঁড়াল।

মঙ শানকে বলল, ধন্যবাদ। দিন সাতেক পরে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

NOT FOR SALE

সুজিত, বৈশালীর সামনে এসে দাঁড়াল। চাপা কণ্ঠে বলল, হয়ে গেছে?

হুঁ। শোন, এদিকে এসো।

সুজিত বৈশালীর দিকে সরে এল।

আজ রাত্রেই আমরা রওনা হব।

আজই রাত্রে?

হ্যাঁ। চল, তৈরি হয়ে নিই।

এঁরা কি ভাববেন?

কিছু একটা বলে গেলেই হবে। তুমি যাও, আমি আসছি।

সুজিত চলে যেতে, বৈশালী দীপালীর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

দীপালী ফিরে দেখল।

কিছু বলবেন?

একটু কথা ছিল।

দীপালী উঠে এল।

আমরা আজ রাত্রেই কলকাতায় ফিরে যাব।

সেকি? আজই?

হ্যাঁ, জরুরি দরকার। যেতেই হবে।

আমাদের কেস-এর কি হবে?

আমি দিন সাতেক পরে আবার আসছি।

তার আগে তো অতীন পালাবে।

তিনি যাতে না পালাতে পারেন তার ব্যবস্থা করে যাব।

আপনাকে আগাম কিছু টাকা দেবার কথা ছিল।

আমি সাতদিন পরে এসে নেব।

রাত্রে আহার করে যাবেন।

আমরা পথে খেয়ে নেব। আপনি কিছু মনে করবেন না। আতিথেয়তার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

বৈশালী দুটো হাত যুক্ত করে নমস্কার করল।

আধঘন্টার মধ্যে বৈশালী আর সুজিত বেরিয়ে পড়ল।

বৈশালী থানায় একবার নেমে ও সি-র সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে নিল।

কিছুক্ষণ পরেই ও সি দুটি পুলিশ সঙ্গে নিয়ে ভুবন-নিবাসে ঢুকল।

তখন আসর শেষ। লোকেরা উঠতে আরম্ভ করছে।

ও সি অতীনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, আপনি অতীন বাজপেয়ী?

সামনে পুলিশ দেখে অতীন একটু বিব্রত হলো।

বলল, হ্যাঁ।

আপনি দশ দিন সকাল-বিকাল থানায় হাজিরা দেবেন।

NOT FOR SALE

সেকি? আমাকে যে বর্মায় ফিরে যেতে হবে!

আপনার ফিরে যাওয়া এখন সম্ভব নয়। আইনের প্রয়োজনে আপনাকে থাকতে হবে।

আমার অপরাধ?

যথাসময়ে জানতে পারবেন।

অতীন এবার রীতিমত বিরক্ত হলো।

আপনাদের এ অন্যায় আদেশ আমি মানি না।

ও. সি-র কণ্ঠস্বর যথেষ্ঠ গম্ভীর।

আমাদের আদেশ আমরা জানিয়ে গেলাম। এর পর আপনি যা করবেন নিজের দায়িত্বে। তার ফল কি হবে, নিশ্চয় বোঝবার মতন বুদ্ধি আপনার আছে।

পুলিশ নিয়ে ও সি চলে যাবার পর অতীন নিষ্ফল গর্জন শুরু করল। বৈশালীর বাপান্ত।

মঙ শানকে দেখতে পেয়ে বলল, দেখলে ঝামেলা! কাজকর্ম ফেলে দু'বেলা থানায় হাজিরা দাও। কেন, আমি কি চোর দায়ে ধরা পড়েছি।

মঙ শান চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কোন উত্তর দিল না।

॥ ৮ ॥

সারাটা পথ বৈশালী অস্বাভাবিক গম্ভীর।

স্টিয়ারিং সুজিতের হাতে। সীটে হেলান দিয়ে বৈশালী নিস্পন্দ নির্বাক। তার এ চেহারার সঙ্গে সুজিতের পরিচয় আছে। সে বুঝতে পারল বৈশালীর মনের মধ্যে চিন্তার ঝড় উঠেছে। অনেকগুলো বিপরীতমুখী তরঙ্গের সংঘাত। এসবের মাঝখান থেকে সে সমাধানের সূত্র খুঁজছে।

বর্ধমান এসে বৈশালী নিজেই কথা বলল। এসো সুজিত, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।

খাবার টেবিলেও বৈশালী বেশ চিন্তামগ্ন।

এক সময়ে বলল, তুমি এখন কাজে যোগ দিও না। তিন দিন পরে আমরা আবার শিলাগড়ে ফিরে আসব।

তিন দিন?

হ্যাঁ, দু'দিনও হতে পারে।

NOT FOR SALE

বৈশালী থেমে গেল। আর কোন কথা হলো না।

সুজিতকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে শুধু বলল, আমি তোমায় ফোন করব।

পরের দুটো দিন বৈশালী ভীষণভাবে ব্যস্ত রইল। খুব সকালে বের হয়ে যেত, ফিরত প্রায় দুটো আড়াইটেয়। তারপর আবার বের হতো। রাত দশটার আগে ফিরতে পারত না।

তিন দিনের দিন বৈশালী সুজিতকে ফোন করল—সুজিত, তুমি এর মধ্যে ফোন করেছিলে?

না, তুমি ব্যস্ত থাকবে ভেবে আর করিনি।

ভালই করেছ। শোন, দু'ঘন্টার মধ্যে তৈরি থাকতে পারবে?

সুজিত বলল, আমি এখনই তৈরি আছি।

বৈশালী হেসে ফেলল। বা, এই রকম না হলে আমার সহকারী! এখন বেলা নটা, এগারোটায় তোমাকে তুলে নেব।

কোথায়? শিলাগড় তো?

ইচ্ছা তো তাই। রাখছি। বৈশালী ফোন রেখে দিল।

বাইরে যাবার জন্য বৈশালীর একটা সুটকেশ গোছানো থাকে।

বৈশালী স্নান আর ভারি রকমের প্রাতরাশ সেরে নিল।

মোটরে সুজিত জিজ্ঞাসা করল, শিলাগড়ের রহস্যের কিনারা হয়ে গেছে?

আজ রাত্রে অপারেশন।

কিছুক্ষণ পরে বৈশালী বলল, শোন, আর একটা কথা—।

সুজিত ফিরে দেখল।

এবার আর অতিথি-কুটিরে উঠব না।

তবে?

শিলাগড়ে ঘোরবার সময় একটা মারোয়াড়ী ধর্মশালা দেখে রেখেছিলাম। সেন্ট্রাল রোডে। নাম বোধহয় রামবিলাস ধর্মশালা।

সুজিত সন্দেহ করল, থাকতে পারবে সেখানে?

বৈশালী হাসল।

মনে আছে, আগ্রায় গাছতলায় দু'রাত কাটিয়েছিলাম!

NOT FOR SALE

রাস্তায় আর কোন কথা হলো না।

সদর রাস্তা ছেড়ে মোটর ঘুরপথে সেন্ট্রাল রোড ধরল, যাতে ভুবন-নিবাসের সামনে না পড়তে হয়।

রামবিলাস ধর্মশালা।

ব্যবস্থা খারাপ নয়। শুধু মাছ, মাংস আর ডিম চলবে না।

বৈশালী আর সুজিত ঠিক করল এখানে থাকবে, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া বাইরেই সেরে নেবে।

সুজিত জিজ্ঞাসা করল, শুধু একটা রাত তো?

তাই তো মনে হচ্ছে। অবশ্য এসব ব্যাপারে কিছুই বলা যায় না।

থানার সামনেই ও সি-কে পাওয়া গেল।

বৈশালীকে অভ্যর্থনার বহর দেখে বৈশালী বুঝতে পারল, ইতিমধ্যে সত্যেন রায়ের ফোন এসে পৌঁছেছে।

অতীনবাবু ঠিকমত থানায় হাজিরা দিচ্ছেন তো?

ও সি হাসল। হ্যাঁ, একেবারে নিয়ম করে। এবার অ্যারেস্ট করি তাকে?

না, এখন নয়। যখন প্রয়োজন হবে বলব।

একটু থেমে বৈশালী বলল, আজ রাত বারোটায় আমার গোটা চারেক পুলিশ দরকার। আর্মড্। আপনি তো সঙ্গে থাকবেনই।

ও সি উত্তর দিল, ডি সি ফোনে আমাদের সবকিছু বলেছেন। আমরা এগারোটার মধ্যে তৈরি থাকব।

ঠিক এগারোটার একটু পরেই এখানে আসব। আর দড়ির মই চাই একটা।

সে কথাও স্যার বলেছেন। ঠিক আছে।

চলি, ঠিক সময়ে আসব। ভালই হয়েছে। আজ রাতটা অন্ধকার।

আমাদের আলো আর অন্ধকার—সবই এক।

বৈশালীর পোশাক দেখে সুজিত অবাক।

পরনে কালো সার্ট আর আঁটো প্যান্ট। প্যান্টের রংও কালো। কোমরে অটোমেটিক।

কি ব্যাপার, রণাঙ্গনে নাকি?

প্রায় তাই।

আমি কি পরব?

তুমিও টাইট কিছু পরে নাও।

NOT FOR SALE

কেন, ছুটতে হবে নাকি?

সম্ভবত।

দুজনেই হেসে উঠল।

বৈশালী আর সুজিত যখন থানার সামনে এসে হাজির হলো তখন জীপ নিয় ওসি তৈরি।

আমাকে অনুসরণ করুন।

জীপ খুব সাবধানে বৈশালীর মোটরের পিছন পিছন চলতে শুরু করল।

পিচকালো অন্ধকার। সূচিভেদ্য। এক হাত দূরের কিছু দেখবার উপায় নেই। আকাশে গোটা কয়েক নক্ষত্র আছে বটে, কিন্তু তাদের ক্ষীণ-জ্যোতি পৃথিবীতে এসে পৌঁছাচ্ছে না।

একটা গাছের নীচে জীপ আর মোটর দাঁড়াল।

সবাই নেমে এল।

বৈশালী তার রেডিয়ম ঘড়ির দিকে দেখল।

এগারোটা বেজে পঁয়ত্রিশ।

বৈশালী ও সি-কে একপাশে ডাকল। অনেকক্ষণ ধরে চাপা গলায় কথা হলো। তারপর একসময়ে বৈশালী বলল, চলুন আমরা এগোই।

ভুবন-নিবাসের পিছনের পাঁচিলের এপাশে এসে সকলে দাঁড়াল।

নিশাচর দু-একটা পাখীর ডাক। মাঝে মাঝে ব্লাস্টিং-এর শব্দ। এছাড়া শিলাগড় যেন ঘুমে নিথর।

বারোটা বাজতে যখন দশ, তখন বৈশালী ইঙ্গিত করল।

ও সি দড়ির মইটা পাঁচিলের ওপর ছুঁড়ে দিল।

প্রথমে ও সি, তারপরে বৈশালী আর সুজিত খুব সাবধানে পাঁচিলের ওপর উঠল।

গাছপালার জন্য এদিকটা যেন আরো অন্ধকার। দু-একটা জোনাকির ক্ষীণ দীপ্তি।

এক এক করে পুলিশরাও উঠল। তারপর গাছের ডাল আঁকড়ে এদিকে নামল।

বৈশালী পুলিশদের দিকে ফিরে বলল, তোমরা এখানে অপেক্ষা করো। হুইসিলের শব্দ শুনলেই ছুটে যাবে।

প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে গাছের আড়ালে আড়ালে বৈশালী, সুজিত, তারপর ও সি এগিয়ে যেতে লাগল।

NOT FOR SALE

অতিথি-কুটিরের পিছন দিয়ে একটা কাঁঠালচাঁপা ঝোপের পাশে তিনজন বসল।

এক এক মুহূর্ত এক এক প্রহর বলে মনে হচ্ছে।

নিজেদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যেন বাইরের কোন শব্দ।

হঠাৎ বৈশালী ও সি-র হাতে চাপ দিল।

দূরে একটা টর্চের আলো। একবার জ্বলে উঠেই নিভে গেল।

তিনজন আরো একটু এগিয়ে গেল।

একটা ছোট ঝোপ। কাঁটার খোঁচা থেকে মনে হচ্ছে বোধ হয় গোলাপের ঝাড়। এখানে সাদা গোলাপের গাছ ছিল।

বৈশালী লক্ষ্য করেছে, এর কাছেই বকুলগাছ।

আরো একবার টর্চের আলো দেখা গেল। মৃদু পায়ের শব্দ অনুভূত হলো।

তিনজনই কোমর থেকে অটোমেটিক নিয়ে তৈরি।

বৈশালীর চোখের যেন পলকও পড়ছে না।

পায়ের শব্দ থামল। কিছুক্ষণ।

তারপর টর্চের আলো ডানদিকে।

খুব চাপাকণ্ঠের আওয়াজ।

মাটিতে শব্দ হলো ধুপ, ধুপ, ধুপ।

মিনিট কয়েক। তারপরই বৈশালী, সুজিত আর ও সি ঝাঁপিয়ে পড়ল তিন দিক থেকে।

লোক দু'জন।

একজনকে বৈশালী অনায়াসেই কায়দা করতে পারল। বাকি লোকটিকে নিয়ে সুজিত আর ও সি কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করার সময় রাত্রির আকাশ কাঁপিয়ে খুব জোরে আওয়াজ হলো।

সঙ্গে সঙ্গে সজোরে হুইসিল বেজে উঠল।

অনেকগুলো জোরালো টর্চের আলোয় দেখা গেল, হাত পিছন দিকে করা অবস্থায় মঙ শান। তার পাশে বৈশালীর কবলে অবনতমুখে দীপালী।

ধস্তাধস্তির সময় মঙ শানের রিভলবার থেকে গুলি বের হয়ে গিয়েছিল।

ও সি পুলিশের হাত থেকে হাতকড়া নিয়ে মঙ শানের হাতে পরিয়ে দিয়ে বলল, ভুবন বাজপেয়ী আর তার ড্রাইভারকে হত্যা করার অভিযোগে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হলো।

তারপর দীপালীর দিকে ফিরে বলল, সেই হত্যার প্ররোচনা ও মূল্যবান

NOT FOR SALE

রত্ন অপহরণের অভিযোগে আপনাকেও গ্রেপ্তার করলাম দীপালীদেবী। আমাদের সঙ্গে আপনাদের যেতে হবে।

গুলির শব্দে, লোকজনের গোলমালে ভুবন-নিবাসের বাসিন্দারা সবাই এসে জড় হয়েছিল।

তার মধ্যে অতীনও ছিল।

বৈশালী তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, আপনাকে হয়রানি করার জন্য আমি খুব দুঃখিত অতীনবাবু। এটুকুর প্রয়োজন ছিল।

এবার তাহলে আমি বর্মায় ফিরে যেতে পারি? আমার কারবারের ক্ষতি হচ্ছে। আর কোন দেখবার লোক নেই।

কাল আপনাকে বলব।

বারান্দায় সুজিত আর বৈশালী চায়ের কাপ নিয়ে বসে আছে।

সুজিতদের বাড়ি।

সুজিত বলল, গোয়েন্দা সাহেবা এবার একটু আলোকপাত করো। আমি যে অন্ধকারেই রয়ে গেলাম।

ঠিক আছে, একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করেছি।

ভুবনবাবুর মৃত্যুর ব্যাপারটা দেখে এটুকু বোঝা যায় যে, কোন পরিচিত লোকের দ্বারাই হত্যা সংঘটিত হয়েছিল। কোন ধস্তাধস্তির চিহ্ন নেই, ভুবনবাবু বা ড্রাইভারের কোন চীৎকারের শব্দও কেউই শোনেনি। খুব সম্ভব, যে হত্যাকারী সে ভুবনবাবুর সঙ্গে মোটরেই ছিল, যখন তিনি আমার বাড়িতে এসেছিলেন তখনও মোটরে অপেক্ষা করছিল। দেহরক্ষী হিসাবে। কিংবা হয়তো মাঝপথ থেকে মোটরে উঠেছিল। চেনা লোক বলে কেউ সন্দেহ করেনি।

লোকটা প্রথমে খুব কাছ থেকে সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার দিয়ে ভুবনবাবুকে হত্যা করে, তারপর ড্রাইভারকে বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে অনড় করে দেয়।

ড্রাইভার হয়তো পিছন ফিরে ব্যাপারটা দেখে ফেলেছিল কিংবা সামনের আয়নার সাহায্যে পিছনের দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল।

হত্যাকারী এত পরিচিত ব্যক্তি যে, ড্রাইভারকে সাময়িকভাবে নির্বাক করে দিয়েও সে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি, যাতে ড্রাইভার চিরদিনের জন্য নির্বাক হয়ে যায় তার ব্যবস্থাই করেছিল।

কিন্তু সে বিষক্রিয়াটি কি? পোস্টমর্টেম রিপোর্টে তার স্বরূপ ধরা পড়েনি?

NOT FOR SALE

যথাসময়ে বলব। এখন কাহিনীটা শোনো।

দীপালীদেবী আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। শোকের মূর্ত প্রতিমূর্তি। আমি প্রথমে খুব বিচলিত হয়েছিলাম। তিনি প্রথম থেকেই অতীনবাবুর ওপর দোষারোপ করতে লাগলেন। আমার সন্দেহ যাতে অতীনবাবুর ওপর হয় তার জন্য দীপালীদেবীর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। পিতাপুত্রের বচসার কথা বললেন। সম্পত্তির অংশ নিয়ে, তারও উল্লেখ করলেন। বচসা যে হয়েছে সে কথা অতীনবাবু অস্বীকার করেননি, কিন্তু বলেছেন, তার কারণ ভিন্ন।

পুলিশের খাতায় ভুবন বাজপেয়ীর নাম আছে চোরাকারবারের অংশীদার হিসাবে, যদিও তাঁকে অভিযুক্ত করা সম্ভব হয়নি। দিল্লি থেকে একই রিপোর্ট পাঠিয়েছে।

তারপর সেই আলোর সঙ্কেতের কথা তোমার মনে আছে।

আমার চোখে ধূলো দেবার দীপালীদেবীর আর এক প্রয়াস। অতীনবাবু যে ঘরে থাকেন তারই বারান্দা থেকে আলোর ইশারা চলেছিল। বাইরে টিলার পাশ থেকে তার উত্তরও এসেছিল।

ব্যাপারটা মারাত্মক কিছু নয়, তবু এটা অতীনবাবুকে জড়াবার একটা ফন্দী। স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে, অতীনবাবু কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন।

আমার এটাও মনে হয় যে, বাইরের লনে আমরা বসে আছি, আমাদের চোখে পড়বে, তা জেনেই ওভাবে আলোর সঙ্কেত শুরু করা হয়েছিল।

তাহলে ওসব কি দীপালীদেবীই করছিলেন?

না, দীপালীদেবী অত কাঁচা মেয়ে নন। পরের দিন ভোরে আমি অতীনবাবুর ঘরে গিয়ে উঠি। গত রাতের আলোর ইশারার কথা বলে তাঁকে কৌশলে বারান্দার কাছে দাঁড় করালাম। আগের রাতে যে মানুষের কাঠামো দেখেছিলাম, সে আরো লম্বা। বুঝলাম অতীনবাবুর অনুপস্থিতির সুযোগে অন্য কাউকে সেখানে দাঁড় করানো হয়েছিল। খুব সম্ভব মঙ শানকে।

তারপর মনে আছে, কোথা থেকে আলোর রেখা আসছিল সেটা দেখবার জন্য আমরা দুজনে বের হলাম।

মনে আছে বৈকি। তুমি একটা খাম কুড়িয়ে পেলে।

হ্যাঁ, খামটা ঝোপের ধারে এমনভাবে ফেলে রাখা হয়েছিল, যাতে সহজেই চোখে পড়ে। অতীনবাবুর নাম লেখা খাম, যেটা স্বাভাবিকভাবেই অতীনবাবু ফেলে দিয়ে থাকবেন। যে কোন লোকের পক্ষে সেটা সংগ্রহ করা

NOT FOR SALE

সহজ। এ ধরনের কেসকে আমরা বলি 'প্লানটেড' অর্থাৎ আরোপিত। এখানেও অতীনবাবুকে জড়াবার চেষ্টা। কিন্তু খামটার গন্ধতেই আমার সন্দেহ হয়েছিল।

খামের গন্ধ?

দীপালীদেবী যখন আমার কাছে এসেছিলেন, তখন তাঁর শরীর থেকে দামী একটা সুগন্ধ পেয়েছিলাম। প্যারীর খুব নামকরা সুবাস। খামেও সেই গন্ধ।

বলে যাও।

মঙ শানকে দেখলাম। দিব্যকান্তি, আকর্ষণ করার মতন চেহারা। তাঁরও কথাবার্তায় একই ইঙ্গিত। অতীনবাবুর প্রতি দোষারোপ।

মোট কথা লোকটাকে আমার ভাল লাগেনি।

যে রাতে আসরে কীর্তন হচ্ছিল, সে রাতে সাহস করে মঙ শানের ঘরে ঢুকে পড়লাম। এধার-ওধার খুঁজতে খুঁজতে কতকগুলো কাগজ হাতে এসে গেল। মোক্ষম দলিল। নিজের সম্বন্ধে মঙ শান এতটা সুনিশ্চিত ছিল যে, এসব কাগজগুলো গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তাই বোধ করেনি।

কিন্তু কাগজগুলো তুমি তো আবার রেখে এলে।

হ্যাঁ, কাগজগুলো হারালে মঙ শান সন্দেহ করত। তাহলে প্ল্যান বানচাল হয়ে যেত। তাই একটা কাগজ ছাড়া আর সব কাগজ রেখে দিয়ে এলাম। একবার প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিলাম, তাই তোমাকে বললাম কোনরকমে মঙ শানকে কথা বলে আটকে রাখতে।

রেখেছিলাম তো।

অজস্র ধন্যবাদ। তোমার মতন সহকারী দুর্লভ।

যাক, যে কাগজটা নিজের কাছে রেখে দিলে সেই দুর্লভ দলিলটা কি?

একটা পত্র।

পত্র?

হ্যাঁ, আসল পত্রটি পুলিশের হেফাজতে আমিই দিয়েছি। নকলটা পড়।

বৈশালী সুজিতের দিকে একটি কাগজ এগিয়ে দিল।

সুজিত পড়ল। ইংরাজীতে লেখা—

ডাউন তোমার বাবার কাছে চালান করে দিয়েছি।

নীচে লেখা ধন্যবাদ।

NOT FOR SALE

সুজিত অসহায়ভাবে বৈশালীর দিকে তাকাল।

অর্থোদ্ধার করতে পারলাম না।

শোনো, চিঠিটা মঙ শান লিখছে দীপালীদেবীকে। ডাউন বর্মী ভাষা। মানে ময়ূর। ওই চিঠির ওপরে দীপালীদেবী ধন্যবাদ লিখে ফেরত দিয়েছেন। আর একটা জিনিসও আমি মঙ শানের ঘরে রেখে আসিনি।

কি সেটা?

ওয়ালেট ঝেড়ে শুকনো একটা ফল পেয়েছিলাম। সেটা প্রফেসর বসাকের কাছে দিয়ে এসেছিলাম। যিনি টক্সিন নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি বললেন, ফলটার নাম বুনলুনদি। অত্যন্ত বিষাক্ত ফল। বর্মায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এর নির্যাস কাউকে ইনজেকশন দিলে বেহুঁশ হয়ে যায়, মাত্রা বেশী হলে মৃত্যু। ড্রাইভারের মৃত্যুর কারণ যে এরই ইনজেকশন, তাতে সন্দেহ করার কোন হেতু নেই।

ময়ূরটির সন্ধান পাওয়া গেছে?

হ্যাঁ, সেখানকার পুলিশ দীপালীদেবীর বাবা জহুরী সূরজমল খেত্রীর বাড়ি খানাতল্লাসী করে ময়ূর উদ্ধার করেছে।

ময়ূরের রুবির চোখ?

ভুবনবাবু ময়ূরের একটা রুবির চোখের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন, কিন্তু গোটা ময়ূরের দাম ছিল অনেক বেশী।

কেন, তুমি না বলেছিলে ময়ূরটা ব্রোঞ্জের তৈরি?

ময়ূরের বুকের কাছে একটা জায়গা টিপলে ফাঁক হয়ে যায়, আর সেই গোপন গহ্বরে একটি কাগজ, তাতে ঠিক কোন্ জায়গায় ভুবনবাবুর কালোবাজরের টাকা লুকোনো, তার হদিস ছিল। মঙ শানের ঘর থেকে যে কাগজগুলো এনেছিলাম, তাতে একটি কাগজ ছিল, লেখা আগামী তেরই রাত বারোটায় বকুলতলায় খুঁড়ব। সেখানেই মালিকের সব টাকা আছে। তুমি ঠিক এসো।

এই কাগজটা আমি মঙ শানের ঘরে আবার রেখে এসেছি।

কিন্তু ওগুলো কালোবাজারের টাকা কি করে বুঝলে?

বৈশালী হাসল।

সাধারণভাবে অর্জিত টাকা লোকে ব্যাঙ্কে রাখে, কিংবা সিন্দুকে, মাটির তলায় নয়।

NOT FOR SALE

কিন্তু আমার আরো একটা প্রশ্ন রয়ে গেল।

কি?

ময়ূরের রুবির একটা চোখ বদলে কে ঝুটো কাঁচ বসিয়ে দিল?

সম্ভবত দীপালীদেবী। তাঁর বাপকে দিয়ে এ কাজটি করিয়েছিলেন। তখন বোধহয় ময়ূরের পেটের কাগজের রহস্যের কথা তাঁর জানা ছিল না। ভুবনবাবু নিজেই দ্বিতীয় পক্ষের এই পরমাসুন্দরী স্ত্রীর কাছে কথাটা বলে থাকবেন, তারপর থেকেই ষড়যন্ত্রের জাল বোনা শুরু হয়। মঙ শানের সাহায্য নিয়ে ভুবনবাবুকে সরিয়ে দেওয়া এবং কোনরকমে অতীনবাবুকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারলেই পথ পরিষ্কার।

কিন্তু তোমাকে ডাকার কি অর্থ?

সাবধান, এবার মানহানির মামলা ঠুকে দেব। বোধ হয় দীপালীদেবীর ধারণা, মেয়ে গোয়েন্দাদের যাহোক একটা কিছু বুঝিয়ে দেওয়া যাবে।

কিন্তু আর একটা কথা—।

না, আর কোন কথা নয়। ক'টা বেজেছে খেয়াল আছে? আমি চলি। অনেকদিন পর একটু নিশ্চিন্তে ঘুমাব এবারে।

—সমাপ্ত—

NOT FOR SALE

বোলতার হুল

হঠাৎ মাথার কাছে টিপয়ের ওপর রাখা ফোনটা বেজে উঠল। একবার, দুবার। তারপরই পারিজাত বক্সির ঘুম ভেঙে গেল। হাত বাড়িয়ে ফোন তুলে নিয়ে ঘুম জড়ানো গলায় বললেন, হ্যালো। তারের ওপার থেকে নারী কণ্ঠ।

মিস্টার বক্সি আছেন?

কথা বলছি।

আমি রমা বসাক কথা বলছি।

পারিজাত বক্সির দু-ভ্রুর মাঝখানে সরু কয়েকটা আঁচড়। নামটা চেনবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না।

সেই কথাই বললেন।

ঠিক চিনতে পারলাম না।

ওপারে কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা, তারপর গলা শোনা গেল। সেই যে গত বছর দার্জিলিং-এ দেখা হয়েছিল। আমার মেয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে, আপনি—

পারিজাত বক্সির মনে পড়ে গেল।

ম্যালে ঘোড়ার পিঠ থেকে একটি মেয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল, পারিজাত বক্সি পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি মেয়েটাকে ধরে ফেলেছিলেন। মেয়েটির মা বাবা কাছেই ছিল। তারা ছুটে এসে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল। তাদের হোটেলে একদিন চায়ের নিমন্ত্রণও করেছিল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিসেস বসাক মনে পড়েছে। কি ব্যাপার এত রাত্রে—কথার সঙ্গে সঙ্গে পারিজাত বক্সি আড়চোখে একবার রেডিয়াম ঘড়ির দিকে নজর দিলেন। রাত এগারোটা দশ। রমা এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

আমি খুব বিপদে পড়েছি মিস্টার বক্সি।

অবশ্য বিপদে না পড়লে কেউ পারিজাত বক্সিকে স্মরণ করে না। বিশেষ করে এই রাতে।

পারিজাত বক্সি কি চিন্তা করলেন।

কি বিপদ!

আমার মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না।

NOT FOR SALE

কত বয়স মেয়েটির?

এই ন বছরে পড়েছে।

যে মেয়েটি ঘোড়ার পিঠ থেকে—

হ্যাঁ, আমার ওই একটিই মেয়ে।

কবে থেকে পাওয়া যাচ্ছে না?

আজ সকালে স্কুলে গিয়েছিল, আর ফিরে আসে নি।

মিস্টার বসাক কোথায়?

তিনি হাসপাতালে হাসপাতালে খোঁজ নিতে গেছেন, এখনও ফেরেন নি। আমার আপনার কথা মনে পড়ে গেল, তাই এত রাত্রে বিরক্ত করলাম।

পারিজাত বক্সি দু এক মুহূর্ত কি ভাবলেন! তারপর বললেন, এত রাতে গিয়ে কোন লাভ হবে না।

কাল সকালে যাব।

আমাদের ঠিকানাটা—

ঠিকানা দার্জিলিং-এ দিয়েছিলেন, আমার ডাইরিতে লেখা আছে। রমার কাতর অনুনয় শোনা গেল—দয়া করে আসবেন কিন্তু। আমাদের অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন। মেয়েকে না পেলে আমি পাগল হয়ে যাব। পারিজাত বক্সি ফোনটা নামিয়ে রাখলেন।

ঘুমের দফা শেষ। কোন চিন্তা মাথায় ঢুকলে আর ঘুম হয় না। বেড সুইচটা টিপে নীল বাতিটা জ্বালালেন। বাইরে ম্লান চাঁদের আলো। এলোমেলো বাতাস বইছে। নিশাচর এক পাখি কর্কশকণ্ঠে ডেকে চলেছে।

পারিজাত বক্সি ভাবতে শুরু করলেন।

মাসখানেক ধরে খবরের কাগজে মেয়ে হারানোর সংবাদ বের হচ্ছে। বেশীরভাগ মেয়েই স্কুল থেকে আর বাড়ি ফিরছে না।

এই সব অল্প বয়সের মেয়েদের দুটো উদ্দেশ্যে চুরি করা হয়ে থাকে। এক তাদের অভিভাবকদের কাছে চিঠি লিখে মুক্তিপণ দাবি করা। এসব বিশেষ করে বড়লোকদের মেয়েদের বেলায় হয়ে থাকে। যাদের মোটা টাকা দেবার সামর্থ্য আছে।

আর দুই, মেয়েদের ভিন্ন প্রদেশে বিক্রি করে দেওয়া। সেখানে তাদের দিয়ে ঝি কিংবা মজুরাণীর কাজ করানো হয়। কলকারখানায় কিংবা চা অথবা কফি বাগানে এইসব হয় গরীব অভিভাবকদের বেলায়, যাদের টাকা দেবার শক্তি নেই। আজকাল কিছু মেয়েকে সাগরের ওপারেও পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

NOT FOR SALE

বিরাট একটা পাপচক্র এই দেশের বুকে কাজ করে চলেছে। এদের উচ্ছেদ করা খুব দরকার। তা না হলে বহু বাড়িতেই শোকের ছায়া নামবে।

চেহারায়, পোশাকে বসাকদের উচ্চমধ্যবিত্তই মনে হচ্ছিল। কাজেই কিছুদিন পরে অপহরণকারীদের কাছ থেকে টাকা দাবি করে সম্ভবত একটা চিঠি আসবে। পারিজাত বক্সি চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। নীল বাতিটা নেভানো হয় নি।

ঘুম যখন ভাঙলো, তখন বেশ বেলা হয়েছে, বাইরে চড়া রোদ। দরজা খুলে বের হয়ে দেখলেন, বাইরে বেড-টি নিয়ে বাহাদুর দাঁড়িয়ে।

বেচারা কতবার এসে ফিরে গেছে কে জানে।

পারিজাত বক্সি বললেন, বেড-টি থাক বাহাদুর—

তুমি ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা কর। আমি এখনই বের হব। পারিজাত বক্সির মোটর যখন বালিগঞ্জের অভিজাত পাড়ায় লাল দু-তলা বাড়ির সামনে এসে থামল, তখন বেলা দশটা প্রায় বাজে।

মোটর থেকে নামতেই রমা ছুটে এসে সামনে দাঁড়াল। মনে হ'ল বোধহয় বাগানেই অপেক্ষা করছিল। ক্লান্ত দুটি চোখ। সারা রাত নিশ্চয় ঘুমায় নি।

কোন খবর পেয়েছেন?

পারিজাত বক্সির এ প্রশ্নের উত্তরে রমা মাথা নাড়ল। না।

মিস্টার বসাক কোথায়?

রমা হাত দিয়ে বারান্দার দিকে দেখাল।

বেতের চেয়ারে মিস্টার বসাক বসে। দুটি চোখ নির্মীলিত। রমার পিছন পিছন পারিজাত বক্সি বারান্দার দিয়ে এগিয়ে গেলেন। জুতোর শব্দে বসাক চোখ খুলল, তারপর পারিজাত বক্সিকে দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। আসুন। আসুন। আমাদের বড় বিপদ।

সামনে রাখা একটা চেয়ারে বসে পড়ে পারিজাত বক্সি বললেন, সব ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলুনতো, শুনি। বসাক চেয়ারে বসে রুমাল দিয়ে নিজের চোখ মুছে নিয়ে বলতে শুরু করল।

রমার কাছে তো শুনেছেন, লালি মানে ললিতা আমাদের একমাত্র সন্তান। সে মিশনারি স্কুল গ্রীন কটেজে পড়ত। স্কুলটা খুব কাছে। রাস্তার উপর।

ললিতা কিসে যেত?

পারিজাত বক্সি প্রশ্ন করলেন।

হেঁটেই যেত। বড় জোর মিনিট পনের লাগত।

NOT FOR SALE

একলাই যেত?

না। এ এলাকায় একটি মেয়ে তনু লালিকে ডেকে নিয়ে যেত। ফিরত একসঙ্গে।

তনুর কাছে খোঁজ করা হয়েছে?

এবার রমা কথা বলল।

আমি কালই তনুদের বাড়ী গিয়েছিলাম। তনু লালির সঙ্গে যাবার সময় গেছে কিন্তু দুপুরের দিকে তার শরীর খারাপ হওয়ায় রিক্সায় ফিরে এসেছিল।

তনুর শরীর খারাপ দেখলেন?

হ্যাঁ, তার খুব জ্বর। বিছানায় শুয়েছিল।

তারপর?

সাড়ে চারটের মধ্যে লালি বাড়ি ফিরে আসে, কিন্তু ছটার মধ্যে ন ফেরাতে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। স্কুলে খোঁজ করলাম। হেডমিসট্রেস বললেন, স্কুল রোজকার মতন চারটের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। স্কুলে আর মেয়ে নেই। তারপর আমি তনুদের বাড়ি যাই। সেখান থেকে ফিরে এসে ওঁকে ফোন করি।

রমা হাত দিয়ে বসাককে দেখিয়ে দিল।

পারিজাত বক্সি জিজ্ঞাসা করলেন।

আপনার কি অফিস?

বসাক মৃদুস্বরে বলল, আমার ছোট একটা ফ্যাক্টরি আছে, মেসিন পার্ট তৈরি করি। দরকার হলে সাতটা আটটা পর্যন্ত অফিসে থাকতে হয়।

খবরটা শুনে আমি খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। তখনই অফিস থেকে বের হয়ে বালিগঞ্জ থানায় গিয়েছিলাম। ও-সির সঙ্গে আগেই আমার একটু আলাপ ছিল। ও-সি আমাকে একটা লিখিত রিপোর্ট দিতে বললেন। দেবার পর লালির ইদানিং তোলা একটা ফটো চাইলেন। বাড়ী থেকে ফটোটা নিয়ে কালই আমি দিয়ে এসেছিলাম।

আপনি আর কোথাও মেয়ের খোঁজ করেছিলেন?

আমাদের এ শহরে আত্মীয়ের সংখ্যা কম। মোটে চার ঘর। সেখানে লালির যাবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

তবু আমি সে সব জায়গায় খোঁজ করেছি। শেষকালে বড় বা হাসপাতালেও গিয়েছি, কিন্তু লালিকে পাই নি। কথার শেষে বসাক কান্নায় ভেঙে পড়ল।

পারিজাত বক্সি চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর বসাক একটু স্থির হয়ে

NOT FOR SALE

বললেন, লালির একটা ফটো আমায় দিতে পারেন। বসাক রমাকে ইঙ্গিত করতে রমা ওপরে উঠে গিয়ে একটা ফটো এনে পারিজাত বক্সির হাতে দিল।

বছর খানেক আগে পারিজাত বক্সি লালিকে দেখেছিলেন দার্জিলিং-এ। এখন লালি যেন আরও একটু মোটাসোটা আরও হাসিখুশি হয়েছে। লাবণ্যময়ী এই মেয়েটিকে দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছা করে। ফটোটা পকেটে ফেলে পারিজাত বক্সি বললেন, ফটোটা আমি রাখলাম। আজ উঠি, পরে আবার আসব। ইতিমধ্যে কোন খবর থাকলে জানাবেন।

বসাক নিজের দু'হাতে পারিজাত বক্সির একটা হাত জাপটে ধরে বলল, মিস্টার বক্সি, মেয়েকে জীবন্ত ফিরে পাব তো? লালির কিছু হলে আমরা কেউ বাঁচব না। রমা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কেঁদে উঠল।

পারিজাত বক্সি আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে বললেন, এত উতলা হবেন না।

এভাবে কাঁদলে কি মেয়ে ফিরে আসবে! একটা কথা আপনাদের বলতে পারি যারা এভাবে মেয়ে চুরি করে, তারা সচরাচর মেরে ফেলে না। তাতে তাদের কোন লাভ নেই। তারা হয়তো টাকা চেয়ে আপনাদের চিঠি দিতে পারে। টাকা চেয়ে? বসাক টান হয়ে বসল, তা টাকা তারা চাক আমি দরকার হলে ফ্যাক্টরি, বাড়ি সব বিক্রি করে টাকা পাঠিয়ে দেব। লালির চেয়ে প্রিয় আমাদের কিছু নেই।

এবার পারিজাত বক্সি একটু কঠিন কণ্ঠে বললেন, আপনারা কি চান, আপনাদের কেসটা আমি হাতে নিই, তাহলে আপনাদের আমার কথামত চলতে হবে।

বলুন কি করতে হবে?

এ ধরনের টাকা চেয়ে কোন চিঠি পেলে আমাকে না জানিয়ে কিছু করতে পারবেন না।

বেশ, তাই হবে।

পারিজাত বক্সি উঠে পড়লেন।

বাড়ি যাবার পথে বালিগঞ্জ থানায় একবার নামবেন। ও-সি সুকান্ত হালদার তাঁর খুবই চেনা। এর আগে গোটা তিনেক কাজে তিনি সুকান্তকে সাহায্য করেছিলেন। তাই পারিজাত বক্সিকে দেখে সুকান্ত লাফিয়ে উঠল। আরে বক্সি সাহেব, কি মনে করে? মেজাজ শরিফ তো?

পারিজাত বক্সি হেসে বললেন, সুকান্ত, তোমার কাছে একটা খবরের জন্য এসেছি।

NOT FOR SALE

বলুন। বলুন।

মিস্টার বসাকের মেয়ে ললিতার নিখোঁজ হবার ব্যাপারে কোন খবর আছে?

সুকান্ত মাথা নাড়ল, না, কোন খবর নেই, এ সব কেস নিয়ে মহাচিন্তায় পড়েছি। আমার এলাকা থেকে এই মাসেই চারটে মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে।

চারটে? একটারও কিনারা হয়নি?

একটা হয়েছে। আভা পাল বলে একটা মেয়ে বম্বে স্টেশন থেকে ধরা পড়েছে।

সে কিন্তু লাইনে ঢুকবে বলে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। ললিতার কেসটা এ ধরনের নয় বলেই মনে হচ্ছে।

না, না, সুকান্ত সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল।

লালি তো নেহাৎ ছেলেমানুষ। খোঁজ নিয়েছি স্কুলের রেকর্ডও ভাল। আমার মনে হয় এটা মেয়ে চুরি করে মা বাপের কাছ থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা।

খুব সম্ভব। কেসটা নিশ্চয় লালবাজারে পাঠিয়ে দিয়েছ।

হ্যাঁ। লালির ফটো, ওর বাপের রিপোর্ট সব পাঠিয়ে দিয়েছি। রেডিওতে যাতে প্রচার হয়, তার ব্যবস্থাও করেছি। কেসটা কি আপনি হাতে নিয়েছেন?

মিস্টার বসাক আমার পূর্ব পরিচিত। তার খুব ইচ্ছা কেসটা আমি তদারক করি।

খুবই ভাল কথা। এ ব্যাপারে পুলিশ থেকে যতটা সম্ভব সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

ধন্যবাদ আজ চলি।

পারিজাত বক্সি মোটরে এসে বসলেন।

তাঁর মুখ খুবই চিন্তিত। লালির কিছু হবে না। এ রকম একটা আশ্বাস বাণী বসাকদের দিয়ে এলেন বটে, কিন্তু এ সব দুর্বৃত্তদের অসাধ্য কাজ নেই।

যদি দেখে লালিকে নিয়ে কোনরকম অসুবিধা হচ্ছে, বা তাদের ধরা পড়ার সম্ভাবনা, তাহলে লালিকে শেষ করে দিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করবে না।

দিন দুই পরে বসাকের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে পারিজাত বক্সি তনুদের বাড়ি এসে হাজির।

তনুর ভাল নাম অনিমা, সে প্রায়ই লালিরই বয়সী। হয়তো কয়েক মাসের বড় হবে। লালি আর তনু এক ক্লাসে পড়তো বটে, কিন্তু এক সেকশনে নয়।

NOT FOR SALE

তনুর বাবা অবনী পাকড়াশী, ভারত সরকারের এক অফিসের মাঝারি অফিসার।

তার তিন মেয়ে, এক ছেলে। দু মেয়ে কলেজে পড়ে। তনু স্কুলে। ছেলেটি এখনও লেখাপড়া শুরু করে নি। তনু জ্বর থেকে উঠে পথ্য করেছে।

নিজের পরিচয় দিয়ে পারিজাত বক্সি তনুর সাথে দেখা করতে চাইলেন। তনুকে তার সামনে আনা হল। মেয়েটির রং ময়লা। একমাথা কোঁকড়ানো চুল, ডাগর দুটি চোখ।

পারিজাত বক্সি জিজ্ঞাসা করলেন।

তোমার সঙ্গে লালির খুব বন্ধুত্ব ছিল?

হ্যাঁ।

তুমি জান লালিকে পাওয়া যাচ্ছে না?

হ্যাঁ, বাবার কাছে শুনেছি।

স্কুলে কেউ কিছু বলে নি?

জানি না। তারপর আমি আর স্কুলে যাই নি। আমার জ্বর হয়েছিল।

আচ্ছা, তোমরা তো একসঙ্গে স্কুলে যাওয়া আসা করতে?

হ্যাঁ।

রাস্তায় কেউ তোমাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছে?

রাস্তায়? কই না তো! বলেই চেঁচিয়ে উঠলো, একজন মাঝে মাঝে বলত।

কে সে?

একজন বুড়ি।

বুড়ি? কি বলত?

আমাদের বাপেরা কি কাজ করে, মোটর আছে কিনা, ভাড়া বাড়ি না নিজের বাড়ি। এইসব।

সেই বুড়ি কি তোমাদের আসা যাওয়ার পথে কোন বাড়িতে থাকত? না, রাস্তায় এক গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকত?

পারিজাত বক্সি আর জিজ্ঞাসা করলেন না। বুঝতে পারলেন সে বুড়িকে আর ধারে কাছে কোথাও পাওয়া যাবে না। তার কাজ শেষ করে সে সরে পড়েছে। তবে একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

যারা লালিকে নিয়ে গেছে তারা তাকে প্রাণে মারবে না। তাকে আটকে রেখে তার বাপের কাছে টাকা দাবি করবে।

তনুদের বাড়ী থেকে পারিজাত বক্সি সোজা গেলেন লালবাজারেই। এখানে হারিয়ে যাওয়া লোকদের খুঁজে বের করার জন্য আলাদা একটা বিভাগ আছে।

ডেপুটি কমিশনার অলক দাস এই বিভাগের চার্জে। দাসের সঙ্গে পারিজাত বক্সির বিশেষ আলাপ নেই। আগে বোধহয় একবার দেখা হয়েছিল।

NOT FOR SALE

তিনি দাসের সঙ্গে দেখা করলেন।

পারিজাত বক্সি আশা করেছিলেন দাস তাকে দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে। কিন্তু সেরকম কিছু হল না।

দাস তাঁর দিকে চোখ রেখে বলল, বলুন কি করতে পারি?

পারিজাত বক্সি আস্তে বললেন, আমার নামের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে কিনা জানি না।

দাস টেবিলের উপর রাখা একটা ফাইলের ফিতা খুলতে খুলতে উত্তর দিল। নামটা শোনা বলেই মনে হচ্ছে। আপনি তো শখের গোয়েন্দা?

পারিজাত বক্সি হাসবার চেষ্টা করে বললেন, কাজের জন্য টাকা যখন নিই তখন নিজেকে আর শখের গোয়েন্দা বলি কি করে?

দাস এ কথায় বিশেষ কর্ণপাত না করে বলল, দরকারটা কি বলুন? একটু পরেই আমাকে একটা জরুরি মিটিং-এ যেতে হবে।

বালিগঞ্জ এলাকা থেকে ললিতা বসাক বলে একটি মেয়ে নিখোঁজ হয়েছিল। সে বিষয়ে কোন খবর আছে আপনার কাছে? মেয়েটি স্কুল থেকে আর বাড়ী ফেরে নি।

স্কুলে খবর নিয়েছেন? পরীক্ষায় ফেল করেনি তো?

না, মেয়েটির স্কুলের রেকর্ড খুব ভাল।

বয়স কত?

বছর আট নয়।

আপনার কি ধারণা কেউ কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে?

জানি না। তবে মেয়েটি খুব অবস্থাপন্ন ঘরের। সেরকম কিছু হলেও আশ্চর্য হব না।

আচ্ছা আপনি দিন দশেক পরে একবার খবর নেবেন। আমি মেয়েটির নাম ধাম লিখে রাখছি।

পারিজাত বক্সি উঠে পড়লেন।

বাড়ি ফিরতেই বাহাদুর সামনে এসে দাঁড়াল।

আপনার ফোন এসেছিল।

কার কাছ থেকে?

মিস্টার বসাক।

বসাক। পারিজাত বক্সি ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, কি বললেন? আপনার খোঁজ করলেন, নেই শুনে বললেন, ঘন্টা খানেক পরে আবার ফোন করবেন।

NOT FOR SALE

পারিজাত বক্সি জামাকাপড় বদলে যখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন ফোন এল।

বসাকের গলা।

একটা চিঠি এসেছে।

কি চিঠি?

সাতদিনের মধ্যে যদি আমি দশহাজার টাকা না দিই তা হলে ললিতার ছিন্নমুণ্ড পার্শেল করে আমাকে পাঠানো হবে।

পারিজাত বক্সি বললেন, আপনি চিঠিটা নিয়ে এখনই আমার কাছে চলে আসুন। আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। আমার ঠিকানাটা লিখে নিন।

পারিজাত বক্সি ঠিকানাটা বললেন।

আধ ঘন্টার মধ্যে বসাক এসে গেল।

উস্কো খুস্কো চুল। পরনে পাঞ্জাবি পাজামা। মনে হ'ল বাড়িতে যে অবস্থায় ছিল, সেইভাবেই চলে এসেছে। চিঠিটা নিয়ে পারিজাত বক্সি পড়লেন।

মহাশয়,

আপনার মেয়ে আমাদের হেফাজতে ভালই আছে। তবে আজ থেকে সাতদিনের মধ্যে যদি আপনি দশহাজার টাকা না পাঠান, তাহলে আপনার আদরের মেয়ের ছিন্নমুণ্ড পার্শেল করে উপহার পাঠানো হবে। টাকাটা একশো টাকার নোটে লেকের পশ্চিম পাড়ে প্রথম বনচাঁড়াল গাছের নিচে রেখে দেবেন।

ইতি—

বোলতা

চিঠিটা লাল কালিতে লেখা। পরিষ্কার হস্তাক্ষর।

এ চিঠিটা আপনি কিভাবে পেলেন?

অফিসে যাবার জন্য মোটরে উঠতে গিয়ে দেখি বনেটের উপর পাথর চাপা এই চিঠিটা।

হুঁ। রোজ সকালে আপনি কি লেকে বেড়াতে যেতেন?

ওয়েদার ভাল থাকলে রোজই যেতাম। বোলতা সেটা জানে, তাই লেকে বনচাঁড়ালের নিচে টাকাটা রেখে দিতে বলেছে।

বসাক হঠাৎ বলল, আমি টাকাটা কালই দিতে চাই।

আজই ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তুলব।

পারিজাত বক্সি কিছুক্ষণ একদৃষ্টে বসাকের দিকে চেয়ে রইলেন। এরকম একটা কাজ করা খুবই স্বাভাবিক। যেখানে মেয়ের জীবন বিপন্ন হবার ষোল

NOT FOR SALE

আনা সম্ভাবনা। যেখানে যার টাকা দেবার সঙ্গতি আছে, তার পক্ষে এ ছাড়া আর কিছু করার নেই।

তবু পারিজাত বক্সি বললেন, এখনও সময় আছে, আর দু একদিন অপেক্ষা করুন।

বসাক কিছু বলতে যাবার আগেই ফোন বেজে উঠল।

পারিজাত বক্সি ফোন তুললেন, মিনিট দুয়েক, তার বেশী নয়, পারিজাত বক্সির সারা মুখ লালচে হয়ে গেল। দুটো চোখ জ্বলে উঠল।

স্কাউন্ড্রেল।

বসাক জিজ্ঞাসা করল কে?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পারিজাত বক্সি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি যখন আমার এখানে আসেন, তখন কোন গাড়ি ফলো করছিল?

লক্ষ্য করিনি। কেন বলুন তো?

এইমাত্র ফোনে বোলতা আমায় শাসাল, যদি আপনার ব্যাপারে আমি নাক গলাই, তা হলে আমার সমূহ বিপদ।

তাহলে?

পারিজাত বক্সি বললেন, এরকম শাসানি ফোনে চিঠিতে আমি অনেক বার পেয়েছি। কেউ কিছু করতে পারেনি। আপনি আমার জন্য চিন্তিত হবেন না।

আমি ভাবছি টাকাটা দিয়েই দেব।

পারিজাত বক্সি কি ভাবলেন, তারপর বললেন, ঠিক আছে। টাকাটা আপনি তুলুন, তারপর কি করতে হবে আপনাকে বলব।

ঠিক সন্ধ্যা ছটা নাগাদ বসাকের বাড়ির সামনে একটা ট্যাক্সি এসে থামল।

ট্যাক্সি থেকে একজন মাঝ বয়সি মাড়োয়ারী নামল। পরনে পাতলা ধুতি, লম্বা কোট, হাতে মোষের শিংয়ের ছড়ি। চাকরের হাতে একটা কার্ড পাঠিয়ে দিল। কার্ডে লেখা, বনোয়ারিলাল সুরেখা। আয়রন মার্চেন্ট।

একটু পরেই বসাক নেমে এল। কুণ্ঠিত গলায় বলল, মাপ করবেন, এখন ব্যবসা সম্বন্ধে কথা বলবার মতন মনের অবস্থা আমার নেই। দয়া করে আপনি অন্যদিন আসবেন, ফোনে যোগাযোগ করে। মাড়োয়ারি একটু হেসে বলল, মিস্টার বসাক, আমি পারিজাত বক্সি।

সে কি। এই পোশাকে? বোলতা যেভাবে পিছনে লেগেছে তাছাড়া উপায় আর নেই। আমার মনে হয় বোলতার লোক সর্বক্ষণ আপনার বাড়ীর উপর নজর রেখেছে। কাজের কথাটা বলে নিই। টাকাটা তুলেছেন তো?

হ্যাঁ।

NOT FOR SALE

কাল কখন লেকে যাবেন?

সাধারণত ছটা সাড়ে ছটার মধ্যে আমি যাই। ঠিক আছে টাকাটা গাছের নিচে রেখে আর কিন্তু আপনি অপেক্ষা করবেন না। তাহলেই বিপদ হবে।

আচ্ছা।

বসাককে একটু যেন উৎফুল্লই মনে হল। টাকাটা রাখলেই মেয়েকে ফিরে পাব।

আচ্ছা আমি চলি।

পারিজাত বক্সি বেড়িয়ে পড়লেন।

ট্যাক্সিটা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিল, তাতে গিয়ে উঠলেন।

পরের দিন সকালে বসাক যথারীতি মোটর নিয়ে বের হল। রাস্তায় মোটর রেখে বসাক লেকের মধ্যে ঢুকল। জমাট কুয়াশা। এক হাত দূরের কিছু দেখার উপায় নেই। কোটের ভিতরের পকেটে নোটের বাণ্ডিল। অনেক দিন ধরেই বসাক লেকে বেড়াচ্ছে, কিন্তু বনচাঁড়াল গাছটা ঠিক জানা নেই। সারি সারি সোঁদাল গাছ দেখেছে। পশ্চিম পাড়ে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। একটা অচেনা গাছ রয়েছে। শুধু ডাল সর্বস্ব। একটি পাতাও নেই। সম্ভবত এটাই বনচাঁড়াল গাছ। বসাক এদিক ওদিক তাকাল। কাছে পিঠে কেউ নেই। গাছের নিচে একটা গর্ত। কেউ বোধহয় মাটি কেটে নিয়ে গেছে।

আর একবার এদিক ওদিক দেখে বসাক নোটের বাণ্ডিলটা গর্তের মধ্যে রেখে দিল। তারপর কোনদিকে না চেয়ে হন হন করে এগিয়ে গেল। মোটরের কাছ বরাবর গিয়েই বসাক থমকে দাঁড়াল। আবার বনেটের উপর একটা কাগজ।

বসাক কাগজটা তুলে নিয়ে পড়ল।

মহাশয়,

আপনি নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে এনেছেন। এরপর যা হবে তার জন্য সারাজীবন আপশোস করতে হবে। আজ টাকা নিয়ে এসেছিলেন বটে। কিন্তু গাছের উপর টিকটিকি পাহারায় ছিল। টাকাটা আমরা নিতে পারি নি। যদি ভাল চান তো পুলিশ টিকটিকির সাহায্য নিতে যাবেন না। তাহলে মেয়েকে হারাবেন।

ইতি—

বোলতা

চিঠি পড়তে পড়তে বসাক রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠল। টিকটিকি মানে পারিজাত বক্সি গাছের উপর বসেছিল, তাই বোলতার দল টাকা নিতে

NOT FOR SALE

আসতে পারে নি। এই বসাকের প্রথম মনে হল, পারিজাত বক্সির সঙ্গে যোগাযোগ না করলেই ভাল হত। তাহলে হয়তো ললিতা এতদিনে ফিরে আসত। পারিজাত বক্সির কথা বসাকের মনেও ছিল না। রমাই মনে করিয়ে দিয়েছিল। তখন তাদের ডুবন্ত মানুষের মত অবস্থা। একটা কুটো পেলেও আঁকড়ে ধরতে মন চায়।

বসাক আবার লেকের মধ্যে ঢুকল। অতগুলো টাকা ওভাবে পড়ে থাকাটা ঠিক নয়। একটু বেলা হলে যে কেউ তুলে নিতে পারে।

বনচাঁড়াল গাছটার তলায় গিয়ে বসাক থমকে দাঁড়াল, একটা হলদে কাগজের প্যাকেটের মধ্যে নোটগুলো রাখা ছিল। হলদে কগজটা রয়েছে নোট উধাও। সর্বনাশ, কি হবে। ইতিমধ্যে লোক চলাচল বেড়ে গেছে। কুয়াশাও আর নেই।

কে নিল টাকার বাণ্ডিল।

বসাক কাছাকাছি ডালগুলোর ওপর নজর দিল। কেউ নেই। তাহলে কি বোলতার লোকেরা টাকা নিয়ে গিয়ে মিছে কথা বলছে। চাপ দিয়ে তার কাছ থেকে আরও টাকা আদায় করার জন্য—কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

প্রথমেই বসাকের তাঁর কথা মনে হল, তিনি পারিজাত বক্সি। সত্যিই তিনি গাছের ডালে অপেক্ষা করছিলেন, কিনা, সেটাও জানা যেতে পারে।

তাছাড়া এ অবস্থায় বসাকের কি করা উচিত, সে বিষয়েও আলোচনা করা যেতে পারে।

কিন্তু বসাক সেসব কিছু করল না। বোলতার লোক তাকে চোখে চোখে রেখেছে। পারিজাত বক্সির কাছে গেলে এরা খেপে উঠবে। এমন নৃশংস কাজ নেই, এরা করতে পারে না। সত্যিই হয় তো পার্শেলে লালির মুণ্ডটা পাঠিয়ে দেবে। কথাটা মনে হতেই বসাক শিউরে উঠল। তার চেয়ে চুপচাপ থাকাই ভাল।

বোলতা নিশ্চয় আবার চিঠি দেবে। তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করলেই হবে।

এদিকে গাছের ডালে পাতার আড়ালে পারিজাত বক্সি চুপচাপ বসে। অবশ্য তাকে পারিজাত বক্সি বলে চিনতে পারা সম্ভব নয়। গায়ে আধ-ময়লা ছেঁড়া গেঞ্জি, চেক কাটা লুঙ্গি। দেখলে মনে হয় বস্তির কোন লোক ডাল ভাঙতে গাছে উঠেছে। পারিজাত বক্সি বসে বসে দেখলেন। বসাক একটা প্যাকেট গাছের তলায় রেখে চলে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত কেউ কাছে এল না। কি ব্যাপার, একটু পরেই এখানে লোক আসবে। ততক্ষণ পর্যন্ত বোলতার দল নিশ্চয় অপেক্ষা করবে না। পারিজাত বক্সি নেমে এলেন। তারপর টাকার

NOT FOR SALE

ব্যাণ্ডিলটা তুলে নিয়ে গেঞ্জির মধ্যে রেখে এগিয়ে গেলেন। মেনকা সিনেমার সামনে তাঁর গাড়িটা রাখা আছে। সেটাতে গিয়ে উঠলেন। ঠিক করলেন সন্ধ্যা নাগাদ বসাকদের বাড়ি গিয়ে টাকাটা ফেরত দিয়ে আসবেন। অবশ্য ছদ্মবেশেই যেতে হবে। নতুন কোন ছদ্মবেশে যাতে বোলতার লোক সন্দেহ না করতে পারে। তখনও বিকাল হয়নি। দুপুরের শেষ।—

বসাককে একটা ফোন করবেন বসে বসে পারিজাত বক্সি ভাবছেন, এমন সময় বাহাদুর একটা কার্ড এনে তার সামনে ধরল। কার্ডটা হাতে নিয়ে পারিজাত বক্সি পড়লেন। অমল বিকাশ মণ্ডল। নয়নগড় এস্টেটের ম্যানেজার। নিচে বসা, আমি আসছি।

একটু পরেই পারিজাত বক্সি বসবার ঘরে নেমে এলেন। একটা কোচে একটি ভদ্রলোক বসে। রং খুব কালো, কিন্তু স্বাস্থ্যবান। ঠোঁটের ওপর পাকানো বিরাট গোঁফ। ধবধবে সাদা পাঞ্জাবীর ওপর বাসন্তি রংয়ের বিরাট চাদর, কোঁচা মেঝের ওপর লোটাচ্ছে। দু হাতের আঙুলে গোটা ছয়েক আংটি।

পারিজাত বক্সি ঘরে ঢুকতেই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়াল, তারপর আচমকা নিচু হয়ে পারিজাত বক্সির পায়ের ধূলো নিয়ে বলল, আমার নাম অমল বিকাশ মণ্ডল। আমি নয়নগড় এস্টেটের ম্যানেজার। রাণীমা একেবারে আপনাকে স্মরণ করেছেন। মহিষাদলের কাছাকাছি নয়নগড়। জমিদারী প্রথা বিলোপ হবার আগে খুব বিরাট জমিদারি ছিল। এখনও অবশ্য ছিটো ফোটা যা আছে, তাও কম নয়। পদ্মাবতীর উপাধি রাণী। দোর্দান্ত প্রতাপ রাণীর ডাকে বছর পাঁচেক আগে একবার পারিজাত বক্সি নয়নগড়ে গিয়েছিলেন। রাণীর হীরার হার চুরি গিয়েছিল। পারিজাত বক্সি হারের কিনারা করেছিলেন। রাণী দক্ষিণা যা দিয়েছিলেন পারিজাত বক্সির আশাতিরিক্ত। ম্যানেজারের কথায় পারিজাত বক্সি বললেন,—আমার পক্ষে এখন কলকাতা ছাড়া সম্ভব নয়। আজ্ঞে, আপনাকে কলকাতা ছাড়তে তো হবে না।

তাহলে?

রাণীমা এখানে পার্ক হোটেলে উঠেছেন, আপনাকে একবার দয়া করে সেখানে পায়ের ধূলো দিতে হবে।

কি ব্যাপার? এবার আবার কি চুরি গেল?

আজ্ঞে আমি কিছু বলতে পারব না। এসব নিয়ে রাণীমা আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন না। আপনি দয়া করে চলুন। রাণীমা বলেছেন, এক ঘন্টার মধ্যে আপনাকে রেখে যাবো। সঙ্গে গাড়ী আছে।

পারিজাত বক্সি জানলা দিয়ে বাইরে দেখলেন। গেটের সামনে বিরাট একটা আমেরিকান গাড়ি। উর্দিপরা ড্রাইভার বসে আছে।

NOT FOR SALE

ম্যানেজার আবার বলল, দয়া করে আর দেরী করবেন না। রাণীমা আজ রাতেই নয়নগড় ফিরে যাবেন।

ঠিক আছে। একটু বসুন আমি পোশাকটা পাল্টে আসি।

মিনিট কুড়ির মধ্যে পারিজাত বক্সি তৈরি হয়ে এলেন। পরনে চোস্ত আর প্রিন্স কোট।

প্রথমে পারিজাত বক্সি, তার পাশে ম্যানেজার। ড্রাইভার দরজা বন্ধ করতে ম্যানেজার বলল, পার্ক হোটেল একটু জোরে চালাও, মোটর যেন উড়ে চলল।

পারিজাত বক্সির মন কিন্তু বসাকদের ব্যাপারে। টাকাটা ফেরত দিতে হবে, যেমন করে হোক উদ্ধার করতে হবে ললিতাকে।

স্যার কি পান খান? ভাল কিমাম দেওয়া পান?

পারিজাত বক্সি মাথা নাড়ালেন, না।

তারপরই অঘটন ঘটল।

চোখের সামনে পুঞ্জীভূত অন্ধকার। নিশ্বাসের কষ্ট হল। তাঁর নাকের ওপর ম্যানেজারের একটা রুমাল চেপে ধরেছে। পারিজাত বক্সির যখন জ্ঞান হল, দেখলেন একটা তক্তপোষের ওপর শুয়ে আছেন। অন্ধকার ঘর। কোন জানলা নেই। অনেক ওপরে একটা ঘুলঘুলি। তার মধ্য দিয়ে অল্প আলো আসছে।

পারিজাত বক্সি উঠে বসলেন, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, চোখ খুলতে পারছেন না। পকেটে হাত দিয়েই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পকেটে রাখা ছোট পিস্তলটা নেই। তার মানে, যারা তাকে এখানে এনেছে, তারাই পিস্তলটা সরিয়ে রেখেছে।

আস্তে আস্তে পারিজাত বক্সি দাঁড়ালেন। এত অন্ধকার যে ভাল করে কিছু দেখবার উপায় নেই। হাতড়ে দরজার কাছে গেলেন। ঠেলে দেখলেন দরজা বাইরে থেকে বন্ধ।

আবার পারিজাত বক্সি ফিরে তক্তপোষের ওপর বসলেন। নয়নগড়ের রাণীমার ব্যাপারটা সব সাজানো।

পারিজাত বক্সির একটা ভুল হয়ে গেছে। তার উচিত ছিল পোশাক পাল্টাবার জন্য ওপরে আসার সময় একবার পার্ক হোটেলে রাণীমাকে ফোন করা।

বলা যায় না, সাজানো রাণীমাও বোধহয় কেউ থাকত।

হঠাৎ দরজা খুলে গেল।

কালো মোটা একটা লোক ঘরে ঢুকলো। চুল ছোট করে ছাঁটা। ঠিক কুস্তিগিরের মত চেহারা।

NOT FOR SALE

নমস্কার বক্সি সায়েব, কি খাবেন, চা না কফি?

সে কথার উত্তর না দিয়ে পারিজাত বক্সি প্রশ্ন করলেন, আমাকে আপনারা ধরে আনলেন কেন?

লোকটা জিভ কামড়ালেন, ছি, ছি, ওভাবে বলবেন না।

আপনি নিজে ধরা না দিলে আমাদের সাধ্য কি আপনাকে আমরা ধরি।

একটু থেমে লোকটা আবার বলল, মনে করুন, টিকটিকি পোষা আমাদের শখ।

কতদিন আমাকে এভাবে আটকে রাখবেন।

ওই টাকার ব্যাপারে একটা ফয়শালা হলেই ছেড়ে দেব।

ললিতা কোথায়?

একটু চুপ করে লোকটা বলল, আছে কোথাও। তবে একটা কথা বলছি আপনাকে, খুব ভালই আছে। টাকাটা হাতে এলেই তাকে তার বাপের বাড়ির দরজায় নামিয়ে দেব।

আমার পিস্তলটা কি হল?

সেটাও ভাল জায়গায় রাখা আছে। ওসব মারাত্মক জিনিস কি ওভাবে রাখতে আছে, কখন কি বিপদ ঘটায় বলা যায়।

পারিজাত বক্সি বুঝতে পারলেন, তিনি খুব শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছেন।

কোন কথা বের করতে পারবেন না। তিনি চুপ করে রইলেন।

একটু পরে দরজা দিয়ে আর একটা লোক ঢুকল। একেবারে একরকম দেখতে যেন যমজ ভাই। তার হাতে একটা ট্রে। ট্রের ওপর চায়ের কাপ। প্লেটে দুটো টোস্ট। কোণ থেকে একটা টিপয় টেনে এনে পারিজাত বক্সির সামনে রাখল। তার ওপর ট্রে-টা নামিয়ে রেখে বলল, নিন স্যার, কাল থেকে না খেয়ে আছেন। তার মানে, পারিজাত বক্সি চমকে উঠলেন। একটা রাত কেটে গেছে এখানে? কাল বিকাল মোটরে উঠেছিলেন। এতক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন? নিন স্যার, কিছু মুখে দিন।

লোকটা আবার তাগাদা দিল।

পারিজাত বক্সি দু এক মুহূর্ত ভাবলেন। চায়ে অথবা টোস্টে তো কিছু মেশানো নেই।

খেলে তারপর যদি বেহুঁশ হয়ে পড়েন।

প্রথম লোকটা যেন তাঁর মনের কথাটা বুঝতে পারল।

হাসতে হাসতে বলল, আপনি মিথ্যা সন্দেহ করছেন। খাবারে কিছু মেশানো নেই। অবশ্য আপনার মতন লোককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে

NOT FOR SALE

ফেলতে পারলে, আমাদের কারবারের খুবই উপকার হয়। নির্ঝঞ্ঝাটে আমরা ব্যবসা করতে পারি, কিন্তু বিশ্বাস করুন, সেরকম কোন উদ্দেশ্য এখন আমাদের নেই।

এতক্ষণ পারিজাত বক্সি কিছু বোধ করেন নি, কিন্তু খাবার সামনে আসতে বুঝতে পারলেন, পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে। বেশ খিদে পেয়েছে।

তিনি টোস্ট আর চায়ের কাপ তুলে নিলেন। খাওয়া শেষ হবার আগেই প্রথম লোকটা বেরিয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় লোকটা বসেছিল মেঝের ওপর! পারিজাত বক্সি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কটা বেজেছে ভাই? লোকটা হেসে উঠল, সেকি স্যার, নিজের কব্জিতে ঘড়ি বাঁধা, আর আমাকে সময় জিজ্ঞাসা করছেন।

পারিজাত বক্সির খেয়াল হল। তাই তো, পিস্তল এরা সরিয়ে রেখেছে, কিন্তু হাতের ঘড়ি তো খুলে নেয় নি। এরা ছিঁচকে চোর নয়। রুই কাতলার কারবারি। ঘড়িতে সময় দেখলেন। সাড়ে আটটা।

আবার লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ জায়গাটার নাম কি ভাই?

লোকটা ট্রেটা উঠিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলল, সাড়ে দশটা নাগাদ আপনার ভাত নিয়ে আসব।

কিন্তু আমার কথার তো উত্তর দিলে না।

লোকটা একটা চোখ বন্ধ করে বিশ্রীভাবে হাসল, আমরা মাঝে মাঝে কালা হয়ে যাই স্যার। সব কথা শুনতে পাই না।

লোকটা যখন দরজার কাছে বরাবর গেছে, তখন পারিজাত বক্সি ডাকলেন।

শোন।

লোকটা ফিরে দাঁড়াল।

আমার স্নান করার কি হবে?

ওই যে স্যার, সব বন্দোবস্ত আছে, আপনার আগে অনেক বড় বড় অতিথি এখানে কাটিয়ে গেছেন। লোকটা একদিকের একটা দরজা খুলে দিল।

পারিজাত বক্সি উঁকি দিয়ে দেখলেন।

তাকের উপর তেল, সাবান, তোয়ালে। মেঝের উপর বিরাট চৌবাচ্চা ভর্তি জল। কল নেই।

লোকটা চলে যেতে পারিজাত বক্সি ভাবতে বসলেন। কল নেই। তার মানে কলকাতা থেকে বোধহয় বেশ দূরের কোন জায়গা। তাঁকে বোধহয় অনেক দূরে নিয়ে আসা হয়েছে।

NOT FOR SALE

লালিও কি ধারেকাছে কোথাও আছে? বলা শক্ত। কোনরকমে বাইরে বের হতে পারলে খোঁজ করা যায়। কিন্তু বাইরে বের হবার কোন পথ নেই, উপায়ও নেই।

বাড়তি কাপড়জামা নেই, কাজেই তোয়েল জড়িয়ে স্নান করতে হ'ল। স্নান সারা হতেই দরজা খুলে গেল। আগের সেই দ্বিতীয় লোকটি এসে ঢুকল। হাতে ফতুয়া আর লুঙ্গি। নিন স্যার, একটু ভুল হয়ে গেছে। এগুলো পরে নিন। একেবারে আনকোরা। পারিজাত বক্সির একটু আশ্চর্যই লাগলো।

এরা তো ভালভাবে জানে পারিজাত বক্সি এদের এক নম্বরের শত্রু। তাও যে তাকে এত আদর যত্ন করছে।

দুপুরের ভাত খাওয়ার পর পারিজাত বক্সি বিছানার ওপর শুয়ে পড়লেন। ঘুমালেন না। ঘুমানো সম্ভব নয়। শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।

তাঁর বাড়ির লোক নিশ্চয় রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। লালবাজারেও সম্ভবত যোগাযোগ করেছে। বসাকরা যদি ফোন করে থাকে, তারাও চিন্তিত হয়ে পড়বে। পারিজাত বক্সি কোথায় এ খবর কেউ দিতে পারবে না।

এপাশ ওপাশ করে সারাটা দুপুর কাটাল। পারিজাত বক্সি এটুকু বুঝতে পেরেছেন, এরা তার চরম ক্ষতি করবে না। তিনি না থাকলে বসাক টাকাটা দিয়েই দেবে। সে তো এ বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহী। টাকাটা পেয়ে গেলে এরা লালিকেও ফেরত দেবে আর পারিজাত বক্সিকে ছেড়ে দেবে।

কিন্তু কি লজ্জা। পারিজাত বক্সিকে হার স্বীকার করতে হবে। পুলিশ মহল হয়তো বিদ্রূপ করবে। ভবিষ্যতে কেউ তার উপর নির্ভর করবে না।

খুট করে একটা শব্দ।

পারিজাত বক্সি চমকে চোখ খুললেন।

দরজার একটা পাল্লা খুলে গেল। তার ফাঁক দিয়ে বাঁক কাঁধে জল নিয়ে একটা লোক ঢুকল। পারিজাত বক্সি বুঝতে পারলেন, লোকটার কাজ চৌবাচ্চা ভর্তি করা।

দ্বিতীয়বার লোকটা বাঁক কাঁধে নিয়ে ঢুকতেই—পারিজাত বক্সি উঠে পড়লেন।

পা টিপে টিপে বাথরুমে ঢুকে পিছন থেকে সজোরে লোকটার গলাটা টিপে ধরলেন।

লোকটার গলা থেকে একটুও শব্দ বের হল না।

সটান মেঝের ওপর পড়ে গেল। কিন্তু পড়বার আগেই পারিজাত বক্সি তাকে জাপটে ধরলেন।

NOT FOR SALE

তারপর নিজের ফতুয়া আর লুঙ্গি লোকটাকে পরিয়ে লোকটার পোশাক নিজে পরে নিলেন। এমন কি মাথার পাগড়িও।

লোকটাকেও সাবধানে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, বাঁক কাঁধে করে নিজে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলেন। দরজার কাছে টুলের ওপর একটা লোক বসে। চারিদিকে অন্ধকার। লোকটা কিছু বুঝতেই পারল না। খালি দুটো টিনে পারিজাত বক্সি নিজের পোশাক ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

সোজা হেঁটে তিনি রাস্তার ধারে এসে দাঁড়ালেন।

রাস্তা মানে পায়ে চলা পথ।

একটু দূরে একটা ইঁদারা দেখা গেল। এখান থেকেই বোধহয় লোকটা জল ভরেছিল।

পারিজাত বক্সি ইঁদারার পাশে একটু দাঁড়ালেন। টুলের ওপর বসা লোকটার অস্পষ্ট কাঠামো দেখা গেল।

টিনের মধ্যে থেকে পোশাকটা বের করে পারিজাত বক্সি টিন আর বাঁক ইঁদারার পাশে রেখে দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে গেলেন।

পারিজাত বক্সির বরাত ভাল। কৃষ্ণপক্ষের রাত। কাছের জিনিস দেখবার উপায় নেই।

তবু সাবধানের মার নেই। তিনি পথের পাশের জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে হাঁটতে লাগলেন।

একটু পরেই আকাশে চাঁদ দিল। ম্লান আলো। অন্ধকারই ভাল ছিল। পারিজাত বক্সিকে দেখতে পাবার সম্ভাবনা কম ছিল। তিনি জঙ্গলের আরও গভীরে ঢুকে পড়লেন। অনেকটা পথ হাঁটার পর একটু দাঁড়ালেন। পরিশ্রমে, উত্তেজনায় পোশাক ভিজে গিয়েছিল। পোশাক ছেড়ে নিজের শার্ট প্যান্ট পরে নিলেন। একবার জানতে পারলেই চারিদিকে তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে পড়বে। ধরতে পারলে তাঁর কি হাল হবে, ভাবতেও তিনি শিউরে উঠলেন।

হঠাৎ দেখতে পেলেন একটা লণ্ঠনের আলো দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে।

কোন লোক হয়ত তাঁরই খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। পারিজাত বক্সি মোটা একটা গুঁড়ির পিছনে লুকিয়ে পড়লেন। আলোটা কাছে আসতে দেখতে পেলেন মন্থর গতিতে একটা গরুর গাড়ি এগিয়ে চলেছে। গাড়ির লণ্ঠন ঝুলছে।

এই সুযোগে গাড়িতে উঠতে পারলে খুব সুবিধা হয়। কিন্তু গাড়িটা যদি শত্রু পক্ষের হয়।

NOT FOR SALE

আরও কাছে আসতে পারিজাত বক্সি দেখতে পেলেন তরিতরকারী বোঝাই বোধহয় হাটে চলেছে। বরাতে যা আছে হবে, ভেবে পারিজাত বক্সি দ্রুত পায়ে গাড়ির সামনে গিয়ে দুটো হাত তুলে দাঁড়ালেন।

গাড়োয়ান গুন গুন করে গাইতে গাইতে চলছিল; জঙ্গলের মাঝখানে আচমকা একটা লোক দেখে আঁতকে উঠল।

ভয় নেই, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। অনেকক্ষণ ধরে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছি। তুমি কোথায় যাবে?

গাড়োয়ান ভাল করে দেখল। বোধহয় বুঝতে পারল লোকটা চোর ছ্যাঁচড় নয়। বিশ্বাস করা যেতে পারে।

বলল, আমি ঝাড়গ্রাম ইষ্টিশনে যাব। ওদিক পানে গেলে তবু সুবিধা হবে? উচ্চারণ শুনে মনে হল, লোকটা এখানকার আদিবাসী।

পারিজাত বক্সি এগিয়ে এসে বললেন, খুব সুবিধা হয় ভাই। তুমি আমাকে নিয়ে চল।

আয়, গাড়োয়ান একটু সরে বসল।

পিছনে বসা সম্ভব নয়। তরিতরকারীতে গাড়ী বোঝাই। পারিজাত বক্সি সামনে গাড়োয়ানের পাশে বসলেন।

কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গীতে বললেন, আমি সরকারের লোক। এখানে শালগাছ জরিপ করতে এসেছিলাম। সঙ্গের লোকটা যে কোথায় গেল বুঝতে পারলাম না। আমিও পথ হারিয়ে ফেললাম।

গাড়োয়ান খুব বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে বলল, ইসব অপদেবতার কাণ্ড বাবু। তবু বরাত ভাল। প্রাণে বেঁচেছিস অপদেবতা তোর ঘাড় মুটকে রক্ত চুষে খেয়ে নিত।

পারিজাত বক্সি আর কিছু বললেন না।

গরুর গাড়ি তখন ঝাড়গ্রাম স্টেশনে পৌঁছল। তখন ভোর হয়ে গেছে, তরকারী বোঝাই অনেক গরুর গাড়ি স্টেশনের বাইরে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে।

পকেটে হাত দিয়ে পারিজাত বক্সি ব্যাগটা বের করলেন। একমাত্র পিস্তল ছাড়া, লোকগুলো আর কিছু সরায় নি। একটা দশ টাকার নোট বের করে গাড়োয়ানের দিকে এগিয়ে দিলেন। নাও।

গাড়োয়ান হাত জোড় করল, না বাবু, ইসব আমি নিতে পারব নাই। আমার তো বাড়তি কোন মেহনত হয় নাই। অনেক বলা সত্ত্বেও গাড়োয়ান কিছু নিল না।

পারিজাত বক্সি সোজা স্টেশন মাস্টারের ঘরে ঢুকে পড়লেন। বাইরে থাকা নিরাপদ নয়।

NOT FOR SALE

ভিতরে ঢুকে দেখলেন একটি লোক দুটো টেবিল জড় করে একটা চাদর ঢাকা দিয়ে ঘুমাচ্ছে। এই লোকটাই বোধহয় স্টেশন মাস্টার।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে পারিজাত বক্সি বসলেন। আধ ঘন্টা, একটু একটু করে প্ল্যাটফর্মে ভিড় বাড়ছে। বেশীরভাগই কুলির দল। তরিতরকারীর বোঝা নিয়ে আসছে একটু পরেই ঘুমন্ত লোকটা চাদর সরিয়ে উঠে বসল। সামনে বসা পারিজাত বক্সিকে দেখেই চমকে উঠল, কে?

কোন কথা না বলে পারিজাত বক্সি পকেট থেকে নিজের কার্ডটা বের করে তার সামনে ধরলেন।

ঘুমচোখে কার্ডটা পড়েই লোকটা হাঁউমাঁউ করে উঠল।

কি ব্যাপার? গোয়েন্দা কেন? আমি কি অপরাধ করলেন।

পারিজাত বক্সি তাকে আশ্বস্ত করলাম।

না, না, আপনার ভয় পাবার কিছু নেই।

একটা মেয়ে চুরির ব্যাপারে আমি এখানে এসেছি। পুলিশের সঙ্গে একটু যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন?

নিশ্চয় পারি স্যার। আসুন।

লোকটাই স্টেশন মাস্টার। থানায় ফোন করে পারিজাত বক্সিকে বলল, নিন স্যার, কথা বলুন।

পারিজাত বক্সি নিজের পরিচয় দিয়ে সংক্ষেপে ঘটনাটা বললেন।

পারিজাত বক্সির নাম ও সি-র পরিচিত।

আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমরা আসছি। মিনিট কুড়ির মধ্যে জীপ এসে হাজির।

ও সি-র সঙ্গে দুজন কনস্টেবল।

গরুর গাড়ির গাড়োয়ান তখনও ছিল। তার কাছ থেকে জানা গেল যেখান থেকে পারিজাত বক্সি গাড়িতে উঠেছিলেন, সে জায়গাটার নাম কুর্মিটোলা।

জীপ কুর্মিটোলার দিকে ছুটল।

জঙ্গলের কাছাকাছি যেতে পারিজাত বক্সি কিছুটা চিনতে পারলেন। এক জায়গায় তাঁর ছাড়া পোশাক পড়ে রয়েছে। জঙ্গলটা ছাড়াতেই ইঁদারা দেখা গেল। তার পাশেই লম্বা একখানা বাড়ি।

পারিজাত বক্সি বললেন, এই বাড়ি।

সবাই নেমে পড়ল। পুলিশরা বন্দুক উঁচিয়ে এগিয়ে গেল।

পাকা দেয়াল। টিনের ছাদ।

তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। সব পরিষ্কার। কেউ কোথাও নেই। এমন কি বাথরুমে রাখা সাবান, তেল, তোয়ালে সব উধাও।

NOT FOR SALE

শুধু দেয়ালে একটা কাগজ আটকানো। তাতে লাল কালিতে বড় বড় করে লেখা,

'বক্সি সায়েব'

প্রথম রাউণ্ডে আপনি জিতলেন, কিন্তু এটাই শেষ রাউণ্ড নয়। আবার দেখা হবে। যদি ললিতা বসাকের ব্যাপারে নাক গলান, তাহলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। সাবধান।

ইতি—

বোলতা

কলকাতায় ফিরে গিয়েই পারিজাত বক্সি বসাককে ফোন করলেন।

বসাক ছিল না। রমা ফোন ধরল!

আপনি কোথায় ছিলেন?

বিশেষ কাজে দুদিন কলকাতার বাইরে গিয়েছিলাম।

এ দিকে কি খবর?

ভাল নয়। আপনি বিকালে একবার আসতে পারবেন?

আসব। মিস্টার বসাককে থাকতে বলবেন।

বিকালে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে পারিজাত বক্সি হাঁটতে হাঁটতে বসাকদের বাড়ি ঢুকলেন। তাঁর সঙ্গে কাবুলিওয়ালার পোশাক। একেবারে নিখুঁত ছদ্মবেশ। চেনা দুষ্কর।

বসাকদের চাকর কিছুতেই তাঁকে ভিতরে ঢুকতে দেবে না। চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

চীৎকার শুনে বসাক এসে দাঁড়াল।

বসাকের চেহারা দেখে পারিজাত বক্সি অবাক। এই কদিনেই বয়স যেন বেড়ে গেছে। ক্লান্ত দুটি চোখ। ঠোঁটের দুপাশ ঝুলে পড়েছে।

তার কাছে গিয়ে পারিজাত বক্সি ফিসফিস করে নিজের পরিচয় দিলেন।

বসাক অবাক হয়ে গেল। তাঁকে নিয়ে বসবার ঘরে ঢুকল, ঢুকেই বলল, মিঃ বক্সি আপনার সাহায্যের আমার আর দরকার নেই।

কি ব্যাপার?

ব্যাপার দেখবেন? বসাক পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে পারিজাত বক্সির সামনে রাখল।

পারিজাত বক্সি পড়লেন।

মহাশয়,

আমরা দশহাজার টাকাতেই আপনার মেয়েকে ছাড়তে রাজী ছিলাম। কিন্তু আপনি আমাদের পিছনে টিকটিকি লেলিয়ে দেওয়ায় কুড়ি হাজার টাকার কমে তাকে ফেরত দেওয়া সম্ভব হবে না।

NOT FOR SALE

আগামী পনের তারিখে বেলা দুটার মধ্যে চিড়িয়াখানার সাদা বাঘের খাঁচার সামনে একটা প্যাকেটে রেখে দেবেন। অপেক্ষা করবেন না। তাহলে বিপদ হবে। টিকটিকির সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখবেন না।

ইতি—
বোলতা

পারিজাত বক্সি চিঠিটা ফেরত দিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, বেশ, আপনার যা ইচ্ছা। তিনি তাঁর কাছে থাকা বসাকের দশহাজার টাকা ফেরত দিয়ে দিলেন।

বসাক বলল, চিঠির এ পিটটা দেখেছেন।

পারিজাত বক্সি চিঠিটা হাতে নিলেন।

বাবা ও মা,

টাকাটা দিয়ে দিও, না হলে আমাকে জীবন্ত দেখতে পাবে না।

ইতি—
লালি।

এটা কি আপনার মেয়ের হাতের লেখা?

হ্যাঁ, ওটা লালির লেখা।

অবশ্য এ লেখার কোন দাম নেই লালি চাপে পড়ে এটা লিখেছে।

পারিজাত বক্সি উঠে দাঁড়ালেন।

আপনি তাহলে টাকাটা দিয়ে দেওয়া ঠিক করলেন?

হ্যাঁ, এ ছাড়া আর কোন পথ নেই।

ঠিক আছে, চলি। আমি খুব দুঃখিত মিস্টার বসাক।

আপনার কোন কাজে লাগতে পারলাম না।

পারিজাত বক্সি রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন।

রাস্তার ওপাশের দিকে নজর গেল। আসবার সময় লক্ষ্য করেছিলেন, একটি লোক মোটর সাইকেলের উপর বসে রয়েছে। যাবার সময় দেখলেন লোকটি একইভাবে বসে রয়েছে।

দৃষ্টি বসাকদের বাড়ির ওপর।

পারিজাত বক্সি রাস্তা পার হয়ে লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাবু, দেশলাই আছে?

লোকটি পকেটে হাত দিয়ে দেশলাই বের করে বলল, নাও খাঁ সাহেব।

সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ওপর পারিজাত বক্সির বিরাট ওজনের একটা ঘুসি এসে পড়ল। লোকটা মোটর সাইকেল থেকে ছিটকে রাস্তার ওপর পড়ে গেল।

NOT FOR SALE

পথচারী দু একজন থমকে দাঁড়াল। কয়েকজন ছুটে এল। অনেকেই ভাবল টাকা ধার করার ব্যাপারে কাবলিওয়ালারা বুঝি জুলুম করছে।

কেয়া হুঁয়া, বাবুকে কাহে মারা?

কোন উত্তর না দিয়ে পারিজাত বক্সি নিজের ছদ্মবেশ খুলে ফেললেন, তারপর পকেট থেকে কার্ড বের করে লোকেদের দেখালেন।

একেবারে যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল তাদের বললেন, আপনার দয়া করে একটু সাহায্য করুন।

এ লোকটাকে আমি সার্চ করব।

সার্চ করে লোকটার কাছ থেকে দুটো জিনিস পাওয়া গেল। একটা রিভলভার, অন্যটা পারিজাত বক্সির ছবি।

নিশ্চয় পারিজাত বক্সির ওপর নজর রাখবার জন্য এ ছবিটা একে দেওয়া হয়েছে।

গোলমাল শুনে বসাকও রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল। সে পারিজাত বক্সিকে আস্তে আস্তে বলল, আবার একটা হাঙ্গামা বাধালেন তো? এসব চোট আমার ওপর গিয়ে পড়বে।

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে পারিজাত বক্সি এক ডাক্তারখানা থেকে বালিগঞ্জ থানায় সব ঘটনা বলে ফোন করে দিলেন।

মিনিট পনেরর মধ্যে জীপ এসে দাঁড়াল। ভিতরে ও.সি.। লোকটা তখনও বেহুঁশ। চোয়ালের কাছটা রক্ত জমে নীল হয়ে রয়েছে।

ধরাধরি করে জীপে তোলবার সময় লোকটা যন্ত্রণায় উঃ করে উঠল। কিন্তু চোখ খুলল না।

জীপ একেবারে লালবাজার গিয়ে থামল। নামবার সময় লোকটা চোখ খুলে দেখল। ঘোলাটে দৃষ্টি যেন ঠিক কিছু বুঝতে পারল না।

লক-আপে পুরে লোকটার মুখে চোখে জলের ঝাপটা দেবার পর সে উঠে বসল।

কি, ললিতাকে কোথায় রেখেছ।

লোকটা অবাক হবার ভান করল।

ললিতা সে আবার কে হুজুর? এক কাবুলীওয়ালা মিছামিছি আমাকে ঘুসি মেরেছে, তার নামে কেস করব।

পুলিশ অফিসার পারিজাত বক্সির ছবিটা দেখিয়ে বলল, এটা কার ছবি জান?

লোকটা গদগদ কণ্ঠে বলল, তা আর জানি না, ওটা বিখ্যাত গোয়েন্দা পারিজাত বক্সির ছবি।

NOT FOR SALE

আমি ওঁকে খুব ভক্তি করি হুজুর।

সব সময় ওঁর ছবি কাছে কাছে রাখি।

এটা কার রিভলভার?

আজ্ঞে আমার।

লাইসেন্স আছে।

কি বলছেন, রিভলভার আছে, আর লাইসেন্স থাকবে না।

আমার বাড়িতে চলুন। লাইসেন্স দেখিয়ে দেব।

বাড়ির ঠিকানা কি?

সতেরর বি শিবপ্রসাদ ন্যায়রত্ন লেন। শ্যামবাজার। ঠিকানাটা পুলিশ অফিসার লিখে নিল।

রাত আটটা নাগাদ লালবাজার থেকে পারিজাত বক্সির কাছে ফোন এল।

পারিজাত বক্সি চুপচাপ বসেছিলেন। মনের অবস্থা খুবই খারাপ। এ পর্যন্ত কোন কেসে পরাজয় স্বীকার করতে হয়নি। এমন কি পুলিশের বাঘা বাঘা অফিসাররাও তাঁর কাছে সাহায্য নিয়েছে। কিন্তু বসাক আজ স্পষ্টই বলে দিল, পারিজাত বক্সির সাহায্য নিতে গিয়ে তার ক্ষতিই হয়েছে।

বসাকের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। মেয়ে নিখোঁজ! দেরী করলে যেখানে মেয়েকে হারাবার আশঙ্কা, সেখানে বাপের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

অবশ্য সাধারণের জানবার কথা নয়। এইসব দুর্বৃত্তদের বিরাট জাল পাতা থাকে। দেশের বাইরেও ওদের লোক থাকে। এদের ধরা মোটেই সহজ নয়।

ফোনের কথা শুনে পারিজাত বক্সি আরও হতাশ হলেন। এক ডি. সি. জানালেন খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, যে লোকটিকে পারিজাত বক্সি ঘায়েল করে লালবাজারে এনেছিলেন, তার দেওয়া ঠিকানা ঠিকই। সেখানে তার বড় ছেলে আছে। লোকটা একটা মোটর সারানোর কারখানায় কাজ করে।

তাহলে এখন কি করবেন?

লোকটাকে ছেড়ে দেব। তাকে আটকে রাখার কোন কারণ থাকতে পারে না।

একটু ভেবে নিয়ে পারিজাত বক্সি জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটাকে কখন ছাড়বেন?

খাতাপত্র ঠিক করতে ঘন্টা খানেক সময় লাগবে।

আশা করছি নটার সময় ছেড়ে দিতে পারব।

ঠিক আছে।

ফোন ছেড়ে দিয়ে পারিজাত বক্সি কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। আর একটা দুঃসংবাদ।

NOT FOR SALE

লোকটা ছাড়া পেয়ে তাঁর উপর কেসও করতে পারে। অহেতুক মারার জন্য।

হঠাৎ পারিজাত বক্সি একহাত দিয়ে মাথার চুল মুঠো করে ধরলেন। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবেন।

মিনিট পনের পর পারিজাত বক্সি ট্যাক্সিতে উঠলেন, তখন তাঁকে চেনা দায়। পরনে স্পোর্টিং গেঞ্জি, হাফ প্যান্ট, টকটকে লাল। বিদেশী কোন টুরিষ্ট। যেন রাতের কলকাতা দেখতে বেরিয়েছেন।

ট্যাক্সিতে উঠেই তিনি ড্রাইভারের হাতে দুটো দশ টাকার নোট তুলে দিয়ে বললেন, চল লালবাজার!

লালবাজারে ঢুকলেন না। বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। মিনিট কুড়ি পরেই মোটর সাইকেলের শব্দ শোনা গেল, লোকটা মোটর সাইকেলে বেরিয়ে গেল।—

পারিজাত বক্সি সামনে ঝুঁকে পড়ে ড্রাইভারকে বললেন।

এই মোটর সাইকেলকে ফলো কর।

ট্যাক্সি মোটর সাইকেলের পিছনে ছুটল।

মোটর সাইকেল সোজা বেলেঘাটার দিকে গেল।

আলোছায়া সিনেমার পাশ দিয়ে ঘুরে নজরুল এভিনিউ ধরল। সল্টলেক পার হয়ে লেকটাউনের কাছে একটা বাড়ির সামনে নামল।

পারিজাত বক্সির নির্দেশে ট্যাক্সিটা একটু দূরে থামল।

পারিজাত বক্সি আর একটা দশ টাকার নোট ড্রাইভারের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, আপনি গাড়িটা রাস্তা থেকে সরিয়ে ঢালু জমিতে রাখুন। আমি এখনই আসছি।

সায়েবের মুখে পরিস্কার বাংলা শুনে ড্রাইভার অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর সাহেবের কাণ্ডকারখানা সে কিছু বুঝতে পারছিল না।

কিন্তু টাকা যখন হাতে আসছে, তখন চুপচাপ থাকাই ভাল।

দুতলা বাড়ি। ওপরের ঘরে কমজোর একটা বাতি জ্বলছে। চারিদিকে নীচু পাঁচিল।

লোকটা গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকল।

পারিজাত বক্সি পাশের পাঁচিল ডিঙিয়ে বাগানে লাফিয়ে পড়লেন। ওপরে ওঠার একমাত্র পথ জলের পাইপ। তিনি পাইপ বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করলেন। খুব অসুবিধা হল না। দুতলার কাচের জানলা বন্ধ। বাইরে চোখ রেখে ভিতরের সবই দেখা গেল। একটা চেয়ারে কালো মতন লোক বসে। লোকটাকে পারিজাত বক্সি আগেই দেখেছিলেন কুর্মিটোলায়। তার

NOT FOR SALE

সামনে মোটর সাইকেলের লোকটা দাঁড়িয়ে। এদিকে নজর পড়তেই পারিজাত বক্সি চমকে উঠলেন।

ছোট একটা খাট। তার উপর একটি মেয়ে শুয়ে। মেয়েটির মুখ বাঁধা। দেখে মনে হল মেয়েটি ঘুমাচ্ছে।

এমন তো হতে পারে, মেয়েটিকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।

কালো লোকটি বলল, টিকটিকি ব্যাটা আমার তাইলে পিছনে লেগেছে। পানিওয়ালাটাকে ঘায়েল করে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে। এবার কড়া দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। তোমাকে কেউ ফলো করেনি তো? বোধহয় না, লোকটা বলল।

কয়েকটা গাড়ি ট্যাক্সি লক্ষ্য করলাম। তারা বোধহয় দমদম এয়ারপোর্টে যাচ্ছে।

তুমি দিনকতক কলকাতার বাইরে গা ঢাকা দিয়ে থাক। আমি এদিকের ব্যবস্থা করছি।

এই পর্যন্ত শুনেই পারিজাত বক্সি পাইপ বেয়ে নামতে শুরু করলেন। এমন সুযোগ জীবনে বার বার আসে না। পুলিশের সাহায্য নিয়ে আজকেই কিছু একটা করে ফেলতে হবে।

একেবারে মাটির কাছে এসে পারিজাত বক্সির পাটা পিছলে গেল। তিনি পড়ে গেলেন।

ঘাসের ওপর পড়ার জন্য আঘাত লাগেনি, শুধু ধুপ করে একটা শব্দ হল।

পারিজাত বক্সি উঁকি মেরে পাঁচিল পার হয়ে ট্যাক্সির দিকে এগোলেন।

ট্যাক্সিতে ঢুকেই বললেন, তাড়াতাড়ি চলুন। লেকটাউন পুলিশ ষ্টেশন। আধ ঘন্টার একটু কম সময়ের মধ্যে ফিরে এলেন। সঙ্গে ও-সি আর দুজন পুলিশ।

মোটর সাইকেল নেই। দরজায় বিরাট তালা।

তালা ভেঙ্গে ভিতরে ঢোকা হল।

বাড়ি খালি। পাখি উড়ে গেছে। খাটটা এক কোনে রাখা ও. সি. জিজ্ঞাসা করলেন, মিষ্টার বক্সি আপনি দেখেছিলেন তো?

পারিজাত বক্সি কোন উত্তর না দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন।

প্রায় উল্টো দিকে একটা বস্তি। রাস্তার আলোর তলায় মাদুর বিছিয়ে চারজন লোক তাস খেলছে।

পুলিশ নিয়ে পারিজাত বক্সি গিয়ে দাঁড়াতেই লোকগুলো বিব্রত হয়ে উঠে দাঁড়াল। একজন বলল, বিশ্বাস করুন স্যার, আমরা পয়সা দিয়ে খেলছি না।

NOT FOR SALE

এমনই খেলছি। সে কথায় কান না দিয়ে পারিজাত বক্সি জিজ্ঞাসা করলেন, এখান দিয়ে কোন মোটর সাইকেল যেতে দেখেছেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটু আগে গেল। দুটি লোক মাঝখানে একটা বাচ্চা। এই জন্যই এ্যকসিডেন্ট হয় স্যার।

এত লোক একসঙ্গে চাপবে।

কোনদিকে গেছে?

কলকাতার দিকে।

পারিজাত বক্সি সরে এলেন। তাঁর একটা মাত্র সান্ত্বনা, ও. সি. বিশ্বাস করবে এ বাড়িতে লোক ছিল! তিনি ভুল দেখেন নি।

ও. সি. আর দুজন পুলিশকে লেক টাউন থানায় নামিয়ে পারিজাত বক্সি আবার লালবাজারে ডি. সি.র সঙ্গে সব ব্যাপারটা আলোচনা করে একজন ও. সি. কে সঙ্গে নিয়ে, শিব প্রসাদ ন্যায়রত্ন লেনে এসে উপস্থিত হলেন।

এখানেও এক ব্যবস্থা। দরজায় বিরাট তালা।

পাশের বাড়ির লোকেরা বলল, মহিমবাবুরা বম্বে চলে গেছেন। কিসে গেছেন, কবে ফিরবেন, কিছুই তাদের জানা নেই।

পারিজাত বক্সি জানতে চাইলেন, বাড়িওয়ালা কোথায় থাকেন? উত্তর পেলেন, দেওঘরে।

মাসে মাসে ভাড়া আদায় করতে একজন আসেন।

অগত্যা পারিজাত বক্সিকে চলে আসতে হল।

তাঁর আক্ষেপের শেষ নেই। পাখী বার বার মুঠোর মধ্যে এসেও পালিয়ে যাচ্ছে।

পুলিশের কাছে মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে।

পারিজাত বক্সি ট্যাক্সিতে বাড়ির কাছ বরাবর এসেই অবাক হলেন। তাঁর বাড়ির সামনে প্রচুর লোকের ভিড়।

ট্যাক্সি থেকে নেমে পারিজাত বক্সি এগিয়ে গেলেন।

তাঁকে দেখে সবাই ঘিরে ধরল।

এই যে মিষ্টার বক্সি আপনি বাইরে ছিলেন!

খুব ফাঁড়া গিয়েছে, ওই দেখুন আপনার বাড়ির ব্যবস্থা। পারিজাত বক্সি মুখ তুলে দেখলেন।

বারান্দার কিছুটা অংশ উড়ে গেছে। বসবার ঘরের একটা জানলা ভেঙে ঝুলে রয়েছে।

কেউ রাস্তা থেকে খুব শক্তিশালী বোমা ছুঁড়েছে।

সিঁড়ির কাছেই বাহাদুরের সঙ্গে দেখা হল।

NOT FOR SALE

সে বেচারির মুখ শুকনো। ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে।

এটা কখন হল?

আধ ঘন্টা আগে। আমি রসুই ঘরে ছিলাম, কি আওয়াজ, সমস্ত বাড়িটা কেঁপে উঠল।

বারান্দা ভেঙে পড়েছে।

পারিজাত বক্সি পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে ভাবতে লাগলেন, প্রতিপক্ষ খুব দুর্দান্ত। তাঁকে খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

ফোনটার কোন ক্ষতি হয়নি। সেটা ভিতরের ঘরে ছিল। ফোন তুলে থানার সঙ্গে যোগাযোগ করতেই খবর পেলেন, ও. সি. খবর পেয়ে গেছে। এদিকেই আসছে। একটু পরেই অফিসার এল। সব দেখে ভ্রূ কোঁচকালো। বলল, আপনার বাড়িতে একদল পুলিশ পোষ্ট করে দিচ্ছি। আমার মনে হয় বদমায়েশগুলো আবার চেষ্টা করবে। আপনি সাবধানে থাকবেন।

পুলিশ অফিসার বলে যাবার পর পারিজাত বক্সি গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।

বাড়িতে থাকা নিরাপদ নয়। দীর্ঘদিন পুলিশের থাকা সম্ভব হবে না। তাছাড়া কেউ যদি মোটর থেকে বোমা ছুঁড়ে খুব জোড়ে বেরিয়ে যায়, পুলিশ তার কি করতে পারে অনেক ভেবে পারিজাত বক্সি পার্ক স্ট্রীটের এলাকার এক হোটেলে ফোন করে একটা ঘর ঠিক করল।

আজ রাত থেকেই।

বাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে পিছনের রাস্তা দিয়ে পারিজাত বক্সি মোটরে বেরিয়ে পড়লেন।

হোটেলের সামনে পৌঁছে বাহাদুরকে বিদায় দিলেন। বললেন, তুমি দেশে চলে যাও বাহাদুর। তোমার দেশের ঠিকানা আমার জানা। যখন দরকার হবে চিঠি দেব। চলে এস।

বাহাদুর সেলাম করে চলে গেল।

পারিজাত বক্সি হোটেলের খাতায় নাম লিখলেন, অলক ঘোষাল। ব্যবসার জন্যে এসেছেন।

বাড়ি থেকেই তিনি চেহারা পাল্টে এসেছিলেন। ঝোলা গোঁফ, গালভর্তি জুলপি, নাকের পাশে বড় লাল রঙের আঁচিল।

বাহাদুর বিস্মিত হয়নি। কারণ পারিজাত বক্সির নানারকম ছদ্মবেশ দেখতে সে অভ্যস্ত।

দু'দিন পারিজাত বক্সি হোটেল থেকে বের হলেন না। চুপচাপ বিছানায় শুয়ে রইলেন। শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে লাগলেন ভবিষ্যতে কি করবেন।

NOT FOR SALE

কোন পথ নেবেন।

পরাজয় স্বীকার করতে তিনি রাজী নন। বসাক যদি তাঁর সাহায্য নাও চায় তাহলেও তিনি ললিতার হরণকারীদের ধরবার চেষ্টা করবেন।

এটা তাঁর সামাজিক কর্তব্য।

একবার শুধু ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুকে ফোন করে তাঁর বাড়িটা মেরামত করবার নির্দেশ দিলেন। দুদিন পরে পারিজাত বক্সি লালবাজারে গিয়ে হাজির। নিজের গাড়িতে নয়, ট্যাক্সিতে।

একজন চেনা ও. সি.কে বললেন তোমাদের একটা এ্যালবাম আছে না যারা ছেলে-মেয়ে চুরি করে তাদের ফটো থাকে তাতে।

হ্যাঁ আছে।—কি ব্যাপার মিস্টার বক্সি।

বিশেষ কিছু নয়। মহাপুরুষদের চেহারাগুলো একবার দেখে রাখব। কি জানি, কখন কার সঙ্গে মোলাকাত হয়ে যায়।

এ্যালবাম নিয়ে আসা হল।

গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে পারিজাত বক্সি একটা ফটোর ওপর ঝুঁকে পড়লেন।

সেই কালো মোটা লোকটাকে বার দুয়েক দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে। তলায় নাম দেখলেন ঘনশ্যাম দাস।

ইনি এখন কোথায়?

ও. সি. একবার উঁকি দিয়ে দেখে বললেন, ইনি বোধহয় ভারতের বাইরে। বছর কয়েক আগে ছেলে চুরির ব্যাপারে ধরা পড়ে বছর তিনেক জেল খেটে ছিলেন, আমাদের খবর ইনি এখন হংকং কিংবা সিঙ্গাপুরে।

পারিজাত বক্সি আর কিছু বললেন না। এ্যালবাম ফেরত দিয়ে বেরিয়ে এলেন। লোকটার নাম তাহলে ঘনশ্যাম দাস। অবশ্য এসব মহাপুরুষের অনেক নাম থাকে। এক একবার ধরা পড়লে এক একটা নাম বলে। পারিজাত বক্সির কোন সন্দেহ নেই এই লোকটাকেই তিনি দেখেছিলেন। অপরাধ করে ধরা না পড়লে পুলিশের নজরে আসে না। কি আশ্চর্য্য দিন সাতেক পরেই দেখা হয়ে গেল। রাত্রে ডিনার খেয়ে পারিজাত বক্সি বেরিয়ে আসছেন, হঠাৎ দেখলেন কোনের একটা টেবিলে ঘনশ্যাম দাস। কোটে একটা লাল গোলাপ। ঘনশ্যাম কি তাঁরই খোঁজে এই হোটেলে এসেছেন, সন্দেহ করেছে পারিজাত বক্সি এখানেই আছেন।

পারিজাত বক্সি দুঃসাহসিক কাজ করলেন। সোজা ঘনশ্যামের সামনে গিয়ে বললেন মাপ করবেন ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। কটা বেজেছে বলতে পারেন।

NOT FOR SALE

পারিজাত বক্সি ইংরাজিতে প্রশ্ন করছিলেন, ঘনশ্যাম উত্তর দিল বাংলায়। নটা বেজে দশ।

ধন্যবাদ।

পারিজাত বক্সি বেরিয়ে এলেন, নিজের রুমে ফিরলেন না। বেতের একটা চেয়ার পেতে লনের ওপর বসলেন।

মিনিট দশেক পরেই ঘনশ্যাম বের হল। একলা নয় সঙ্গে একজন চীনা ভদ্রলোক।

পায়ে পায়ে পারিজাত বক্সি এগিয়ে গেলেন। দুজনে সবুজ একটা গাড়িতে উঠে চলে গেল।

পারিজাত বক্সি একবার ভাবলেন ট্যাক্সি নিয়ে অনুসরণ করবেন, কিন্তু পরে বুঝতে পারলেন তাতে কোন ফল হবে না। নতুন করে বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে ইচ্ছা হল না। এবার ধরা পড়লে ঘনশ্যামের দলের হাতে তাঁর প্রাণ যাবার সম্ভাবনা।

তবে এক ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হলেন ঘনশ্যাম তাঁর জন্যে হোটেলে আসেনি। নিজের কোন কাজে এসেছিল। এ সব লোকের অনেক রকমের কাজ থাকে।

নিজের রুমে ফিরে গিয়ে পারিজাত বক্সি একটা বই নিয়ে বসলেন, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পেলেন বইতে একদম মন নেই। ললিতার কথাটা মনে হল। মেয়েটাকে ভিন্ন কোন প্রদেশে চালান করে দেয়নি তো? অনেক সময় পুলিশ পিছনে লাগলে তাই করে।

তবে এ ক্ষেত্রে তা নাও করতে পারে। বসাকের টাকা আছে সে খোঁজ এরা পেয়েছে। সেই জন্যেই দশ হাজার টাকা বাড়িয়ে বিশ হাজার টাকা করেছে। অনেক সময় এ রকমও হয়েছে টাকাটা নিয়েছে কিন্তু ছেলে মেয়ে ফিরত দেয় নি। সে সব সাধারণত ছিচকে চোরের দল করে। খানদানিরা কথার খেলাপ করে না।

বসাক তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করছে না। করলে হয়তো কিছু একটা উপায় বের করা যেত। বই রেখে পারিজাত বক্সি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। পুরনো বাড়িতে আর কোন উৎপাত হয় নি। হলে তার ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু নিশ্চয় জানাত। তার মানে ঘনশ্যামের দল বুঝতে পেরেছে তিনি আর ও ঠিকানায় নেই।

রাস্তার দিকে দেখতে দেখতে পারিজাত বক্সি চমকে উঠলেন। সেই সবুজ গাড়িটা এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে চীনা ভদ্রলোক নেমে দাঁড়াল। ভিতর থেকে ঘনশ্যাম তার পিঠে হাত রেখে কী যেন বলল। গাড়ি চলে গেল।

NOT FOR SALE

পারিজাত বক্সি তাড়াতাড়ি রুমের দরজা বন্ধ করে নেমে এলেন। লিফট নিচে আসতেই দেখলেন, চীনা ভদ্রলোক লিফটের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। পারিজাত বক্সি লিফট থেকে নামলেন না। চীনা ভদ্রলোক উঠতে বললেন, আপনি কোন তলায় যাবেন।

তিন তলা।

স্বয়ংক্রিয় লিফ্‌ট, লিফটম্যান নেই। নিজেদেরই চালাতে হয়।

পারিজাত বক্সি বোতাম টিপলেন। লিফট উপরে উঠল।

পারিজাত বক্সি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কাছে আমার একটু দরকার আছে?

কি দরকার বলুন?

যদি আপনার রুমে যাবার অনুমতি দেন, সেখানেই বলব।

চীনা ভদ্রলোক পারিজাত বক্সিকে আপাদমস্তক আড়চোখে দেখল, তারপর বলল আসুন।

পারিজাত বক্সির রুমও তিন তলায়, তবে সামনের দিকে। নম্বর তেত্রিশ। চীনা ভদ্রলোকের রুম পিছন দিকে। নম্বর একচল্লিশ। বিশেষ জিনিসপত্র নেই। দুটো ফোমের সুটকেশ। গোটা তিনেক হ্যাণ্ড ব্যাগ।

পারিজাত বক্সি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে সারা ঘরটা দেখে নিলেন।

কি আপনার কথা বলুন মিস্টার।—

আমি ঘোষাল। অলক ঘোষাল।

বলুন, কি আপনার কথা মিস্টার ঘোষাল।

পারিজাত বক্সি বললেন, আমি একজন ছোটখাটো ব্যবসায়ী। একটা ট্রেড ডেলিগেশনের সঙ্গে সামনের মাসে চায়না যাবার কথা। এর আগে আর আমার চায়না যাবার সৌভাগ্য হয়নি। তাই যাবার আগে সে দেশ সম্বন্ধে একটু জানতে চাই।

পারিজাত বক্সির কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চীনা ভদ্রলোক খুব জোরে হেসে উঠল। হাসি থামতে বলল, আমি আপনাকে চায়না সম্বন্ধে বলব কি মিস্টার ঘোষাল। আমি নিজেই সে দেশে কোনদিন যাই নি। আমার কলিকাতায় জন্ম। আজকাল কোচিনে থাকি। চামড়ার ব্যবসা, সেই সূত্রেই মাঝে মাঝে এখানে আসতে হয়।

পারিজাত বক্সি মুখের একটা অপ্রস্তুত ভাব করে দাঁড়িয়ে রইলেন। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। আমাকে মাপ করবেন। চীনা ভদ্রলোকও উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলল, আপনার লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ নেই মিস্টার ঘোষাল। আমি আপনাকে সাহায্য করতে না পারার জন্য

NOT FOR SALE

লজ্জিত। এরপর পারিজাত বক্সির বেরিয়ে আসা ছাড়া আর পথ ছিল না। তিনি বের হয়ে পড়লেন।

চীনা ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করে দিল।

এগোতে গিয়েও পারিজাত বক্সি দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভিতর থেকে হাসির শব্দ ভেসে এল। চীনা ভদ্রলোক খুব জোরে হাসছে। হঠাৎ হাসির কি এত কারণ ঘটল। একটু দাঁড়িয়ে থেকে পারিজাত বক্সি নিজের রুমে ফিরে এলেন।

চীনা ভদ্রলোকের নামটা জানা হল না। সে অবশ্য হোটেলের ম্যানেজারের কাছ থেকে জানা যায়, কিন্তু জেনেই বা কি লাভ। হোটেলের খাতায় তিনি যেমন অলক ঘোষাল, তেমনই লোকটার একটা ছদ্মনামই থাকবে। আর কি করা যায়।

লোকটার অনুপস্থিতিতে পুলিশের সাহায্য নিয়ে তার রুম সার্চ করা যায়। যদি কিছু না পাওয়া যায়, তাহলে পারিজাত বক্সির ছদ্মবেশও খুলে পড়বে।

ঘনশ্যামের দল তাকে চিনে ফেলবে।

যদি আফিং কিংবা নিষিদ্ধ কোন জিনিষ পাওয়া যায়, তাহলেই বা তাঁর কি? এ সব পুলিশের কাজ। তাঁর নয়। এসব ধরবার জন্য কেউ তাকে নিয়োগ করেনি। তবু লোকটাকে চোখে চোখে রাখা ভাল। ঘনশ্যামের সঙ্গে তার কিসের এত অন্তরঙ্গতা।

পরের দিন সকালে চীনা ভদ্রলোকের সঙ্গে তার আবার দেখা হয়ে গেল। চায়ের কাপ সঙ্গে নিয়ে লোকটা বসে আছে।

মনে হল কারও জন্য অপেক্ষা করছে।

পাশ কাটাতে গিয়ে পারিজাত বক্সি ধরা পড়ে গেলেন।

আসুন, মিষ্টার ঘোষাল, কোথাও বের হচ্ছেন নাকি?

হ্যাঁ, চা খেয়ে একটু বের হব ভাবছি।

এই টেবিলেই বসুন।

অগত্যা পারিজাত বক্সিকে বসতে হল।

সকাল আর বিকালের চা অনেকেই নিজের নিজের রুমে খায়। সেইজন্য ডাইনিং রুমে ভিড় নেই।

পারিজাত বক্সির চা আসতে চীনা ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করল আপনি কবে নাগাদ চায়না যাবেন?

এখনও দিন ঠিক হয়নি। সামনের মাসের শেষ সপ্তাহে।

কাল আপনি চলে যাবার পরই আমার মনে পড়ে গেল। এখানে আমার পরিচিত একটি চীনা ভদ্রলোক আছেন তিনি বছরে বার তিনেক যান।

NOT FOR SALE

তাঁর কাছে আপনি ওদেশ সম্বন্ধে সব জানতে পারবেন।

পারিজাত বক্সি কৃতার্থ হবার ভান করলেন।

তাহলে খুব ভালই হয়। সরকারি রাস্তায় দেশটার সব খবর ঠিক পাওয়া যায় না। নিয়ম মাফিক ভাবে যেটুকু দেখানো প্রয়োজন, সেটুকুই দেখাবে। সব ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করার সুযোগই হয়তো দেবে না।

তা ঠিক।

আপনি কত নম্বর রুমে আছেন?

তেত্রিশ।

ঠিক আছে, ভদ্রলোক এলে আপনার কাছে খবর দেব। চীনা ভদ্রলোক আরও কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ গেটের কাছে মোটরের হর্ন বাজতেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

চলি, আমাকে একটু বের হতে হবে।

পারিজাত বক্সি উঁকি দিয়ে দেখলেন, গেটের কাছে সেই সবুজ গাড়ি, ভিতরে কেউ নেই, শুধু ড্রাইভার বসে।

চীনা ভদ্রলোক উঠতেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

বসে বসে পারিজাত বক্সি ভাবতে লাগলেন, তিনি যেমন লোকটিকে সন্দেহ করছেন, লোকটিও হয়তো তাঁর সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করছে। কায়দা করে তাঁর রুমের নম্বরও জেনে নিল।

ছদ্মবেশে তাঁকে পারিজাত বক্সি হিসাবে হয়তো চিনতে পারেনি। কিন্তু পুলিশের কোন চর ভাবা অস্বাভাবিক নয়।

চীনা ভদ্রলোক কিছু করার আগে তাঁরই কাজ শুরু করা উচিত। কিন্তু কি ভাবে?

পারিজাত বক্সি লালবাজারে গিয়ে যে ও-সি এ্যালবাম দেখিয়েছিল, তার সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, আপনাদের ঘনশ্যাম দাস কিন্তু এ শহরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তাই নাকি?

আমি বার দুয়েক দেখেছি। এ ব্যাপারে কিছু করা যায় না?

কি করা যেতে পারে বলুন? আইনের ব্যাপার আপনাকে আর কি বোঝাব, মিঃ বক্সি।

কেউ কোন অপরাধ না করা পর্যন্ত আমরা তাকে ছুঁতে পারি না। তবে আপনি যদি চান, লোকটাকে চোখে চোখে রাখতে পারি।

পারিজাত বক্সি অন্য কথা পাড়লেন।

একটা রুম যদি সার্চ করার প্রয়োজন হয়, করবেন?

NOT FOR SALE

অযথা সার্চ করার অসুবিধা আছে, তবে এটা চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

ঠিক আছে। প্রয়োজন হ'লে জানাব।

পারিজাত বক্সি উঠে পড়লেন।

কোন দিকেই বিশেষ সুবিধা করতে পারছেন না।

এর চেয়ে অনেক জটিল কেসের সমাধান করেছেন, কিন্তু এ কেসের আসামী হাতের কাছে এসেও পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে।

পরের দিন চায়ের টেবিলে আবার দেখা হয়ে গেল।

পারিজাত বক্সি জিজ্ঞাসা করলেন, আজ দুপুরে আপনার কোন কাজ আছে?

চীনা ভদ্রলোক বলল, কেন বলুন তো?

আমার সঙ্গে যদি লাঞ্চ খান, খুব খুশী হব।

মাপ করবেন মিষ্টার ঘোষাল, আজ আমার ফিরতে রাত হয়ে যাবে। লাঞ্চ আর ডিনার দুই-ই আমি বাইরে খেয়ে নেব। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমরা দুজনেই তো এখানে আছি এখন।

পরে একদিন আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা যাবে।

পারিজাত বক্সি আর কিছু বললেন না।

দুপুরবেলা হোটেল নিস্তব্ধ। সবাই যে যার কাজে বেরিয়ে গেছে। হোটেলের পরিচারকও বিশ্রাম নিচ্ছে।

পারিজাত বক্সি নিজের রুম থেকে বেরিয়ে এলেন।

দুহাতে দস্তানা। খুব সন্তর্পণে এগিয়ে একচল্লিশ নম্বর রুমের সামনে দাঁড়ালেন।

এদিক ওদিক দেখে পকেট থেকে মাষ্টার কী বের করে দরজা খুলে ফেললেন।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন।

ফোমের সুটকেশ দুটো খোলা। সাবধানে পারিজাত বক্সি দেখলেন, জামা কাপড় ছাড়া কিছু নেই। হ্যাণ্ড ব্যাগে কয়েকটা টান করা চামড়া। টেবিলের ওপর ছোট একটা ডাইরি। পাতাগুলি খালি। কিছুই লেখা হয়নি। সব কষ্ট বৃথা হ'ল।

পারিজাত বক্সি আবার পাতাগুলো ওল্টালেন।

একটা পাতায় শুধু একটা লেখা।

পনেরই এপ্রিল।

এ তারিখের তাৎপর্য পারিজাত বক্সি ঠিক বুঝতে পারলেন না।

NOT FOR SALE

সম্ভবত এই তারিখ চীনা ভদ্রলোকের কোন ব্যবসার ব্যাপারে দেখা করার কথা।

হতাশ মনে পারিজাত বক্সি দরজা বন্ধ করে, নিজের রুমে ফিরে এলেন।

বিছানার ওপর টান হয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন, তিনি কি ভুল পথে চলেছেন? চীনা ভদ্রলোক হয়তো প্রকৃতই চামড়ার ব্যবসায়ী।

যাকে তিনি ঘনশ্যাম দাস ভাবছেন, সে হয়তো অন্যলোক। তবে লোক চেনার ব্যাপারে পারিজাত বক্সির ভুল তো বিশেষ হয় না।

হঠাৎ পারিজাত বক্সি বিছানার ওপর উঠে বসলেন। তারিখটা পনেরই এপ্রিল। নিছক একটা যোগাযোগ। না গভীর কিছু আছে।

বসাকের কাছে যে চিঠি এসেছিল তাতে লেখা ছিল পরের তারিখে চিড়িয়াখানার সাদা বাঘের খাঁচার সামনে টাকাটা রেখে দেবার জন্য।

পরের তারিখ মানে পনেরই এপ্রিল।

ঠিক আর এক সপ্তাহ পরে।

পারিজাত বক্সি ঠিক করলেন একবার শেষ চেষ্টা করবেন। বসাক যদি সহযোগিতা না করে তাহলেও।

দুদিন পরে আবার সেই চীনা ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা।

এবার আর সবুজ গাড়ি নয়। হোটেলের বেয়ারা একটা ট্যাক্সি ডেকে এনেছিল। লোকটি তাতেই উঠছিল।

পারিজাত বক্সি ফিরছিলেন লালবাজার থেকে।

তাঁকে দেখে চীনা ভদ্রলোক বলল, আমি খুব দুঃখিত মিঃ ঘোষাল। আমার সেই বন্ধুটি শহরে নেই। কবে আসবে তাও জানি না। তাই আপনার কাছে আনতে পারছি না।

পারিজাত বক্সি হাসলেন, আপনি কি করবেন?

আমারই বরাত মন্দ। দুপুরবেলা চললেন কোথায়?

চীনা ভদ্রলোক বিরক্ত কণ্ঠে বলল, আপনি তো নিজে ব্যবসায়ী। বুঝতেই পারেন আমাদের সময় অসময় নেই। যখনই দরকার দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। আপনার মতন সৎ বন্ধু লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করেছেন। সময়ের অভাবে সে নিমন্ত্রণ পর্যন্ত রাখতে পারছি না। আচ্ছা চলি, আবার দেখা হবে।

ট্যাক্সি চলে যাবার পর পারিজাত বক্সি অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

সৎ বন্ধু কথাটা কি লোকটা ঠাট্টা করে বলল। চীনাদের মুখ মুখোশের মতন, মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই।

NOT FOR SALE

পারিজাত বক্সিকে নিশ্চয় সন্দেহ করছে না। তার অনুপস্থিতিতে পারিজাত বক্সি যে তার রুম সার্চ করেছে, সেটা বোধহয় বুঝতে পারেনি। এত কাঁচা কাজ তিনি করেন না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পারিজাত বক্সির মনে হল, আর একটা ট্যাক্সি নিয়ে চীনে ভদ্রলোককে ফলো করলে হয়তো নতুন কিছু জানা যেত।

কিন্তু ঝুঁকি নিতে পারিজাত বক্সির সাহস হ'ল না। পনেরই এপ্রিলের আগে নতুন কোন বিপদে জড়িয়ে পড়া সমীচীন না।

লালবাজারে আজ সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছে।

পুলিশ থেকে সব রকম সাহায্য পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন। ললিতার নিখোঁজ হবার ঘটনা পুলিশের পক্ষেও একটা কলঙ্ক হয়ে রয়েছে। তার ওপর প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই শহরে একটা দুটো ছেলে মেয়ে চুরি যাবার রিপোর্ট আসছে। এক বা একাধিক দল কাজ করছে। তাদের ধরতে না পারলে পুলিশেরও শান্তি নেই। চৌদ্দই এপ্রিল ভোরবেলা পারিজাত বক্সি একচল্লিশ নম্বর রুমের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

অনেকবার বেল টেপার পরেও কোন সাড়া পেলেন না। সেখান দিয়ে একটা বেয়ারা আসছিল। সে থেমে পড়ে বলল, সাব কাল রাত্রে হোটেলে ফেরেননি।

পারিজাত বক্সি নিজের রুমে ফিরে এলেন। কি ব্যাপার পনেরই এপ্রিলের আগে থেকেই চীনা ভদ্রলোক হোটেলে ফিরল না। এর সঙ্গে ললিতার ব্যাপারের কি কোন যোগাযোগ আছে।

জোর করে কিছু বলা যাচ্ছে না। সামান্য একটু সন্দেহ কিন্তু তার উপর নির্ভর করেই পারিজাত বক্সিকে এগোতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

* * *

পনেরই এপ্রিল।

পারিজাত বক্সি ভোরের দিকে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ঠিক দুপুর বেলা। গরমও বেশ পড়েছে। চিড়িয়াখানা প্রায় খালি। এমন কি পাখিগুলো নিঝুম হয়ে বসে রয়েছে। জন্তুরা ক্লান্ত হয়ে ঝিমাচ্ছে।

সাদা বাঘের খাঁচার পাশে কামিনী ঝাড়ের পিছনে গোটাতিনেক দেহাতি লোক। দুজন পুরুষ, একজন স্ত্রীলোক।

চিড়িয়াখানা ঘুরে পরিশ্রান্ত হয়ে তারা গোল হয়ে বসেছে। সামনে একটা কাগজে ছাতু মাখা। পাশে একটা লোক। খেতে খেতে নিজেদের ভিতর গল্পগুজব করছে।

NOT FOR SALE

হঠাৎ দেখা গেল বসাক আর রমা এসে দাঁড়াল।

বসাকের কাঁধে কাপড়ের ঝোলা।

বসাক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখল। কামিনী ঝাড়ের জন্যে দেহাতিদের দেখা গেল না।

বসাক ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে আবার চারিদিক দেখল। তারপর ব্যাগ থেকে খাকি রংয়ের একটা প্যাকেট বের করে সাদা বাঘের খাঁচার সামনে একটা গাছের গোড়ায় রেখে দিয়ে রমাকে সঙ্গে নিয়ে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল। মিনিট দশ পনের, তার বেশী নয়, বাঁ দিক থেকে একটি লোক এসে দাঁড়াল। পরনে এই গরমেও লম্বা কোট, পাজামা, মাথায় মুসলমানি টুপি। কাঁচা পাকা দাড়ি। লোকটা মুখ তুলে চারপাশ দেখল, তারপর পকেট থেকে খাতা পেন্সিল বের করে খাঁচার কাছে এগিয়ে গিয়ে কি সব লিখল। লেখা শেষ হতে লোকটা ঘাসের উপর বসল বসাকের রেখে যাওয়া প্যাকেটটা ঘেঁষে। দেহাতিরা উঠে পড়ল। গেট পার হয়ে রাস্তায় এসে একটা ট্যাক্সির মধ্যে ঢুকল।

তারপর অপেক্ষা। নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল বটে, কিন্তু চোখ রাখল গেটের দিকে।

প্রায় আধঘণ্টা পর মুসলমান ভদ্রলোকটি বের হ'ল। রাস্তার পাশে একটা স্কুটার দাঁড় করানো ছিল। সেটার ওপর বসে স্টার্ট দিল।

স্কুটার চলার সঙ্গে সঙ্গে মোটরও চলতে শুরু করল। তবে বেশ একটু ব্যবধান রেখে।

স্কুটার খিদিরপুরের দিকে বাঁক নিল। মোটরও।

বিরাট টিনের বস্তি। এখানে ওখানে দল দল মুরগী চরছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দৌড়াদৌড়ি করছে। স্কুটার বস্তির মধ্যে ঢুকে গেল।

মোটরটা অল্প দূরে থামল। একজন দেহাতি মোটর থেকে নেমে দাঁড়াতেই মোটর তীরবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল। স্কুটারটা উঠানে রেখে লোকটা দরজার শিকল ধরে নাড়ল।

ভিতর থেকে গম্ভীর গলায় আওয়াজ হ'ল, খোলা আছে। চলে এস।

মুসলমান ভদ্রলোকটি ভিতরে ঢুকে গেল।

ততক্ষণে দেহাতি লোকটা বস্তির পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কোথাও একটা জানালা নেই। টিনের ফাঁক আছে দু-এক জায়গায়।

দেহাতি সেই ফাঁকে চোখ রাখল।

প্রথমে কিছু দেখতে পেল না। তারপর একটু একটু করে চোখ অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে টেবিলের ওপর একটা টর্চ আড়াআড়ি ভাবে

NOT FOR SALE

রাখা। তারই ক্ষীণ আলোয় দেখা গেল দুজন লোক খাটিয়ার ওপর বসে নোটের তাড়া গুনছে। দেহাতি আস্তে আস্তে সামনের দিকে এসে দাঁড়াল। রাস্তার দিকে দেখল। রাস্তার ওপর একটা মোটর, তার পিছনে একটা স্টেশন ওয়াগন।

স্টেশন ওয়াগন থেকে জনা পনের বন্দুক হাতে পুলিশ নামল। বস্তির অন্যলোকেরা ভিড় করে এসে দাঁড়াল।

পুলিশ ঘিরে ফেলল বস্তি।

দরজার সামনে দাঁড়াল দেহাতি, তার ছদ্মবেশ খুলে ফেলতেই পারিজাত বক্সিকে চেনা গেল। তিনি দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে বললেন, দরজা খোল, না হলে আমরা দরজা ভেঙে ঢুকব।

কোন শব্দ নেই। সব চুপচাপ।

হঠাৎ রিভলবারের আওয়াজ। পিছনের দিকে চেঁচামেচি। পারিজাত বক্সি পিছনের দিকে ছুটে গেলেন। পিছনের দিকে কয়েকটা টিন আলগা। সেই টিন খুলে ভিতরের দুটো লোক বেরিয়ে পড়েছিল। দুজন পুলিশ তাদের জাপটে ধরতে যেতেই একজন রিভলবার থেকে গুলি চালিয়েছিল। তাতে একটা পুলিশ ঘায়েল।

পুলিশটা হাত চেপে বসে পড়তেই, অন্য পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে দুজনকে ধরে ফেলেছিল।

পারিজাত বক্সি যখন গিয়ে দাঁড়ালেন তখন দুজন আক্রোশে ফুলছে।

পারিজাত বক্সিকে দেখেই কালো মোটা লোকটা গর্জন করে উঠল।

টিকটিকি, তোকে আমরা ছাড়ব না। খতম করবই। একজন নিরীহ লোকের পিছনে লেগেছিস।

পারিজাত বক্সি কোন উত্তর দিলেন না।

ও-সিকে সঙ্গে নিয়ে টিনের ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন।

এখন বেশ আলো হয়েছে। কোণের দিকে কতকগুলো কাঠের টুকরো। সেগুলো সরাতেই নোটের বাণ্ডিল পাওয়া গেল।

কিন্তু ললিতা কই? যার জন্যে এত কাণ্ড তাকে কোথায় সরিয়ে রাখল।

পারিজাত বক্সির ধারণা ছিল এই ঘরের মধ্যেই কোথাও ললিতাকে রেখে দেওয়া হয়েছে।

ললিতাকে আবার কোথায় রাখল?

পারিজাত বক্সির নির্দেশে পুলিশ সারাটা বস্তি ঘিরে ফেলল। কাউকে বাইরে যেতে দিল না। সব জায়গা তন্ন তন্ন করে সার্চ করতে হবে। বাইরেটা

NOT FOR SALE

অনুসন্ধান করা হল। কিন্তু ভিতরে ঢুকতে যেতেই লোকেরা বাধা দিল। বলল না, ভিতরে জেনানারা থাকে। সেখানে আমরা আপনাদের যেতে দেব না।

ও-সি বলল, ঠিক আছে। আমাদের সঙ্গে মেয়ে পুলিশ আছে, তারাই ভিতরে সার্চ করবে।

গাড়ী থেকে গোটা কয়েক মেয়ে পুলিশ নামল। তার মধ্যে দেহাতি মেয়ে ছেলে ছিল।

সব বস্তিটা খোঁজা হল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জড় করে দেখা হল। ললিতা নেই।

একেবারে কোণের দিকে একটা টিনের চালা মেয়ে পুলিশ সেদিকে যেতেই একটি পুরুষ বাধা দিল। ওখানে কোন লোক থাকে না। ওটা গুদাম। খালি ড্রাম রাখা হয়।

পারিজাত বক্সির কি মনে হ'ল। বললেন হ্যাঁ, ওখানেও দেখব। মেয়ে পুলিশরা ভিতরে ঢুকে গেল। একটু পরেই তাদের চীৎকার শোনা গেল।

পারিজাত বক্সি ও দিকে গিয়ে দৌড়ে ভিতরে ঢুকলেন। বিরাট আকারের সব ড্রাম। মাঝখান দিয়ে সরু জায়গা। চীৎকারটা পিছন থেকে আসছে।

একেবারে কোণের দিকে একটা খাটিয়া, তার ওপর একটি মেয়ে। মুখ বাঁধা। হাত পাও বাঁধা। ন্যাড়া মাথা রোগা চেহারা। একটি মেয়ে পুলিশ তাকে কোলে করে বাইরে নিয়ে এল।

বস্তির সেই পুরুষটি বলল, ওতো আমার মেয়ে আমিনা। মেয়ের মুখ হাত পা অমন করে বেঁধেছেন কেন?

বড় বদমাস মেয়ে। ছুটে বাজার চলে যায়।

পারিজাত বক্সি মেয়েটির মুখ হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে বললেন, তোমার নাম কি বলতো মা। কোন ভয় নেই মেয়েটি কেঁদে উঠে বলল আমি লালি। ভাল নাম ললিতা।

পুরুষটি পায়ে পায়ে সরে পড়ার চেষ্টা করছিল।

পারিজাত বক্সির ইঙ্গিতে দুজন পুলিশ জাপটে ধরে তার হাতে হাতকড়া বসিয়ে দিল।

কথা হ'ল থানায় এসে। মুসলমান ভদ্রলোকটিকে পারিজাত বক্সি বললেন, কি আমায় চিনতে পারছেন? আমি রুম নম্বর তেত্রিশ এর অলক ঘোষাল। আপনার ছদ্মবেশটা কিন্তু নিখুঁত হয়েছে। শুধু একটা ভুল। সামনের সোনা দিয়ে বাঁধানো দাঁতটা ঢাকতে পারেন নি।

NOT FOR SALE

লোকটা মাথা তুলে রক্তচক্ষু মেলে পারিজাত বক্সির দিকে দেখেই মাথা নামাল।

তারপর ঘনশ্যামবাবু, আমার পিস্তলটা আপনার কাছে আছে, ওটা ফেরত দেবেন।

কালো মোটা লোকটা চুপচাপ বাইরের দিকে চেয়ে রইল। মেয়েকে ফিরে পেয়ে বসাকরা আনন্দে আত্মহারা।

পারিজাত বক্সির দুটো হাত ধরে বলল, আপনার ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না। কত অন্যায় কথা আপনাকে বলেছি, মাফ করবেন।

পারিজাত বক্সি এসবের উত্তর না দিয়ে বললেন, আপনার টাকাটা এখনই ফেরত পাবেন না। কেস শেষ হলে আপনাকে দিয়ে দেওয়া হবে।

আর একটা কথা লালিকে নিয়ে মাসখানেকের জন্য কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় চলে যান। আচ্ছা আসি নমস্কার।

লালিকে আদর করে পারিজাত বক্সি নিজের মোটরে গিয়ে উঠলেন।

—সমাপ্ত—

NOT FOR SALE

রাম-যাত্রা

প্রত্যেক দরজায় তিলক এক কথা বলল।

আর দুটো টাকা দিন মা, তাহলেই রামযাত্রাটা নামিয়ে দিতে পারি। এ পাড়ায় তো কখনও কিছু হয় না। একেবারে নতুন ধরনের পালা মা। দিন দুটো টাকা।

তিলক এ পাড়ার বস্তিতে থাকে। বাবুদের মোটর ধোয়, সকলের ফাইফরমাস খাটে, একটা পেট, যা পায় তাতেই চলে যায়। পাড়ার মাতব্বরি করে।

দু-টাকা দু-টাকা করে প্রায় দেড়শো টাকা উঠল। শনিবার বিকাল থেকে রাস্তা জুড়ে মেরাপ বাঁধা শুরু হল।

চলাফেরার একটু অসুবিধা, তবে এ শহরে এ অসুবিধা কেউ গায়ে মাখে না। রাত আটটায় যাত্রা আরম্ভ, ছটা থেকে আসর উপচে পড়ার যোগাড়। পাড়ার কোন ঝি বিকালে কাজে এল না। সেজেগুজে আসরে বসল।

ভদ্রমহিলার সংখ্যাও কম নয়। তাঁরা পিছনে চেয়ারে বসলেন।

আটটায় আরম্ভ হবার কথা, সাড়ে-আটটা বাজল, সিন ওঠার নাম নেই। তিলক ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। তার নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই।

পাড়ার সুজনবাবু তাকে পাকড়াও করলেন, কী হল তিলক? সাড়ে আটটা যে বেজে গেল।

তিলক কপাল চাপড়াল, আর বলবেন না বাবু। আজ কৈকেয়ীর পালাজ্বরের দিন তা কি জানা ছিল। কয়েক গ্রেন কুইনিন অবশ্য দিয়েছি। জ্বর ছাড়বার মুখে, তবে বলছে কানে কিছু শুনতে পাচ্ছে না।

তিলক দাঁড়াল না। ছুটে স্টেজের মধ্যে ঢুকে গেল।

ন টায় কনসার্ট শুরু হল। কনসার্ট মানে বাঁশি আর হারমোনিয়াম। দুটোর সুর দুদিকে। পাড়ার ছেলেরাই বোধহয় বাজাচ্ছে। সিন উঠল। রাজপ্রাসাদ, অবশ্য বুঝে নিতে হবে। জরাজীর্ণ অবস্থা। খালি দুটো থাম দেখা যাচ্ছে।

কৈকেয়ী আর মন্থরা। মন্থরার পিঠে কুঁজ থাকবার কথা, কিন্তু মন্থরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে কুঁজ লাগালে দশ টাকা বেশি দিতে হবে। কাজেই কুঁজ লাগানো সম্ভব হয়নি।

NOT FOR SALE

কৈকেয়ীর দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। এখনও জ্বর রয়েছে। সে স্টেজের ওপর বসে পড়ে পার্ট বলতে আরম্ভ করল।

মন্থরা, জানিস তো দশরথের কাছে আমার তিনটে বর পাওনা। এক বরে ভরত রাজা হবে, দ্বিতীয় বরে রামকে চোদ্দ বছরের জন্য বনে যেতে হবে, আর তিন নম্বর বরে কী হবে কিছুতেই মনে আসছে না। মন্থরার চোখমুখের ভাব সুবিধার নয়। দৃষ্টি উদাস। কী ভাবছে ভগবান জানেন।

সে কৈকেয়ীর দিকে ফিরে গম্ভীর গলায় বলল, কেন, ভুলে গেলে? তিন নম্বর বরে রাম আমাকে বিয়ে করবে।

ভদ্রদর্শকের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। এ আবার কী কথা? এমন কথা তো রামায়ণে নেই।

দু একজন বোঝাল, আজকাল নতুনভাবে রামায়ণের ভাষ্য তৈরি হচ্ছে। তাছাড়া সূর্পণখা যদি লক্ষণকে বিয়ে করতে চাইতে পারে, তাহলে মন্থরাই বা রামকে বিয়ে করতে চাইবে না কেন? মন্থরার কথা কৈকেয়ীর বিশেষ কানে গেল মনে হল না।

কুইনিনের তেজে তখনও তার দুকান বন্ধ।

বোধ হয় উল্টোই শুনল।

খেপে উঠে বলল, কী, এত বড় তোর আস্পর্ধা? তুই আমার বাপের বাড়ির দাসী, আর আমার কথার ওপর কথা। আমি বলছি ভরত রাজা হবে, আর তুই বলছিস, রাম বড়, রাম রাজা হবে।

তোকে আজই দুর করে দেব।

মন্থরা কানে কিছু শোনে না।

দূর করে দেব, কথাটা কিন্তু ঠিক কানে গেল।

মন্থরা বসে ছিল। কোমরে আঁচল জড়িয়ে উঠে দাঁড়াল।

দূর করে দিবি? তুই দূর করে দেবার কেরে? তিলক হাতে পায়ে ধরে এনেছে তাই এসেছি।

মন্থরা আর বলবার অবকাশ পেল না। কৈকেয়ী ঝাঁপিয়ে পড়ে তার চুলের মুঠি চেপে ধরল।

তবে রে, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা।

দুজনে ঝটাপটি, ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যেতেই যবনিকা ফেলে দেওয়া হল।

দর্শকদের হাসি আর থামে না।

লজ্জায় তিলক বাইরে বের হতে পারল না।

আধঘন্টা পর সিন উঠল। দশরথ আর রাম। দুজনকেই বেশ মানিয়েছে। দশরথ সিংহাসনে বসে। সিংহাসন মানে টুলের ওপর রঙীন কাপড় ঢাকা দেওয়া।

NOT FOR SALE

বৎস রাম, এবার আমার ইচ্ছা তোমাকে সিংহাসনে বসিয়ে আমি বানপ্রস্থ নেব। মন্ত্রীকে ডেকে তার আয়োজন করতে বলছি।

দশরথের গলাটা খুব চেনা চেনা ঠেকল। কথা বলার ভঙ্গীও। একটু পরেই চেনা গেল তার সংলাপে।

আমি অভিষেকের আয়োজন করতে শুরু করে দিয়েছি। অযোধ্যার প্রজারা ইতিমধ্যেই আড়াই হাজার কিলো আলু এনে গুদামে জমা করেছে। আলু ছাড়া যে-কোনও অনুষ্ঠান অচল। আলুর দম, বাঁধাকপি-আলুর তরকারি, আলুর চপ, আলু ভাজা।

আরো কতক্ষণ আলুর কীর্তন চলত কে জানে। বোধ হয় ভিতর থেকে প্রম্পটার ধমক দিতে দশরথ থেমে গেল।

তবে দশরথকে দর্শকদের সবাই চিনতে পারল। পাড়ার বাজারের আলুওয়ালা। বিরাট ঝাঁকা নিয়ে বাজারে ঢোকবার মুখেই যে বসে থাকে।

দশরথের সময়ে যে কিলোর যুগ হয়নি, সেটা বেমালুম ভুলে গেছে।

এবার রামের পালা। রাম দশরথের কাছে এগিয়ে এসে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, পিতা এই বয়সে আপনি বানপ্রস্থ নেবেন, এ আমি কি করে সহ্য করব? আপনি সহস্র বছর সুখে রাজত্ব করুন। আমি আপনার পদসেবা করে ধন্য হই।

এর মধ্যে রাম বেশ ভালই পার্ট বলল। মিষ্টি গলা, গলায় জোর আছে।

সামনে বসা ছেলেমেয়েরা হাততালি দিয়ে উঠল।

দশরথ দেখল রাম খুব জমিয়ে নিয়েছে। তাই গলায় আবেগ দিয়ে বলতে শুরু করল, বৎস, পৃথিবীর এই নিয়ম। শুকনো পাতা ঝরে গিয়ে নতুন পাতা গজায়। পুরনো আলু শেষ হলে নতুন আলু ওঠে, তেমনি জোয়ানদের জন্য রাস্তা করে দেবার জন্য আমাদের মতন বুড়োদের সরে যেতে হয়।

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দশরথ আলুর কথা ঠিক বলবে বলবে।

তুমি অরাজী হয়ো না বাপ।

এইখানে দশরথ কেলেঙ্কারি করল। তার শালগাছের মত ভারি একটা হাত রামের কাঁধের ওপর রাখল। সজোরে।

ব্যস, রাম চিৎকার করে বসে পড়ল।

ওঃ তোমাকে না বলেছি কাঁধে একটা ফোড়া আছে। গায়ে হাত দেবেনা। আঃ রক্ত বের হতে আরম্ভ হয়েছে। ধুত্তোর যাত্রা। এই রইল তোমাদের চুল, আর পোশাক। তোমাকে বাইরে পেলে দেখে নেব।

কথার সঙ্গে সঙ্গে রাম মাথার পরচুলা স্টেজের ওপর আছড়ে ফেলল। পোশাক টান মেরে খুলে দিল।

পরনে ছেঁড়া গেঞ্জি। দেখা গেল, কাঁধের কাছটা রক্তে লাল হয়ে গেছে। তার মানে শ্রীরামচন্দ্রের ফোড়াটা ফেটে গেছে।

NOT FOR SALE

দশরথ চাপা গলায় কী বলার চেষ্টা করল, কিন্তু রাম তখন প্রলয় নাচ শুরু করেছে। কোন কথা শুনতে রাজী নয়।

ভিতর থেকে কতকগুলো লোক বেরিয়ে রামকে ঘিরে মঞ্চের মধ্যে নিয়ে গেল। তার মধ্যে তিলকও ছিল।

এদিক দিয়ে কৈকেয়ী মঞ্চে প্রবেশ করল।

হে রাজন, আপনার কাছে দাসীর নিবেদন ছিল।

কৈকেয়ী শাড়ি পালটেছে। মুখেও নতুন করে রং মেখেছে। দুকানে ঝকঝকে দুল।

রামের ব্যবহারে দশরথ খুবই মুহ্যমান। এমন ছেলেকে বনবাসে পাঠাতে তিনি এখনই রাজী। এতবড় সাহস, বাপকে বলে বাইরে পেলে দেখে নেবে।

দশরথ কৈকেয়ীর দিকে চোখ ফেরাল।

কৈকেয়ী সুযোগ বুঝে ইনিয়ে-বিনিয়ে তিনটে বরের কথা নিবেদন করল।

রামায়ণের দশরথের মূর্ছা যাবার কথা, কিন্তু এ দশরথ যেন খুশি হল। বিড় বিড় করে বলল, বনে পাঠালে ঠিক শাস্তি হবে না। আলুর চাষের সময় যখন মাটি খোঁড়া হয়, তখন অমন ছেলেকে পুঁতে মাটি চাপা দেওয়া উচিত।

ভাগ্য ভাল, বিড়-বিড় করে বলার জন্য কথাগুলো দর্শকদের কানে গেল না।

কৈকেয়ী পাকা অভিনেত্রী। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল, মহারাজ, রামকে ডেকে তাহলে বনবাসের আজ্ঞা দিয়ে দিন।

দশরত ইঙ্গিতটা বুঝল। হুঙ্কার ছাড়ল।

কে আছ, রামকে পাঠিয়ে দাও।

রাম ঢুকতেই সারা আসরে হাসির তুফান ছুটল।

মাথায় ছোট, বহরে বড়, অমাবস্যার রং, ইয়া পাকানো গোঁফ, হৃষ্টপুষ্ট রামচন্দ্র গটগট করে ঢুকল।

বোঝা গেল আগের রাম নামতে রাজী হয়নি। নতুন লোককে পাকড়াও করে নামানো হয়েছে। লোকটিকেও চেনা গেল। মোড়ের রায়বাবুদের চাকর পাঁচু।

সে লজ্জায় দর্শকদের দিকে একেবারে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

কৈকেয়ী বলল, তোমার পিতার আদেশ শোন রামচন্দ্র!

দশরথ উঠে দাঁড়াল। চোখে একটা হাত চাপা দিয়ে বলল, তোমাকে চোদ্দ বছরের জন্য বনবাস দিলাম। এখনই চলে যাও।

রামকে বোধ হয় বলা ছিল, সে একদম কথা বলবে না। মাথা নিচু করে বেড়িয়ে আসবে। কিন্তু রং চং- এ পোশাক পরে জোরালো আলোর সামনে তার সব গোলমাল হয়ে গেল। কিংবা ঘুরে দাঁড়াতেই সামনে চেয়ারে -বসা রায়বাবুর দিকে চোখ পড়েছিল।

NOT FOR SALE

রাম দুটো হাত আড়াআড়ি ভাবে বুকের ওপর রেখে বাপকে বলল ।

হুট করে যাও বললেই তো আর যাওয়া যায় না। বাবুকে বলতে হবে, গিন্নীমার হুকুম নিতে হবে, মাইনের ব্যবস্থা করতে হবে।

আরও কী সব বলছিল, লোকের তুমুল হাসিতে সব চাপা পড়ে গেল।

এবারেও যবনিকা ফেলে দিয়ে মান বাঁচাতে হল।

ইতিমধ্যে বারো আনা লোক উঠতে আরম্ভ করেছে। পিছন দিক প্রায় খালি।

সবাই ভাবল এবার বোধ হয় যাত্রা বন্ধ হবে। অবশ্য আধুনিক যাত্রা। সিন ফেলার ব্যাপার রয়েছে। চারদিক খোলা আসর নয়, তিনদিক ঢাকা।

কিন্তু লক্ষ্মণ, ভরত, সীতা এদের দেখাই গেল না। অথচ পয়সা দিয়ে এদের আনা হয়েছে।

মিনিট পনের। হট্টগোল একটু কমতেই সিন উঠল।

এ-সিনে কারো কোন কথা নেই। রাম, সীতা আর লক্ষ্মণ বনবাসে চলেছে। সীতাকে কোথা থেকে যোগাড় করা হয়েছে কে জানে। সে লম্বায় রামের কোমর পর্যন্ত। একদিক থেকে ঢুকে আর একদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

তাতেও বিপত্তি।

তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে সীতার পায়ের সঙ্গে লক্ষ্মণের পা বেধে আর একটু হলেই দুজনেই উল্টে পড়ত।

কোন রকমে সামলে নিয়ে তিনজনে প্রস্থান করল।

এবার শেষ দৃশ্য।

মন্থরার লাঞ্ছনা। ভরতের হাতে।

ভরত ঢুকতেই সব লোক হাততালি দিয়ে উঠল। হাততালি আর থামতেই চায় না। এত উচ্ছাসের কারণ ভরত সেজেছে তিলক।

বোধহয় আসল ভরত যাত্রার ব্যাপার দেখে পালিয়েছে, মান রাখতে তিলক নেমেছে। ভরতের সাজে, কিম্বা তিলকই ভরত সেজেছে গোড়া থেকে।

মন্থরা স্টেজের মাঝখানে বসে ছিল দুপা ছড়িয়ে, ভরত লম্ফঝম্ফ করে ঢুকল।

নীচ দাসী, তোর কুমতলবে দাদা রাম বনবাসে গিয়েছে, আজ আর তোর নিস্তার নেই।

মন্থরার ভ্রুক্ষেপ নেই। একটা কাঠি নিয়ে নির্বিকারচিত্তে কান চুলকাচ্ছে।

এবার ভরত একটু বাড়াবাড়ি করল।

মন্থরার ঘাড়ে হাত দিয়ে বলল, আজ তোকে জমালয়ে পাঠাব।

ব্যস, মন্থরা স্প্রিংয়ের মতন লাফিয়ে উঠল।

NOT FOR SALE

খোঁপা খুলে চুল পিঠের ওপর। দুটো চোখ রক্তবর্ণ। মুখে খই ফুটছে।

তবে রে, তোর এত বড় সাহস, তুই আহ্লাদীর গায়ে হাত দিস। আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।

তিলক একটু থতমত খেয়ে গেল। এসব কথা বইতে নেই। বইতে আছে, মন্থরা ভয় পাবে, কাঁদবে, হাত জোড় করে বসবে, রাজকুমার, ক্ষমা কর। আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল। এমন কাজ কখনও করব না। কিন্তু তার বদলে এ-মন্থরা তো লাফাচ্ছে।

ভরত একবার শেষ চেষ্টা করল।

গলা চড়িয়ে বলল, পাপীয়সী, এখনও নাকে খত দে, নইলে তোর শেষ।

ভরত নাগালের মধ্যে যেতেই মন্থরা তাকে জাপটে ধরল। তারপর ধোপা যেভাবে কাপড় আছড়ায়, সেভাবে ভরতের দেহটা স্টেজে আছড়াতে আছড়াতে বলল, আয় কে কাকে শেষ করে দেখি।

তারপর ধপদপ শব্দ আর ভরতের আর্তনাদ।

লোকেরা স্টেজে উঠে কোনরকমে মন্থরার কবল থেকে ভরতকে ছাড়িয়ে নিল। ব্যস, যাত্রা শেষ। পরে পাড়ার বৌঝিরা বলেছে, ও তিলক, এ রামযাত্রা না গঙ্গাযাত্রা?

তিলক কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছে, ও দুটোর কোনটাই নয় মা। এ হল ভরতের গঙ্গাযাত্রা।

—সমাপ্ত—

NOT FOR SALE

রাত গভীর

দোষ আমারই। বন্ধুর বোনের বিয়ে। যাব আর খেয়ে চলে আসব, এই ঠিক ছিল। কিন্তু গিয়েই মুশকিলে পড়লাম।

বন্ধু একান্তে ডেকে হাত দুটো ধরে বলল, উদ্ধার করে দে ভাই, ভীষণ বিপদে পড়েছি।

কি আবার হল?

পাড়ার ছেলের দল পরিবেষণ করবে ঠিক ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে একদল বেপাড়ায় জলসা শুনতে চলে গেছে। লোক কম। তোদের হাত লাগাতে হবে।

ঠিক আছে।

পাঞ্জাবি খুলে ফেললাম। তারপর কোমরে গামছা বেঁধে লেগে গেলাম কাজে।

সব যখন শেষ হল, রাত বারটা বেজে গেছে। নিজের আর কিছু মুখে দেবার ইচ্ছা ছিল না। একটু দই খেয়ে রাস্তায় যখন পা দিলাম তখন রাত সাড়ে বারোটা।

বন্ধু বলেছিল নিমন্ত্রিতদের কারও মোটরে উঠিয়ে দেবে, কিন্তু রাস্তায় নেমে দেখা গেলে, সবাই চলে গেছে। কোন মোটর নেই।

বন্ধুকে আশ্বাস, দিলাম, আমি বড় রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে নেব। সাড়ে বারোটা কলকাতার পক্ষে আর এমন কি রাত।

রাস্তার মোড়ে গিয়ে দেখলাম, এদিক ওদিক দু'দিক ফাঁকা।

যানবাহন তো নেইই, রাস্তা জনমানবশূন্য।

বরাত। আচমকা ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হল। বিরক্তিকর।

বৃষ্টির ফাঁকে রাস্তার আলোগুলো বেশ নির্জীব, নিষ্প্রভ। পিছিয়ে একটা দোকানের আড়ালে দাঁড়াতে গিয়েই বিপত্তি।

একটা কালো কুকুর শুয়েছিল। দেখতে না পেয়ে একেবারে তার পেটের ওপর পা চাপিয়ে দিতেই কুকুরটা বিকট স্বরে চীৎকার করে উঠল।

গেছি রে বাবা! লাফিয়ে রাস্তায় কাছে আসতেই চোখে পড়ে গেল, অনেক দূর থেকে একজোড়া আলো এগিয়ে আসছে।

মরিয়া হয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ালাম। বাস লরি ট্যাক্সি প্রাইভেট গাড়ি যাই হোক না কেন, দু'হাত তুলে থামাব।

NOT FOR SALE

তা না হলে সারাটা রাত এইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কিংবা পিছু হেঁটে নিমন্ত্রণবাড়ি গিয়ে বন্ধুকে ঘুম থেকে তুলে বিব্রত করতে হবে।

আলো দুটো খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। মাঝে মাঝে সন্দেহ হল, বুঝি বা থেমেই আছে। আর এদিকে আসবেই না।

পকেট থেকে রুমাল বের করে সবে ভিজে মাথাটা মুছে নিচ্ছি, আচমকা কর্কশ কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম।

কি মশাই, রাস্তার মাঝখানে নটরাজনৃত্য দেখাচ্ছেন নাকি?

তারপর চাপা দিলেই চটে যাবেন।

তাড়াতাড়ি রাস্তা থেকে সরে এসেই লক্ষ্য করলাম, একটা মিনিবাস। দূরের আলোজোড়াও আর দেখা গেল না।

তার মানে দূরের আলোদুটো এই মিনিবাসেরই। হঠাৎ খুব দ্রুত এসে পড়েছে।

দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি উঠব।

মিনিবাস থামল। হাতল ধরে উঠে পড়লাম। মিনিবাস একেবারে ফাঁকা। অবশ্য এই মাঝরাতেরও পরে যাত্রী আর পাবে কোথায়! পিছনের সীটে বসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

মাথাটা ভাল মোছা হয়নি। কোঁচার খুঁট খুলে জোরে জোরে মুছে নিলাম। আমার আবার সর্দির ধাত। মাথায় জল বসলেই বেদম কাশি শুরু হবে।

উঃ। মনে হল, হাতের ওপর কে যেন বরফের টুকরো চেপে ধরেছে।

মুখ তুলে দেখলাম, একটা ছোকরা আমার হাতে টোকা দিচ্ছে।

দাদা, টিকিটটা করবেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, ঢাকুরিয়া যাবে তো?

হ্যাঁ যাবে। যেতেই হবে।

কত ভাড়া?

তিন টাকা।

তিন টাকা? নব্বই পয়সা করে যাই যে।

কথাটা বলেই বুঝতে পারলাম ঠিক বলিনি। দিনের বেলা যা রেট, এই মাঝরাতে দুর্যোগে সে রেট কখনও হতে পারে! বাড়তি পয়সা বোধ হয় ড্রাইভার কন্ডাকটারের পকেটে যাবে।

কোন কথা না বলে তিনটে টাকা এগিয়ে দিলাম।

টিকেট দিতে দিতে লোকটা বলল, এ মিনিবাসে যেখানে যাবেন এক ভাড়া। সামনের স্টপেজে নামলেও ওই তিন টাকা।

লোকটার সঙ্গে তর্ক করতে ইচ্ছা হল না। বলুক যা ইচ্ছা, মাঝরাতে যে পৌঁছে দিচ্ছে, এই আমার ভাগ্য।

NOT FOR SALE

সীটে হেলান দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। সব ঝাপসা। কিছু দেখা যাচ্ছে না। মিনিবাস খুব জোরে ছুটছে। এত রাতে পথিক নেই, ট্রাফিক সিগন্যালের বালাই নেই, তাই এই বেপরোয়া গতি।

কিছুক্ষণ পর ঘুমে চোখ বুজে গেল। ঘুমিয়ে পড়লেও অসুবিধা নেই। আমি কোথায় নামব লোকটা জানে। ঢাকুরিয়া এলে ঠিক ডেকে দেবে।

এক সময়ে ঘুম ভাঙল। মিনিবাস একভাবে ছুটছে। চোখ হাত ঘড়ির দিকে পড়তেই চমকে উঠলাম। রাত আড়াইটে।

যে ভাবে মিনিবাস ছুটছে, এতক্ষণে কখন ঢাকুরিয়া পৌঁছে যাবার কথা।

জিজ্ঞাসা করবার জন্য এদিক ওদিক দেখেই অবাক হলাম। মিনিবাস খালি। কেউ কোথাও নেই। অ মশাই, শুনছেন, ঠিক রুটে যাচ্ছেন তো? ঢাকুরিয়া পিছনে ফেলে এলেন না কি?

আশ্চর্য, গেল কোথায় লোকটা?

আমি যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তখন বোধ হয় মিনিবাস থামিয়ে লোকটা নেমে গেছে। কিন্তু এভাবে মাঝ পথে কি নেমে পড়তে পারে!

ঝড়ের বেগে মিনিবাস ছুটছে। মনে হচ্ছে, মাঝে মাঝে চাকাগুলো যেন রাস্তাই ছুঁচ্ছে না।

ঢাকুরিয়া কখন পার হয়ে গেছে। নীচু হয়ে দেখলাম দুপাশে ঝোপ জঙ্গল। জোনাকির বাহার। শহর ছড়িয়ে গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে কোথায় চলছে মিনিবাস?

আমি এগিয়ে একেবারে সামনের সীটে গিয়ে বসলাম। ঝুঁকে পড়ে ড্রাইভারকে বললাম।

দাদা, কোথায় চলেছেন? জায়গাটার নাম কি?

ড্রাইভার পিছনে ফিরল না। গম্ভীর গলায় বলল, আমি বলব কি করে? কন্ডাকটর ঘন্টা না দিলে আমি বাস থামাই কি করে?

কিন্তু ঘন্টা দেবে কে? কন্ডাকটর তো কখন নেমে গেছে।

এবার ড্রাইভার পিছন ফিরল।

এই পেঁচী ভূতগুলোর কথা আর বলবেন না মশাই। এই আছে, এই নেই। এদের সঙ্গে কাজ করাই ঝকমারি।

আমার মেরুদন্ড বেয়ে শীতল প্রবাহ। সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল থরথরিয়ে। মানুষ নয়, নরকঙ্কাল। চোখের দুটো গর্তের মধ্যে লাল আলোর শিখা। কথা বলবার সময় দাঁতগুলো মড় মড় করে উঠল।

গলা দিয়ে ভয়ার্ত স্বর বের হল, আপনি?

আবার ড্রাইভার হেসে উঠল। দু হাতে পাশা নাড়লে যেমন শব্দ হয়, তেমনই আওয়াজ।

NOT FOR SALE

আমি? এই দেখুন।

কঙ্কাল-হাত দিয়ে ড্রাইভার একটা পৈতা তুলে ধরল, খানদানী ব্রহ্মদত্যি। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলাম। আমার সঙ্গে ওদের তুলনা।

মরেওছি ব্রাহ্মণের হাতে।

ড্রাইভার মুখ ফিরিয়ে আবার স্টিয়ারিং-এর দিকে নজর দিল।

কি দাদা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? টিকিট করেছেন?

পিছন থেকে কন্ডাকটরের কণ্ঠ।

লোকটা হঠাৎ এল কোথা থেকে?

কিন্তু কোথায় লোকটা ! সার্ট প্যান্ট, কাঁধে ব্যাগ সব ঠিক আছে, শুধু লোকের চিহ্ন নেই।

আচ্ছা ভুতুড়ে মিনিবাসে উঠেছি তো। এখন প্রান নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারলে হয়।

পকেট থেকে টিকেট বের করে দেখালাম। গলায় সাহস এনে বললাম, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?

কোথায় থাকব? সীটের তলায় একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিলাম। ঘুম হবার কি আর যো আছে।

তারপর লোকটা পাশে বসল। লোকটা বসল মানে তার জামাকাপড় বসবার ভঙ্গী করল।

আপনাকে কি বলছিল ভৈরব ভটচাজ?

আমি অবাক। দেহ অদৃশ্য, অথচ কণ্ঠস্বর কানে আসছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, ভৈরব ভটচাজ কে?

ওই যে বাস চালাচ্ছে। বামনাই দেখাচ্ছিল বুঝি? যে আসে তাকেই পৈতে তুলে দেখায়। আজকাল আবার পৈতার কোন মান সম্মান আছে নাকি? ওর জন্যই তো আমার এই অবস্থা।

কি রকম?

লোকটা ব্যাগটা কাঁধ থেকে কোলের ওপর রাখল। বেশ জুতসই হয়ে যেন বসল।

তারপর বলতে শুরু করল।

স্টিয়ারিং ধরলে ভৈরবের আর জ্ঞান থাকে না। তখন মিনিবাস না উড়োজাহাজ কি চালাচ্ছে, ভুলেই যায়। কতবার সাবধান করেছি, কিন্তু কে শোনে কার কথা ।

পাঁচ-ছ' বছরের বাচ্চা হাতে মুড়ির ঠোঙা, রাস্তা পার হচ্ছিল, দিলে তাকে চাপা। ব্যস, চারদিক থেকে লোক ঘিরে ফেলল। আধলা ইঁটের বৃষ্টি শুরু হল মিনিবাসের ওপর।

NOT FOR SALE

চায়ের দোকান থেকে এক টিকিওলা বামুন বের হয়ে এল, হাতে লোহার রড, একবারে সোজা ভৈরবের মাথায়। আর শব্দটি করতে হল না।

স্টিয়ারিং-এর ওপর নেতিয়ে পড়ল। আমি দরজা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিলাম, থান ইঁট এসে লাগল আমার চোয়ালে। বাপ্ বলে ডিগবাজী খেয়ে রাস্তার ওপর পড়লাম।

সেই থেকে এই অবস্থা। ভৈরব বামুনের হাতে গেছে, নিজে বামুন, তাই ব্রহ্মদত্যি। আর আমি—

কথা আর শেষ হল না।

ভৈরব ভটচাজ হুঙ্কার দিয়ে উঠল, দেখ গুপে, প্যাসেঞ্জারকে যা তা বোঝাস নি। তুইই তো বললি, সব ঠিক আছে, চালাও জোরে।

বাবুদের অফিসের দেরী হয়ে যাবে।

খবরদার, কপালের নীচে অমন ড্যাবডেবে একজোড়া চোখ রয়েছে কিসের জন্য? রাস্তার লোকজন দেখতে পাও না? আমি বলব, তবে থামবে?

এবারে ওদের চেহারা দেখা গেল। চেহারা মানে কঙ্কাল।

চেঁচামেচি, হৈ চৈ, হাতাহাতি।

সর্বনাশ, ভৈরব ভটচাজ স্টিয়ারিং ছেড়ে বাসের ভিতরে হাত বাড়াল।

আজ তোর একদিন, কি আমার একদিন! একবার ইঁটের ঘায়ে কাবার হয়েছিস, এবার আমার হাতে মরবি।

গুপেও আস্তিন গুটিয়ে রুখে দাঁড়াল।

আঙ্গুলের হাড়গুলো মড় মড় করে উঠল। ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বাসের মেঝের ওপর।

বেশ, হয়ে যাক। দাদা বলে এতদিন কিছু বলিনি, কিন্তু আর মানুষ নই যে মিথ্যা কথা সহ্য করব, অপমান গায়ে মাখব না। দেখি, কার হাড়ে কত শক্তি।

আমি মহা মুশকিলে পড়লাম।

দুই কঙ্কালের মাঝখানে আমি। লড়াই হলে বেশীর ভাগ চোট আমার ওপর দিয়েই যাবে।

স্টিয়ারিং ছেড়ে ভৈরব ভটচাজ ভিতরে চলে এসেছে।

স্টিয়ারিং-এ কেউ নেই, অথচ ভূতুড়ে বাস উদ্দামবেগে ছুটেছে। বুঝতে পারলাম, এখনই আশপাশের দোকানের সঙ্গে কলিশন হবে। মিনিবাস চুরমার, সেই সঙ্গে আমিও।

অনেকগুলো উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। কেউ ভৈরব ভটচাজের পক্ষ সমর্থন করছে, কেউ গুপীর।

কিন্তু বাস তো খালি ছিল, এতগুলো লোক এল কোথা থেকে।

NOT FOR SALE

মুখ ফিরিয়ে যা দেখলাম, তাতে আমার মাথার চুল সজারুর কাঁটার মতন খাড়া হয়ে উঠল। মনে হল, বুকের টুক-টুক শব্দ বুঝি বন্ধ হয়ে গেল।

একেবারে সামনের সীটে, আমার পাশে তপন হালদারের দাদামশাই। মাস দুয়েক আগে যিনি বাজার থেকে আসবার সময় বাসের চাকার তলায় একেবারে থেঁৎলে গিয়েছিলেন।

তাঁর পিছনের লোকটিও আমার খুব চেনা। আমার অফিসের দপ্তরী। যে ক'দিন আগে অফিসের সামনে ট্রাম থেকে নেমে রাস্তা পার হবার সময় বাসের তলায় গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে গিয়েছিল।

আর একজনকে চিনতে পারলাম। আমাদের ঝিয়ের সাত বছরের ছেলে রতন। সেও মারা গেছে বাসের চাকায়।

বাকি লোকগুলোকে ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে রক্তমাংসের মানুষ কেউ নয়, সবাই কঙ্কাল।

বিকট চিৎকার আর হাড়ের হাততালির কানে তালাধরা শব্দ।

লড়ে যা ভৈরব। গুপী দেখি তোর মুরোদ।

আর একদল চেঁচাচ্ছে, সাবাস গুপী, একটা আপার কাট। ভৈরবকে ঠাণ্ডা করে দে।

একবার ভাবলাম, যা থাকে কপালে, বাস থেকে দিই এক লাফ।

কিন্তু ছুটন্ত এই বাস থেকে লাফ দিলে নির্ঘাৎ মৃত্যু। তা ছাড়া নামবার জায়গা আটকেই তো যত মারামারি।

হঠাৎ প্রচণ্ড একটা শব্দ। মনে হল, মিনিবাসটা দু হাতে তুলে কে যেন আছড়ে ফেলল।

হাড়ের খটাখট, কলকব্জার ঝনঝনাৎ, সব লোকগুলো বুঝি তালগোল পাকিয়ে গেল।

আমি বিদ্যুৎগতিতে ছিটকে বাইরে গিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ পড়েছিলাম জানি না। জ্ঞান হতে ব্যাঙের কর্কশ ঐক্যতান কানে এল। বুঝতে পারলাম, পুকুরের ধারে পড়ে আছি।

নরম মাটিতে পড়েছি বলে তেমন আঘাত পাইনি। দেহের কোথায় চোট লেগেছে হাত বুলিয়ে দেখতে গিয়েই চমকে উঠলাম।

একতিল মাংস কোথাও নেই, কেবল হাড় আর হাড়। স্বপ্ন দেখছি নাকি! চোখে হাত দিতেই হাত ভিতরে ঢুকে গেল। চোখ নেই, বিরাট দুটি গর্ত।

অনেক কষ্টে কঙ্কাল-দেহটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

—সমাপ্ত—

NOT FOR SALE

হলুদ আতঙ্ক

চৈতন চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল। প্রথমে কথাগুলো কানে যেতেই মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল দু' কানের পাশে হাজার বোলতা গুঞ্জন করছে। একটু দূরে দাঁড়ানো ভৈরব খুড়ো আর পরাণের চেহারা অস্পষ্ট। তারপরই সামলে নিয়েছিল। শক্ত হাতে বাঁশের খুঁটিটা আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনেছিল।

এবার সবই যেন একটু অন্যরকম। অন্যবার বেড়ার ওপার থেকে বাপের গলা সবচেয়ে আগে শোনা যায়, চৈতন! চৈতন রে!

সঙ্গে সঙ্গে চৈতন হাতের কাজ ফেলে লাফিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। বাপের হাতে কাঁচের জারে সোনার বর্ণ মধু। তারপর থলির মধ্যে রঙিন শামুক, মাছ, বুনো ফলের রাশ।

বছরের একটা সময় সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ে, সুন্দরবনে মধুর সন্ধানে।

একেবারে অজগর বন। আকাশ দেখা যায় না। রোদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। দিনের বেলাতেও ঘোর অন্ধকার। কেবল ঝিঁঝিঁর ডাক, পাখির চিৎকার, বানরের চেঁচামেচি।

একবার চৈতনের জন্য বাপ একটা হরিণের বাচ্চাও এনেছিল। গেরুয়া রংয়ের শরীরের ওপর সাদা সাদ বুটি। দুটি চোখে যেন কাজলের ছোপ।

চৈতন হরিণছানাটাকে বুকে তুলে নিয়েছিল, কিন্তু বাঁচাতে পারেনি। দিন পনেরো কুড়ির মধ্যেই হরিণছানাটা দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। সারা শরীর থরথরিয়ে কেঁপে উঠত। শেষদিকে ভাল করে দাঁড়াতেও পারত না। জল জমত চোখের কোণে। ভোরবেলা একদিন উঠে চৈতন দেখল, চারটে পা ছড়িয়ে হরিণছানাটা মরে পড়ে আছে। দুটো চোখ বিস্ফারিত।

চৈতনের প্রথমে ধারণা হয়েছিল কোন বন্য জন্তুতে হয়তো মেরে ফেলেছে। মাঝে মাঝে চিতাবাঘের আমদানি হয় আর শিয়ালের। ছাগল, মুরগী যা পায় শেষ করে দেয়।

না, চৈতন হরিণছানার দেহটা উলটে পালটে দেখেছিল। কোথাও দাঁতের দাগ নেই। আক্রমণের চিহ্ন নয়।

চৈতনের মনে হয়েছিল, মা বাবার কাছ ছাড়া হয়ে বনের জীবন হারিয়ে হরিণছানাটা মনের দুঃখেই নিশ্চয় মারা গিয়েছিল।

NOT FOR SALE

এবারে বাবা নয়, ভৈরব খুড়ো বাড়ির দাওয়ায় দাঁড়িয়ে খুব নীচু গলায় আস্তে ডেকেছিল, চৈতন! চৈতন!

চৈতন পিছনের দিকে বসে কোদালের বাঁট তৈরি করছিল। হাতের কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল।

রান্নাঘর থেকে চৈতনের মাও ততক্ষণে দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। দুজনেই চোখ ঘুরিয়ে বাড়ির লোকটাকে খুঁজেছিল।

শুধু ভৈরব খুড়ো আর পরাণ। ভৈরব মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছে। তার দেহের আড়ালে পরাণ।

ভৈরবের বয়স পঞ্চাশের ওপর, কিন্তু এখনও টান টান শরীরের চামড়া, শরীরের কোথাও কোন খাঁজ পড়েনি। চওড়া বুক, দু'-হাতের পেশী পতঙ্গী নদীর ঢেউয়ের মতন সর্বদা চঞ্চল। তেমনি বাজখাঁই গলা।

এখন কিন্তু গলা একেবারে খাদে। সর্বনাশ হয়ে গেছে চৈতনের মা। তোমাদের কাছে আমার মুখ দেখাবার উপায় নেই।

চৈতন আর একটু এগিয়ে এসেছিল। চৈতনের মা নড়েনি। দরজায় হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

পাঁচুকে বড় মিয়া ধরে নিয়ে গেছে।

চৈতন জানে এরা বাঘকে বড় মিয়া বলে। তার বাপও তাই বলত।

ঠক করে একটা আওয়াজ হতেই চৈতন মুখ ফেরাল। তার মা দাওয়ার ওপর বসে পড়েছে।

এবার পরাণ বলল, মায়ের মুখে চোখে জলের ছিটে দে চৈতন।

এসব কিছু করতে হল না। একটু পরেই মা উঠে বসল। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, মুখে ছিটেফোঁটা রক্ত নেই।

ভৈরব একটানা বলে চলেছে। আমরা লাইন বেঁধে চলেছি দুটো মৌমাছির পিছন পিছন। আমি সবার আগে, পাঁচু সকলের শেষে। হঠাৎ পাশের ঝোপ নড়ে উঠল, তারপরেই হলুদ একটা আভা, এক লাফে পাঁচুকে মুখে তুলে নিল।

আমরা তাড়াতাড়ি গাছের ওপর উঠে চেঁচামেচি শুরু করলাম। আমাদের সামনে দিয়ে একটু পরেই বড় মিয়া পাঁচুর টুঁটি কামড়ে ধরে গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেল। গুলি খাওয়া জন্তু। পিছনের পা'টা টেনে টেনে চলছে। সারা রাত্রি গাছের ওপর কাটিয়ে ভোরবেলা নেমে এলাম। একটু খুঁজতেই আধ খাওয়া দেহটা পাওয়া গেল। বড় মিয়া আমাদের গোলমালে খাওয়া শেষ করতে পারেনি, পালিয়েছে। আমরা মাটি খুঁড়ে পাঁচুর দেহটা চাপা দিয়ে এলাম। আহা, পাঁচুটা আমার ডান হাত ছিল গো।

এ ঘটনা নতুন কিছু নয়। প্রত্যেকবারই গাঁয়ের কেউ না কেউ বাঘের মুখে যায়।

NOT FOR SALE

তবু উপায় নেই। প্রতি বছর বিশেষ একটা সময়ে দল বেঁধে সব সুন্দরবনের গভীরে যায় মধুর সন্ধানে। বাঘ আছে, সাপ আছে, ঝড় ঝাপটায় নৌকাডুবির ভয় আছে, কিন্তু তা বলে প্রাণের মায়া করে বাড়িতে বসে থাকলে পেট চলবে কি করে! মৃত্যু কি কেবল বাইরের জঙ্গলেই আছে, দরজা জানালা বন্ধ করে বাড়ির মধ্যে থাকলে কি তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়!

ভৈরব আর পরাণ যখন মেঠো পথ ধরে ফিরছে, তখন হঠাৎ পিছন থেকে ডাক, খুড়ো, ও খুড়ো।

ভৈরব সারা নন্দীপুর গাঁয়ের খুড়ো। কাজেই সে যেমন পাঁচুরও খুড়ো ছিল, তেমনই পাঁচুর ছেলে চৈতনেরও খুড়ো।

ভৈরব আর পরাণ দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

পিছন ফিরে দেখল মাঠের ওপর দিয়ে চৈতন ছুটতে ছুটতে আসছে।

কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে চৈতন বলল, খুড়ো, তোমরা আবার কবে সোঁদর বনে মৌ আনতে যাবে?

এ বছর আর আমরা যাব না।

একটু হতাশ হয়ে চৈতন বলল, আর কেউ যাবে না?

অন্য দল যাবে। এই তো নেত্য, তুলসী ওরা সব যাবে। কেন রে?

আমি সঙ্গে যাব।

তুই? তুই মৌ আনতে যাবি? আর একটু বয়স হোক।

না, মৌ আনতে নয়। সেই খোঁড়া বড় মিয়ার মোকাবিলা করতে যাব। বাবার মৃত্যুর বদলা নেব।

চৈতনের কথা শুনে ভৈরব আর পরাণ দুজনেই অবাক। বুঝতে পারল বাপের শোকে চৈতনের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নইলে এই বয়সের ছেলে এমন কথা বলে কি করে!

বড় মিয়া যে কি বস্তু সেটা তার জানা নেই। সারা সুন্দরবনের জল, মাটি, আকাশ, বাতাস বড় মিয়ার হুঙ্কারে কেঁপে ওঠে। তার ওপর চোট খাওয়া জন্তু যে কি বিভীষিকা, চৈতন ভাবতেও পারবে না।

ভৈরব কাছে এসে চৈতনের পিঠে হাত রেখে বলল, যা বাবা, ঘরে যা। মায়ের কাছে গিয়ে বস। বাপের কাজকর্ম যা করার আছে করতে হবে না?

চৈতন একটি কথাও না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

ভৈরব আর পরাণ বাঁকের পিছনে অদৃশ্য হয়ে যেতেই সে ডানদিকের সড়ক ধরল।

একেবারে গাঁয়ের শেষে তুলসীর কুঁড়ে। তুলসী বছর বাইশ তেইশের জোয়ান ছেলে। তার তিন কুলে কেউ নেই। খুব ভাল বাঁশী বাজাতে পারে। ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে নিজের হাতে বাঁশী তৈরি করে। তার কাছে চৈতন

NOT FOR SALE

কিছুদিন শেখার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। গলায় ব্যথা হওয়ায় ছেড়ে দিয়েছিল।

চৈতন একটু দূর থেকেই দেখতে পেল তুলসী উঠানে বসে একটা বাঁশের খাটিয়া তৈরি করছে।

তুলসীদা!

চৈতনের গলা কানে যেতেই হাতের কাজ ফেলে তুলসী উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে চৈতনের একটা হাত ধরে তাকে দাওয়ার ওপর বসিয়ে নিজে পাশে বসল। আস্তে আস্তে বলল, কি লজ্জার কথা চৈতন, আমরা এতগুলো লোক থাকতেও তোর বাবাকে বাঁচাতে পারলাম না। আমি অবশ্য নামিনি। পায়ে একটা বিষফোঁড়া হয়েছিল বলে নৌকাতেই ছিলাম।

এতক্ষণ পরে চৈতনের দুটো চোখ বেয়ে টপ টপ করে জলের ফোঁটা মাটিতে পড়ল। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিয়ে সে বলল, তুমি কবে যাবে তুলসীদা, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

তুই যাবি?

হ্যাঁ। মৌ-এর খোঁজে নয়, বড় মিয়ার মুখোমুখি দাঁড়াতে। আমাদের যে সর্বনাশ করেছে তার প্রতিশোধ নিতে।

তুলসী একটা হাত দিয়ে চৈতনের পিঠ চাপড়াল, এই তো মরদের মতন কথা। তুই চল আমাদের সঙ্গে। আমিও থাকব তোর পাশে পাশে। পাঁচু খুড়োর শোধ যদি না নিই তবে আমাদের গলায় দড়ি দেওয়া উচিত।

সোৎসাহে চৈতন জিজ্ঞাসা করল, কবে যাচ্ছ তোমরা তুলসীদা?

আর দিন পাঁচেক পরে।

কিন্তু বাবার কাজ?

অপঘাতে মৃত্যু, কাজ তো তিনদিনেই হওয়া উচিত। তিনদিন তো হয়েই গেছে। তবে আজ তোদের কানে গেছে। আজ থেকে তিন দিন পর কাজ করে নে। তারপর তোর যেতে কোন অসুবিধে হবে না।

তাই ঠিক হল। মাঝরাতে জোয়ার এলে নৌকা ছাড়বে। রাত নিশুতি হলে চৈতন আস্তে আস্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নৌকায় গিয়ে উঠবে। মাকে বলতে গেলে মা ছাড়বে না। সেই জন্যেই চুপি চুপি বাড়ি থেকে বের হতে হবে।

চৈতনও লিখতে জানে না, তার মাও পড়তে পারে না। কাজেই চিঠি লিখে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

তাই ঠিক হল, পরের দিন সকালে নৌকা যখন অনেক দূর চলে যাবে, তখন নেত্যর দিদি এসে চৈতনের মাকে জানাবে।

বদলা নিতে গেছে একথা বলবে না, বলবে মৌ-এর সন্ধানে গেছে অন্য সকলের সঙ্গে। বাপের ব্যবসায়ে নেমেছে।

NOT FOR SALE

ঠিক মাঝরাতে নৌকা ছাড়ল। নৌকায় সবসুদ্ধ দশজন। তার মধ্যে চারিজন মাঝি।

জোয়ারের স্রোতে নৌকা তীরবেগে ছুটল। পাটাতনের একপাশে পাশাপাশি এক মাদুরের ওপর তুলসী আর চৈতন। দুজনের কারও চোখে ঘুম নেই। আকাশে ভাঙ্গা চাঁদ। দু'পাশে ক্রমে ক্রমে জঙ্গল ঘন হচ্ছে।

চৈতন জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা তুলসীদা, জায়গাটা চিনবে কি করে?

কোন্ জায়গাটা? যেখানে বাঘ মুখে তুলে নিয়ে গিয়েছিল? সে জায়গাটা চেনা মুশকিল। তবে যেখানে পাঁচু খুড়োকে ওরা মাটি চাপা দিয়ে এসেছে, সে জায়গাটা চিনতে পারব।

কি করে পারবে, তুমি তো নৌকা থেকে নামনি?

তা নামিনি, কিন্তু নিয়ম হচ্ছে যেখানে মাটি চাপা দেওয়া হয় সেখানে বাঁশে একটা কাপড় টাঙিয়ে পুঁতে দেয়।

কেন?

মানুষটার একটা স্মৃতিচিহ্নও বটে, তা ছাড়া মৌ-এর সন্ধানে পরে যারা আসবে তারা সাবধান হতে পারবে।

চৈতন আর কিছু বলল না। ও পাশ ফিরে শুয়ে বুকের কাছে রাখা শড়কিটার ওপর পরম মমতায় হাত বুলাতে লাগল।

নৌকায় চৈতন এর আগে অনেকবার চড়েছে। বলতে গেলে একেবারে নদীর কোলে মানুষ। সালতি নিয়ে ডাঙ্গার কাছাকাছি ঘুরেছে। কিন্তু এত দূরে তার আসা এই প্রথম।

অজস্র পাখির কলরবে চৈতনের ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসে দেখল পাশে তুলসী নেই। কখন উঠে গেছে।

ভোর হচ্ছে। গাছের ডালে ডালে পাখির চিৎকার। একদল জলে নেমে বোধহয় স্নানই করছে।

নদীর জলে চৈতন মুখ ধুয়ে নিল। এখানে নদী অনেক চওড়া। তীর ঘেঁষে নৌকা চলেছে। অন্য তীর ভাল করে দেখাই যায় না। শুধু ম্লান সবুজ একটা রেখা নৌকার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। ছইয়ে হেলান দিয়ে চৈতন বসল।

এই জঙ্গলেরই কোথাও মাটির নীচে তার বাপ ঘুমিয়ে আছে। চৈতনের মনে হল, তাকে দেখতে পেলে বাবা হয়তো শরীর থেকে কাদা মাটি রক্ত ঝেড়ে উঠে বসবে। চিৎকার করে বলবে, চৈতন বাপ, এমন সর্বনেশে জায়গায় তুই কেন এলি? পালা, পালা। ছোট ছেলেদের আসবার জায়গা এটা নয়।

ঠুক করে শব্দ হতেই চৈতন চমকে উঠল।

তুলসী একটা ধামিতে মুড়ি আর গুড় এনে সামনে রাখল! সে নিজে পাশে বসল। তার কোঁচড়ে একই জিনিস।

NOT FOR SALE

তুলসীদা, জায়গাটা আর কতদূর?

মুড়ি চিবাতে চিবাতে তুলসী উত্তর দিল, এখনও অনেক দূর। রায়মঙ্গল ছাড়িয়ে বাঁ হাতি খাঁড়ির মধ্যে ঢুকতে হবে। সেখানে আসতে দুপুরের আগে নয়। জায়গাটা আমি নিশানা করে রেখেছি। একেবারে জলের পাশে একটা বাজপড়া গরাণ গাছ আছে।

আর সেই কাপড়ের নিশান?

সেটাও দেখা যায়, যদি না পরে বাঁশ পড়ে গিয়ে থাকে।

মুড়ি মুখে দিতে দিতে চৈতন ভাবতে লাগল। এতক্ষণে মা খবর পেয়ে গেছে। নেত্যর দিদি খুব সকালেই খবর দিয়ে দেবে। খবরটা পেয়ে মা হয়তো কিছুক্ষণ গলা ছেড়ে চেঁচাবে, তারপর সামলে নেবে। এটা খুবই স্বাভাবিক। এ অঞ্চলের মানুষরা বসে থাকবে না। তাদের সুন্দরবন টানে। প্রতি বছর কত লোক বাঘের পেটে যায়, সাপের ছোবলে মারা পড়ে, নদীর জলে ডোবে, কিন্তু লোকের যাওয়ার কামাই নেই। মরশুমের সময় নৌকা বোঝাই লোক গহীন গাঙে ঠিক পাড়ি দেয়। তবে চৈতনের বয়সটা খুব কম, এই যা। পাড়ার মেয়েরাই চৈতনের মাকে বোঝাবে। চৈতনকে তো বের হতেই হবে। সে ঘরের মধ্যে বসে থাকলে চলবে কি করে? এ বাজারে কে খেতে দেবে তাদের?

রোদ বাড়তে সবাই ছইয়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। শীতের রোদ, কিন্তু তাও তাপ কম নয়। রোদের ছটায় জল চকচক করছে বর্শার ফলার মতন। বেশীক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না।

হঠাৎ ধাক্কা লাগতে চৈতন উঠে বসল।

দু' চোখ মুছে হাঁউমাউ করে উঠল, কি, কি হয়েছে?

তুলসী মুখে কিছু বলল না। শুধু আঙুল দিয়ে পারের দিকে দেখাল।

চৈতন দেখল।

ঘন জঙ্গল। দূর থেকে দুর্ভেদ্য মনে হচ্ছে। সবুজের পটভূমিতে একটা সাদা কাপড়ের টুকরো পতপত করে উড়ছে।

দেখতে দেখতে চৈতনের চোখ জলে ভরে এল। বাঁশে পোঁতা নিশান। যার তলায় চৈতনের বাপ ঘুমিয়ে আছে।

তুলসীর নির্দেশে মাঝিরা নৌকা ঘোরাচ্ছে। জলে ঢেউ তুলে নৌকা পারের দিকে এগোচ্ছে।

খুব কাছে আসতে কানে লক্ষ ঝিঁঝিঁর ডাক ভেসে এল। মাঝে মাঝে শুধু শুকনো পাতা খসে পড়ার শব্দ।

অনেকখানি কাদা। কাদার উপর লাল লাল ফুল ফুটে আছে। নৌকা একেবারে কাছে আসতে বোঝা গেল সেগুলো ফুল নয়, ছোট ছোট কাঁকড়া। নৌকার শব্দে বিদ্যুৎগতিতে গর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

NOT FOR SALE

টাঙ্গি, বর্শা, শড়কি, বল্লম নিয়ে তুলসী আর চৈতন তৈরি। মাঝি কাদার ওপর একটা তক্তা ফেলে দিল যাতে কাদায় পা না ডুবে যায়। তক্তার ওপর পা ফেলে ফেলে দুজন উঠে এল।

নৌকার ওপর থেকে বাকি সবাই চিৎকার করে বলল, খুব সাবধান! কোন রকম গোয়ার্তুমি করতে যেও না। ফিরে এসে যেন দুজনকে পাই।

ঠিক এভাবে মৃত্যুর বদলা নিতে আর আগে কেউ আসেনি। বাঘের মুখোমুখি অনেকে হয়েছে। কেউ প্রাণ দিয়েছে, কেউ প্রাণ নিয়েছে, কিন্তু এরকম করে স্বেচ্ছায় বাপের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে এত অল্পবয়সের ছোকরা কেউ এগিয়ে আসেনি।

তবে ভরসার কথা, সঙ্গে তুলসী রয়েছে। তুলসীরই বা কি বয়স! আর ওই সাক্ষাৎ শমনের কাছে কারও নিস্তার নেই।

একটু একটু করে নৌকাটা একটা কালো বিন্দুতে রূপান্তরিত হল। আর দেখা গেল না, শুধু জল আর জল।

তুলসী আর চৈতন ফিরে দাঁড়াল।

দিন সাতেক এই ওদের আস্তানা। সাত দিন পর নৌকা এই পথে ফিরবে, তখন দুজনকে তুলে নিয়ে যাবে।

তুলসী সাবধান করে দিল, দেখো কাঁটার মত গাছের গোড়া উঁচু হয়ে রয়েছে, তার ওপর পা পড়লে রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যাবে। তা ছাড়া ঘা বিষিয়েও উঠতে পারে।

দুজনে নিশানের দিকে এগিয়ে গেল।

একেবারে কাছে গিয়ে চৈতন কান্নায় ভেঙে পড়ল। মাটির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

তুলসী তাকে টেনে তুলল, এই ওঠ, এমন নরম হলে তুই বদলা নিবি কি করে? মন শক্ত কর। কাঁদলে কি আর মানুষটা ফিরে আসবে? আয়, আমরা এদিক ওদিক ঘুরে দেখি।

অনেকক্ষণ পর চৈতন উঠে দাঁড়াল। সেখানকার মাটি নিয়ে কপালে মাখল, তারপর তুলসীর পিছন পিছন বনের গভীরে ঢুকে গেল।

কিছুটা যেতেই হাজার হাজার বানরের কিচির মিচির শুরু হল।

পর পর গোটা দশেক গাছে পাতা দেখার উপায় নেই, কেবল বানর আর বানর। ছোটগুলো ডালে লেজ আটকে দোল খাচ্ছে।

তাদের রাজ্যে দুজন মানুষকে ঢুকতে দেখে একটু থেমে আবার চেঁচামেচি শুরু করল।

*　　*　　*

NOT FOR SALE

বাঁ দিকে বড় বড় ঘাস। বুক পর্যন্ত। জমি অনেকটা নেমে গেছে। তুলসী কিছুটা গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছনে চৈতন ছিল। তার দিকে ফিরে বলল, দেখ চৈতন।

চৈতন একটু এগিয়েই অবাক্।

একপাল হরিণ জল খাচ্ছে। সামনে একটা ডোবা। পরিষ্কার জল। সারা গায়ে ফুটফুট দাগ, গাছের ডালপালার মতন বিচিত্র শিং-এর বাহার। চোখে যেন কাজল পরা।

তুলসী বলল, এইখানে কোন গাছের ডালে আমাদের আস্তানা বাঁধতে হবে। হরিণরা জল খেতে আসে আর গন্ধে গন্ধে বড় মিয়ারাও আসে এখানে। সুযোগ বুঝে ঘায়েল করতে হবে।

চৈতন বলল, কিন্তু যাকে খুঁজছি, তাকে কি পাব?

বরাত জোর থাকলে পেয়ে যেতে পারি। তার চলন দেখলেই চেনা যাবে। একটা পা টেনে টেনে চলে।

এরা ফিসফিস করে কথা বলছিল, কিন্তু তাতেই হরিণের দল কান খাড়া করে একটু শুনল, তারপর মৃদু একটা শব্দ করে নক্ষত্রগতিতে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তুলসী এদিক ওদিক চোখ ফিরিয়ে দেখে বলল, এই সুঁদুরি গাছটাই ঠিক হবে। একটু ওপরে দুটো ডাল ভাগ হয়ে গিয়েছে। বেশ শক্ত ডাল। ওর ওপর রাত কাটাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

চৈতন কিছু বলল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

তুলসী কাজে লেগে গেল।

কাঁধ থেকে ব্যাগ নামিয়ে ছোট একটা করাত বের করল। চারপাশে গাছের অভাব নেই। গোটা কয়েক মোটা ডাল কেটে দড়িতে বাঁধল, তারপর কাঠবিড়ালির মতন তরতর করে সুঁদুরি গাছ বেয়ে উঠে গেল। একটা ডালে বসে চেঁচিয়ে চৈতনকে বলল, ওই দড়িটা ছুঁড়ে ওপরে দে।

দু'বার চেষ্টা করে চৈতন ঠিক ছুঁড়ল।

তুলসী আধ ঘণ্টার মধ্যে দুটো ডালের মাঝখানে বসবার চওড়া জায়গা তৈরি করে ফেলল। সামনে ঝাঁকড়া আর একটা ডাল। ঘন পাতা থাকার জন্য নীচ থেকে ওপরে বসে থাকা কাউকে চোখে পড়ার কথা নয়।

কাজ শেষ করে তুলসী নেমে এল।

চৈতন বলল, তুলসীদা, তোমার ব্যাগে ভরে অত জিনিস এনেছ, বলনি তো?

উত্তরে তুলসী ম্লান হেসে বলল, ব্যবস্থা তো সবই করেছি, এখন কাজ উদ্ধার হলে হয়।

NOT FOR SALE

কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে অন্ধকার নামল। জঙ্গলে বোধ হয় সন্ধ্যা একটু আগেই আসে। চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে এল।

চৈতন আর তুলসী গাছের ওপরে উঠে বসল। পাতার আড়ালে নিজেদের ঢাকা দিয়ে জঙ্গলের দিকে চোখ রেখে দুজনে একেবারে চুপচাপ।

তুলসী চিঁড়ে আর গুড় বেঁধে নিয়ে বসেছিল, দুজনে মিলে খাওয়া শেষ করল।

রাত বাড়তে তুলসী বলল, চৈতন, গাছের ডালের সঙ্গে কাছাটা ভালো করে বেঁধে নে।

কেন, চৈতনদা?

ঘুমালে নীচে পড়ে যাবার ভয় থাকবে না।

শুধু চৈতনই নয়, তুলসীও ভালো করে নিজেকে ডালের সঙ্গে বাঁধল। কাঠের পাটাতনের ওপর শড়কি, বল্লম ইত্যাদি রেখেছিল, দরকার হলে যেন ব্যবহার করতে পারে।

এক এক মুহূর্ত যেন এক এক প্রহর।

ঘুমে চৈতনের চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, কিন্তু সে জোর করে চোখ খুলে রাখছে। যদি তন্দ্রার ফাঁকে পিতৃহন্তা চলে যায়।

থপ, থপ, থপ।

অনেক দূর থেকে তালে তালে শব্দ ভেসে আসছে। খুব ভারী কোন একটা জন্তু ধীর পদক্ষেপে এগোচ্ছে।

তুলসী বর্শা তুলে নিয়ে চুপচাপ বসল। তার দেখাদেখি চৈতনও শড়কি বাগিয়ে তৈরি হয়ে রইল।

ঝোপটা দুলে উঠল। তার পরই দেখা গেল।

না বাঘ নয়, বরাহ। যাকে বরা বলা হয়।

বিরাট আকৃতি। বিপুল শক্তির অধিকারী সেটা বোঝা যায়। মুখের দু'পাশে প্রকাণ্ড সাইজের দুটি দাঁত চাঁদের আলোয় চকচক করে উঠল।

বরাহ থপথপ করে এসে ডোবার জলে মুখ ডোবাল। জল খেয়ে কিছুক্ষণ কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে আবার জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চৈতন বোধ হয় একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ অনেকগুলো পায়ের শব্দে চমকে জেগে উঠল।

পরিপূর্ণ চাঁদের আলো। প্রায় গোটা পঞ্চাশ হরিণ। সঙ্গে অনেকগুলো বাচ্চাও আছে।

কেউ জল খাচ্ছে, কেউ কেউ আনন্দে ছুটোছুটি করছে, আবার কতকগুলো একজায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এমন চমৎকার একটা দৃশ্য তুলসীকে দেখাবার জন্য তাকে ডাকতে গিয়েই

NOT FOR SALE

চৈতন চমকে উঠল। ওপাশের ঝোপের কাছে যে হরিণের বাচ্চাটা দাঁড়িয়ে ছিল, সেটা অস্ফুট একটা চিৎকার করে কয়েক পা গিয়েই মুখ থুবড়ে পড়ল।

চৈতন আশ্চর্য হয়ে গেল।

কোন গোপন জায়গা থেকে কেউ কি তীর ছুঁড়েছে? বন্দুক হলে তার শব্দ শোনা যেত! কিংবা ঘাসের ওপর কেউ দড়ির জাল পেতে রেখেছে, তাতে পা আটকে বাচ্চাটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল?

বাচ্চাটার এরকম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাকী হরিণের দল দ্রুতবেগে ছুটে পালাল। কেবল একটি হরিণ ছাড়া।

সেই হরিণটি চক্রাকারে বাচ্চাটাকে ঘুরতে লাগল, আর মুখ দিয়ে করুণ একটা আওয়াজ করতে লাগল।

চৈতন বুঝতে পারল, এটা ঐ বাচ্চাটার মা। নিজের সন্তানকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

চৈতনের ভয় হল, এভাবে ঘুরতে ঘুরতে হরিণটাও হয়তো দড়ির জালে নিজের পা জড়িয়ে ফেলবে।

মনে মনে সে ঠিক করল, ভোর হলেই গাছ থেকে নেমে বাচ্চাটাকে জালমুক্ত করে দেবে।

হাতে চাপ লাগতেই চৈতন ফিরে দেখল তুলসী তার হাত চেপে ধরে নীচের দিকে ইশারায় কি দেখাচ্ছে।

চৈতন চেয়ে দেখল।

ঝোপ থেকে বিরাট আকারের একটা সাপ হেলেদুলে বের হচ্ছে। প্রসারিত ফণা। কুচকুচে কালো রং। মাঝে মাঝে চেরা জিভ দেখা যাচ্ছে।

কালনাগিনী। এর এক ছোবলেই যে কোন প্রাণী কয়েক মুহূর্তে শেষ হয়ে যাবে।

এবার বোঝা গেল, দড়ির জালে আটকে নয়, এই কালনাগিনীর বিষাক্ত ছোবলেই হরিণের বাচ্চাটি অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করেছে।

হঠাৎ হরিণের দল কান খাড়া করে ঘন হয়ে দাঁড়াল, তারপর পলকের মধ্যে জঙ্গলের ভিতর উধাও হয়ে গেল।

চাঁদের আলোর জন্য ভোর হয়েছে ভেবে দু' একটা পাখি ডাকছিল, তারা সব থেমে গেল।

কি আশ্চর্য, ঝিঁঝিঁর আওয়াজও স্তব্ধ!

চৈতন দেখল, ঠিক মরা হরিণটার সামনে বিরাট আকারের একটা বাঘ।

এর আগে চৈতন জীবন্ত বাঘ দেখেনি। বিশেষ করে আরণ্য পরিবেশে। গাঁয়ের অনেকে বাঘ মেরে বাঁশে বেঁধে শহরের থানায় নিয়ে গেছে, পুরস্কার পাবার লোভে। চার পা বাঁধা নিষ্প্রাণ বাঘ চৈতন দেখেছে। কিন্তু হাঁড়ির মতন

NOT FOR SALE

মুখ, হলদে পেশীপুষ্ট শরীরের ওপর কালো কালো ডোরা, চাঁদের আলোয় নীলচে জ্বলন্ত চোখ, এমন বিভীষিকা সে আর আগে কখনও দেখেনি।

বাঘটা হরিণের বাচ্চাটাকে কয়েকবার শুঁকল, তারপর পাশ কাটিয়ে ডোবার দিকে চলতে আরম্ভ করল।

তখনই চৈতনের মনে পড়ে গেল। পিতৃঘাতক সামনে দিয়ে এভাবে চলে যাবে!

সে পাশ থেকে বল্লমটা তুলে নিল, কিন্তু ছোঁড়বার আগেই বাধা পেল।

তুলসী তার হাত আঁকড়ে ধরেছে।

তুলসী ফিসফিস করে কানে কানে বলল, এটা সে বাঘ নয়। সেটা চোটখাওয়া খোঁড়া বাঘ। পা টেনে টেনে চলে। এটা বাঘিনী।

চৈতন বল্লম নামিয়ে রাখল।

বাঘিনীকে আর দেখা গেল না। জল খাওয়া শেষ করে বাঘিনী বোধ হয় ঝোপের ওপাশ দিয়ে চলে গেছে।

একটানা কাকের ডাকে চৈতনের ঘুম ভাঙল। কখন গাছের মোটা ডালে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তুলসী তখনও ঘুমাচ্ছে।

ভোর হয়েছে। চারদিকে বেশ আলো।

তুলসীকে চৈতন জাগিয়ে দিল।

গাছ থেকে নামতে গিয়েই থেমে গেল।

হরিণের বাচ্চাকে দেখা যাচ্ছে না। একপাল শকুনি তার ওপর বসেছে। ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটা কাকও মাংসে ঠোঁট বসাচ্ছে।

আধঘণ্টার মধ্যে সব শেষ। রক্তের ছিটে আর কয়েকটা হাড়ের টুকরো ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট রইল না।

চৈতন আর তুলসী সাবধানে গাছ থেকে নেমে পড়ল। ডোবা থেকে মুখ হাত ধুয়ে মুড়ি আর গুড় নিয়ে বসল।

বেশীক্ষণ নীচে থাকা নিরাপদ নয়। দিনের বেলায় বড় মিয়া যে আসবে না, এমন বলা যায় না। এটা তার রাজত্ব। যখন যেখানে খুশী বড় মিয়া চলে আসতে পারে, আর নাগালের মধ্যে এমন নধর দুটি মানবসন্তান পেলে তো তার আনন্দের সীমা থাকবে না।

কোনরকমে ডোবা থেকে স্নান সেরে দুজনে মাটি উঁচু করে উনান তৈরি করল। তার ওপর হাঁড়ি বসিয়ে চালে ডালে ফুটিয়ে নিল।

তুলসী বলল, এখন কোন ভয় নেই। ওই দেখ বানরের পাল কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে খেলছে। পাখিরা ডালে বসে কিচিরমিচির করছে। গাছের ফাঁকে দেখ হরিণের পাল চরে বেড়াচ্ছে। তার মানে বড় মিয়া ধারে কাছে নেই। বড় মিয়া এলে সব একেবারে চুপ হয়ে যায়। গাছের পাতাও বুঝি নড়ে না।

NOT FOR SALE

খাওয়া শেষ করে দুজনে আবার গাছের ডালে গিয়ে বসল।

চৈতন এদিক ওদিক দেখে বলল, তুলসীদা, গাছে যদি মা মনসার চর থাকে? কালকের মতন কালনাগিনী যদি ছোবল দেয়, তাহলে তো আর দেখতে হবে না।

তুলসী হাসল, বনের রাজত্বে কিছুই আশ্চর্য নয়। তবে সাপ ভয় না পেলে বা তাদের গায়ে পা না পড়লে তেড়ে এসে বিশেষ ছোবল দেয় না। কালকে হরিণের বাচ্চাটা নাচতে নাচতে নিশ্চয় তার গায়ের ওপর গিয়ে পড়েছিল।

চৈতন মনকে বোঝাল, ওসব ভেবে লাভ নেই। অজগর জঙ্গলে যখন এসেছে, তখন সব কিছু বিপদের জন্য তৈরি থাকতেই হবে। বনের নিয়ম হচ্ছে, সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। একটু অন্যমনস্ক হলেই বিপদ হতে পারে।

কথাটা চৈতন তার বাপের কাছে শুনেছিল।

বাপ নিশ্চয় সতর্ক হয়েই ঘোরাফেরা করছিল, কিন্তু পারল কি মৃত্যুকে ঠেকাতে?

আসল কথা হচ্ছে অদৃষ্ট। অদৃষ্টে যা লেখা থাকবে, তা ঘটবেই। কেউ রোধ করতে পারবে না।

দুপুর হল। হঠাৎ পাখির কলরব, বানরদের উল্লাস একেবারে থেমে গেল। একটা ছুঁচ পড়লেও শোনা যায় এমনই নিস্তব্ধতা।

চৈতন ভাবছিল একটু নীচে নামবে। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। ভুল করে মিঠে পানির কলসীটা গাছের তলায় রেখে এসেছে। কিন্তু আশপাশের অবস্থা দেখে থেমে গেল।

তুলসীর দিকে ফিরে দেখল সে শড়কি নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। চৈতনও বর্শাটা হাতে তুলে নিল।

দূর থেকে শোনা গেল মাটি আর ঘাসের ওপর থপ থপ করে শব্দ। কে যেন খুব ভারী একটা জিনিস টেনে আনছে।

একটু পরেই কাঁটাঝোপের পাশে দেখা গেল।

বিরাট আকারের বাঘ। ভীষণ দুর্গন্ধ বের হচ্ছে শরীর থেকে। জ্বলন্ত দুটি চোখ দিয়ে ডোবার দিকে নিরীক্ষণ করছে। একটু অপেক্ষা করে বাঘটা ডোবার দিকে চলতে আরম্ভ করল।

স্বাভাবিক গতি নয়, একটা পা টেনে টেনে চলেছে। চলতে যেন কষ্টই হচ্ছে।

চৈতনের দুটি চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। আর সন্দেহ নেই, এই সেই বাঘ। এই বাঘই তার বাপকে নিকেশ করেছে।

চৈতনের সারা শরীরের রক্ত যেন টগবগ করে ফুটতে লাগল। একবার ইচ্ছা হল, বর্শা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে এই নরখাদকের সামনে। পিতৃহন্তার মুখোমুখি দাঁড়াবে। যাই থাক অদৃষ্টে।

NOT FOR SALE

আবার মনের মধ্যে ভয়ের ছায়াও উঁকি দিতে লাগল। চৈতনের বাপকে যেভাবে শেষ করেছে, এ বাঘ চৈতনকেও সেভাবে খতম করে দেবে।

জন্তুটা কি অসীম বলশালী তা বোঝা যাচ্ছে তার পেশীবহুল দেহ দেখে। সূর্যের আলো শরীরের ওপর যেন পিছলে পড়ছে। বিরাট আকারের এক একটা থাবা।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে জল খেল। তারপর মুখ তুলে এদিক ওদিক দেখল। জিভ দিয়ে থাবা চাটল। একসময়ে আস্তে আস্তে উঠে এল।

ঠিক গাছটার নীচে দিয়ে যাবার সময় অঘটন ঘটল। তুলসীর হাত অসাবধানে গাছের ডালে লেগে খস করে শব্দ হল।

সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা চমকে ফিরে দেখল।

দুটো চোখে দুশো জোনাকির দীপ্তি। লাল জিভটা ধারালো দাঁতের সারির ফাঁক দিয়ে ঝুলে পড়ল। মোটা দড়ির মতন ল্যাজটা সবেগে আছড়াতে লাগল মাটির ওপর।

তুলসী আর চৈতন দুজনেই বুঝল এটা লাফাবার আগের অবস্থা।

যেখানে তারা বসে আছে, এত উঁচুতে, হয়তো নাগাল পাবে না। তবে গাছের নীচে যদি ধরনা দিয়ে বসে থাকে তাহলেই মুশকিল। দিনের পর দিন না খেয়ে দুজনকে মরতে হবে।

একটু পরেই বাঘটা লাফ দিল।

অতটা উঁচুতে পৌঁছাতে পারল না, কিন্তু প্রায় কাছাকাছি গাছের গায়ে নখ ফুটিয়ে কিছুক্ষণ ঝুলে রইল, তারপর গাছের বাকল খসে যেতে সশব্দে নীচে পড়ে গেল।

কিন্তু হাল ছাড়ল না।

একটু পিছিয়ে গিয়ে গুঁড়ি দিয়ে ল্যাজ আছড়াতে আছড়াতে আবার লাফ।

এবার আর একটু ওপরে। তারপরই আর্ত চিৎকারে বন কাঁপিয়ে ছিটকে মাটির ওপর পড়ে গেল।

তুলসী এমন সুযোগ ছাড়েনি।

হাতের শড়কিটা সবেগে তার মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়েছিল। মাথায় লাগেনি, শড়কিটা একটা চোখের মধ্যে গিঁথে দরদর করে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

অন্য যে কোন জন্তু হলে নির্ঘাৎ ভয়ে পালাত, কিন্তু সুন্দরবনের প্রভু অন্য ধাতুতে গড়া। শুয়ে পড়ে সামনের দুটো থাবা দিয়ে শড়কিটা আঁকড়ে ধরে টেনে বের করে ফেলল।

সারা মুখ রক্তে লাল। কিছুক্ষণ মাটিতে গড়াগড়ি দিল। ধুলোয় জায়গাটা অন্ধকার হয়ে গেল।

NOT FOR SALE

তারপর উঠে দাঁড়াল।

বোঝা যাচ্ছে একটা চোখে দেখতে পাচ্ছে না।

লেজটা সজোরে আছড়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে বিকট গর্জন করল।

ঠিক যেন প্রচণ্ড ভূমিকম্প হল। গাছপালা সব থরথরিয়ে কেঁপে উঠল।

তারপর আবার লাফ।

এবার আর একটু হলেই চৈতনকে ধরে ফেলত। বোধ হয় আধ হাত তফাৎ।

চৈতন খুব উত্তেজিত হয়েছিল। বর্শা হাতে তৈরি। গাছটা নড়ে উঠতেই টাল সামলাতে না পেরে একেবারে মাটিতে পড়ে গেল।

বাঘের থাবার আওতায়।

পড়ে গিয়েও চৈতন হাতের বর্শা ছাড়েনি। বাঘটা এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বর্শাটা বাঘের ডান চোখে ঢুকিয়ে দিল।

আবার প্রচণ্ড একটা হাঁক। বাঘটা মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

সেই সুযোগে চৈতন দ্রুত গাছের ওপর ওঠবার চেষ্টা করল, পারল না। চৈতন যখন কিছুটা উঠেছে তখন বাঘ লাফিয়ে তার কাঁধের ওপর এক থাবা বসাল।

চৈতন ছিটকে পড়ে গেল মাটির ওপর।

বাঘটা গন্ধ শুঁকে শুঁকে একেবারে চৈতনের দেহর ওপর এসে গেল। সারা মুখ রক্তে মাখামাখি। মনে হচ্ছে কোন চোখেই সে দেখতে পাচ্ছে না।

চৈতন চিৎ হয়ে পড়েছে। বাঘের জিভ থেকে লালা তার মুখের ওপর পড়ছে। উৎকট গায়ের গন্ধ। লালার সঙ্গে রক্তের ফোঁটাও ঝরে পড়ছে।

চৈতনের কাঁধের মাংস অনেকটা ছিঁড়ে গেছে বাঘের ধারালো নখের ঘায়ে। অসহ্য যন্ত্রণা। চৈতনের মনে হচ্ছে বাঘ দ্বিতীয়বার আক্রমণ করার আগেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।

ঠিক এই সময়ে তুলসী খানিকটা নেমে এসে ভোজালি আর রামদাটা ছুঁড়ে দিল চৈতনের হাতের কাছে।

বাঘ এমনভাবে চৈতনের ওপর দাঁড়িয়েছে, গাছের ওপর থেকে হাতিয়ার ছোঁড়ার খুব অসুবিধা। বাঘের গায়ে না লেগে হয়ত চৈতনের গায়েই লাগবে।

যন্ত্রণায় চৈতনের শরীর যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। বুকের ওপর পিতৃহন্তা দাঁড়িয়ে। পলকের জন্য তার বাপের কথা মনে গেল।

এই নরখাদক পিশাচ তার বাপের মাংস অস্থি মজ্জা চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছে। চৈতনের সংসারের একমাত্র উপার্জনশীল মানুষটাকে খতম করে সবাইকে সর্বনাশের পাথারে ডুবিয়েছে।

হয়তো চৈতন প্রাণে বাঁচবে না। বাঘে ছুঁলে বাঁচা দুষ্কর। বাঘের দাঁতে আর নখে বিষ থাকে। যেখানে আঁচড় কামড় বসায় সেখানটা বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

NOT FOR SALE

ভোজালি আর রামদা ঘাসের ওপর পড়ার শব্দে বাঘ একটু চমকে উঠল। যেদিকে শব্দ হয়েছিল, সেদিকে মুখটা ফিরিয়ে বাতাস শুঁকতে লাগল।

তার এই ক্ষণেক অন্যমনস্কতার সুযোগে চৈতন হাত বাড়িয়ে রামদাটা তুলে নিল, তারপর প্রাণপণ শক্তিতে দু' হাতে ধরে বাঘের মুখ লক্ষ্য করে আঘাত হানল।

মড়মড় করে হাড় ভাঙার শব্দ। রক্তে চৈতনের দেহ ভেসে গেল।

বাঘ আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে শূন্যে কিছুটা লাফিয়ে উঠে ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল।

মাটিতে পড়ে তার দেহটা কয়েকবার থরথর করে কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল। পা'গুলি প্রসারিত, ল্যাজ সোজা, জিভটা দাঁতের পাশ দিয়ে ঝুলে পড়ল।

এক হাতে কাঁধের ক্ষত চেপে ধরে চৈতন টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, তুলসীদা, শোধ নিয়েছি। প্রতিশোধ।

তুলসী গাছের ওপর থেকে সাবধান করে দিল, খবর্দার চৈতন, কাছে যাসনি, ব্যাটাদের বিশ্বাস নেই।

চৈতন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বেঁচে আছে এমন মনে হয় না। মাথা ফেটে দু'ফাঁক হয়ে গেছে। রক্ত আর ঘিলু বেরিয়ে আসছে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তুলসী গাছ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল।

আর ভয় নেই। বাঘটা মরে গেছে। তার মুখের ওপর বড় বড় একপাল নীল মাছি এসে বসেছে।

মোটা মোটা লতা ঝুলছে গাছের ডাল থেকে। তুলসী সেই লতা কেটে নিয়ে সেগুলো দিয়ে বাঘের চারটে পা শক্ত করে বাঁধল, তারপর দুজনে বাঘটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল।

কি আশ্চর্য, বানরগুলোর কি ফূর্তি! তারা চিৎকার করে আনন্দে দোল খেতে লাগল। পাখিগুলো আবার কিচিরমিচির শুরু করল। বাঘ যেন তাদেরও বিভীষিকা ছিল। শত্রু নিপাত হতে তারাও খুব খুশী।

তুলসী বাঘটাকে জলের ধারে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল, চৈতন বাধা দিল, না, ওদিকে নয়, এদিকে।

বাঘটাকে টানতে টানতে যেখানে সাদা নিশান পোঁতা ছিল, যেখানে মাটির তলায় চৈতনের বাপের আধখাওয়া শরীর শোয়ান ছিল তার ওপর নিয়ে এল।

চৈতন পাগলের মতন বাঘের রক্ত মাটির ওপর ছিটোতে ছিটোতে চেঁচাতে লাগল, বাবা গো, এবার তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও। বড় মিয়ার রক্তে তোমাকে চান করিয়ে দিচ্ছি।

NOT FOR SALE

কয়েকবার রক্ত ছিনিয়েই চৈতন মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বাঘের দেহের পাশাপাশি।

তুলসী কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সে ছুটে কাছে গিয়ে দেখল চৈতনের জ্ঞান নেই। তার কাঁধের ক্ষত থেকে প্রচুর পরিমাণে রক্ত বের হচ্ছে।

সর্বনাশ, এখন উপায়!

নৌকা ফিরতে ত বেশ কয়েকদিন দেরি। এই গভীর জঙ্গলে কি করে বাঁচাবে চৈতনকে।

ভাগ্য ভাল বলতে হবে।

এদিন ওদিক দেখতে দেখতে নজরে পড়ে গেল। রুপোলী চকচকে জলের ওপর ছোট কালো বিন্দু। তার মানে নৌকা।

তুলসী হাঁটু জলে নেমে পরনের কাপড় খুলে বাতাসে ওড়াতে লাগল। যদি নৌকার লোকদের চোখে পড়ে।

মনে হল, কালো বিন্দু যেন এদিকেই ফিরল। একটু একটু করে বড় হল বিন্দু।

পরিষ্কার পালতোলা নৌকা দেখা গেল।

তুলসী সমানে কাপড় উড়িয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে দুটো হাত মুখের ওপর রেখে চিৎকার করছে, ও মাঝির পো, এদিকে এস ভাই, এদিকে। বড় বিপদে পড়েছি।

কাছে আসতে বোঝা গেল মাছধরার নৌকা। জনচারেক লোক রয়েছে। একজন বুড়ো তামাক খাচ্ছিল, সেই কথা বলল, কিগো, ব্যাপারটা কি? সঙ্গের লোকজন কোথায়? তুমি তো মৌ-এর খোঁজে এসেছ, তাই না?

তুলসী সব বলল। বিস্তারিত ঘটনা।

তিনজন লোক লাফিয়ে ডাঙায় পড়ল। প্রথমে চৈতনকে তুলল। বুড়ো লোকটি বলল, আমার কাছে ওষুধ আছে লাগিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এতে হবে না, একে গোসাবার হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তবে ভয়ের কিছু নেই। আঁচড় খুব বেশী নয়।

শেষকালে বাঘটাকে নৌকায় তুলতে সবাই হিমশিম খেয়ে গেল। বুড়ো লোকটি অবাক হয়ে বলল, এ যে পেল্লায় বাঘ গো। বন্দুক ছাড়া এ বাঘ খতম করেছে, খুব বাহাদুর ছেলে বটে!

এটা থানায় দেখালে ইনাম মিলবে। করকরে পঞ্চাশটা টাকা কিংবা তার বেশীও হতে পারে।

—সমাপ্ত—

NOT FOR SALE

গ্রহ থেকে

টুনুকে তার বাবা মামার বাড়ি চালান করে দিল। এ ছাড়া আর উপায়ও ছিল না। ঠিক একমাস পরে টুনুর ম্যাট্রিক পরীক্ষা, আর শহরে গোলমাল শুরু হয়ে গেল।

গোলমাল বলে গোলমাল। শহরের লোকগুলো যেন সবাই এক সঙ্গে খেপে উঠল। সময়ে অসময়ে বোমার শব্দ, গলির মোড়ে একটা দুটো লাশ। আর সে সব লাশ প্রায়ই টুনুর বয়সী সব ছেলেদের।

টুনুর বাবাই বলল মাকে, শোন, এই আবহাওয়ায় টুনু পরীক্ষার পড়া তৈরি করবে কি করে? তুমি তোমার দাদাকে বরং লিখে দাও, এসে টুনুকে নিয়ে যাক।

মা আপত্তি করেছে, কিন্তু ওই অজ পাড়াগাঁয়ে টুনু থাকতে পারবে?

এছাড়া উপায় কি? দেখছ তো শহরের অবস্থা। পড়াশোনা করবে কি, তার প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে।

অতএব টুনু মামার সঙ্গে হরগোবিন্দপুরে এসে হাজির হ'ল। তাও কি একটুখানি পথ। ট্রেনে তিন ঘণ্টা, তারপর গরুর গাড়ীতে পুরো আড়াই ঘণ্টা। পথ নেই, শেষ ঘণ্টাখানেক শুধু মাঠের ওপর দিয়ে যাত্রা।

গরুর গাড়ী থামতে একটা টিমটিমে লণ্ঠন, গোটা তিনেক লোক টুনুকে অভ্যর্থনা জানাল।

তার মধ্যে একজন মামী, একজন মামাতো বোন আর শেষের লোকটি তুলসীচরণ। একাধারে চাকর, পাচক, মামার দেহরক্ষী।

বাড়ির মধ্যে ঢুকতে গিয়ে টুনুর গা ছমছম করে উঠল। পুরানো, শ্যাওলাপড়া, ইঁট বের করা একতলা। জমাট বাঁধা ঘুপসি আস্তানা। টুনুর মনে হয়েছিল বাড়িটা বোধহয় পাঠান আমলের। বহু শতাব্দীর ঝড় জল অত্যাচারে আজকের এই ভয়াবহ অবস্থা।

সেই মুহূর্তে টুনুর ইচ্ছা হয়েছিল চিৎকার করে কেঁদে উঠবে। না, মা বাবার জন্য নয়, আলোকিত শহরের জন্য। হোক সে খুনের শহর।

দিন সাতেকের মধ্যে টুনু অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে এল। ভোরবেলা উঠে পুকুরের পাড়ে সবুজ নারকেল গাছের গুঁড়ির ওপর বসে ছাই দিয়ে দাঁত মাজা। তারপর মামাতো বোনের আনা মুড়ি নারকেল সহযোগে চা। সে চায়ের রং আলকাতরার মতন, স্বাদে যেন পাঁচন।

NOT FOR SALE

তারপর কোণের ঘরে বই নিয়ে বসা। ইংরাজী, বাংলা, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, বীজগণিত, জ্যামিতি। পড়ার যেন আর শেষ নেই।

পুকুরে স্নান, দুপুরে খেয়ে নিয়ে একটু নিদ্রা, তারপর উঠে আবার পড়া। বিকালে তুলসীচরণের সঙ্গে গাঁয়ের পথে একটু হাঁটা। আবার হ্যারিকেনের আলোয় পড়তে বসা।

এর একটু এদিক ওদিক নেই। দিনের পর দিন এক রুটিন।

ওরই মাঝে একটু বৈচিত্র্যও দেখা যায়।

যেমন একদিন পড়তে পড়তে খসখস আওয়াজে টুনু চমকে উঠেছিল। প্রথমে ভেবেছিল, বাতাসে শুকনো পাতার শব্দ। কিন্তু শব্দটা যেন খুব কাছে।

মুখ তুলে দেখেই টুনুর শরীর হিম হয়ে গিয়েছিল। মাথার চুল সজারুর কাঁটার মতন খাড়া।

বাইরে থেকে জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকছে। দেয়াল বেয়ে। কালো কুচকুচে রং। বাঁশ পাতার মতন সরু চেরা জিভ। লাল রক্তকম্বলের মতন দুটি চোখ।

টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে টুনু প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করে উঠেছিল।

তার মামাতো বোন ছুটে ঘরে এসেছিল।

কি হল কি? টেবিলের ওপর দাঁড়িয়েছ কেন?

টুনু ভাল করে কথা বলতে পারেনি। জানলার দিকে আঙুল দেখিয়ে শুধু বলেছিল, সা-সাপ।

মামাতো বোন বিন্দু হেসে খুন।

জানলার কাঠে আস্তে আস্তে চাপড় মেরে বলেছিল, যা, যা, এখান থেকে। বাইরে কলসিতে যা।

আশ্চর্য কাণ্ড, সাপটা ঘুরে জানলা দিয়ে বাইরে চলে গিয়েছিল।

সাপটা চলে যেতে বিন্দু টুনুর দিকে ফিরে হি-হি করে হেসে বলেছিল, আরে ভয় কি। ওটা বাস্তু সাপ। কোন অনিষ্ট করে না। একজোড়া আছে।

টুনুর ভয় ভাঙে নি। বাবা, একটাতেই রক্ষা নেই, আবার একজোড়া।

একটু একটু করে সব ঠিক হয়ে গেল। ক্রমেই পড়ার চাপ বাড়তে টুনুর অন্য কোনদিকে আর নজর দেবার সুযোগই হল না। অন্য বিষয়গুলো যাওবা একটু তৈরি হয়েছে, ইতিহাস নিয়ে টুনু অথই জলে পড়েছে। বিশেষ করে কয়েকটা ব্যাপার।

বাবর আর হুমায়ূন, কে বাপ আর কে ছেলে কিছুতেই মনে রাখতে পারে না। তাজমহল মমতাজের স্মৃতিচিহ্ন না নূরজাহানের গোলমাল হয়ে যায়। তাছাড়া ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেছিল শের শাহ, এ কথাটার অর্থ টুনু ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তার মানে শের শাহের আগে কি ঘোড়া ডাকত না?

NOT FOR SALE

উপায় নেই, পরীক্ষা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। এখানে পড়ার অনন্ত অবসর। বাড়ি ফাঁকা। কোন গোলমাল নেই।

ভোরবেলা মামা বেরিয়ে পড়ত। মাইল চারেক দূরে তার জমি। চাষীরা চাষ করত, মামা করত তদারক। ধান, পাট আর তামাক। টুনু বুঝতে পারে না এম-এস্‌-সি পাশ মামা চাষবাস করে কেন?

মামা যখন বাড়ি ফিরত তখন চারদিক অন্ধকার। দাওয়ায় বসে কিছুক্ষণ ভুরুক ভুরুক করে তামাক খেয়ে তারপর খেতে বসত।

সারাটা দিন মামী আর মামাতো বোন বিন্দু কাজে ব্যস্ত। দুবেলা খাবার সময় শুধু তাদের সঙ্গে দেখা হ'ত।

টুনুর পড়ার ঘর একেবারে কোণের দিকে। সেটা তার শোবার ঘরও। ছেলেপিলেদের হৈ হল্লা নেই, শহরের চেঁচামেচি নয়, একেবারে নিঃঝুম।

রাতের বেলা অবশ্য নানারকম শব্দ শোনা যায়। পেঁচার চীৎকার, ঝিঁঝিঁর আওয়াজ, প্রহরে প্রহরে শিয়ালের ডাক।

এসব এখন টুনুর গা-সহা হয়ে গেছে। তাছাড়া পড়ার মধ্যে মন চলে গেলে চারপাশের আওয়াজ কানেই আসে না।

একরাতে কিন্তু সব কিছু পাল্টে গেল।

পড়ার বই থেকে মুখ তুলে জানলা দিয়ে দেখেই টুনু আর মুখ ফেরাতে পারল না।

জানালার বাইরে আকন্দ, রাংচিতা, ফণীমনসার ঝোপ। তারপর অনেকটা জুড়ে জলা জায়গা। দিনে বকের পাল ঘুরে বেড়ায়, রাতের বেলা মনে হয় কে যেন বিরাট একটা শ্লেট পেতে রেখেছে।

সেই কালো শ্লেটের বুকে দপ করে আলো জ্বলে উঠল। তীব্র আলো। মনে হল এক সঙ্গে বুঝি চল্লিশটা টর্চ টিপে কেউ সংকেত করছে।

টুনু বই ছেড়ে জানলার ধারে সরে এল।

আলোটা আর নেই। জমাট কালো অন্ধকার।

আটটা বাজলেই গ্রাম নিশুতি। এত রাতে কে এমনভাবে আলো জ্বালবে। বিশেষ করে এত জোরালো আলো।

জানলা থেকে সরে আসতে গিয়েই টুনু দাঁড়িয়ে পড়ল।

আবার সেই আলো। একই রকম কিন্তু ঠিক এক জায়গায় নয়। একটু যেন সামনে সরে এসেছে।

শুধু আলো নয়, আলোর সামনে খোঁচা খোঁচা চুল, বেঁটে চেহারার গোটা তিনচার প্রাণী সবেগে মাথা নাড়ছে।

ভাল করে কিছু বোঝবার আগেই দপ করে আলো নিভে গেল।

আধ ঘণ্টার ওপর দাঁড়িয়ে থেকেও টুনু আর আলো দেখতে পেল না।

NOT FOR SALE

টুনু পড়ার টেবিলে ফিরে দু গালে দুটো হাত দিয়ে বসে রইল।

বাবর, জাহাঙ্গীর, হুমায়ুন যে যার কবরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। শের শাহ আর তার ঘোড়ার ডাক নিশ্চিহ্ন। এমন কি বীজগণিত, জ্যামিতি সব বেমালুম চাপা রইল বইয়ের স্তূপের মধ্যে।

নতুন চিন্তায় টুনুর মন আলোড়িত হতে লাগল।

আচমকা এই আলোর দীপ্তি। তার পাশে খর্বকায় লোকদের ইশারা। কি হতে পারে?

কোন শত্রুর গুপ্তচর এভাবে সংকেত করছে।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কথাটা মনে হল।

জানলার দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখল, অনেক দূরে আলোর ক্ষীণ বিন্দু। জ্বলে উঠেই নিভে গেল।

বেশ কিছুদিন আগে শহরের সব কাগজে বের হয়েছিল। আনন্দবাজারে তো ছিলই।

উড়ন্ত চাকী, উড়ন্ত চাকী। দেশ বিদেশে নানা বয়সের লোক বিভিন্ন সময়ে এই উড়ন্ত চাকী দেখেছে।

পিরীচের মতন আকাশের একদিক থেকে বিদ্যুৎগতিতে আর এক দিকে ছুটে চলে গেল। পলকের মধ্যে অদৃশ্য।

দু একজন আবার বেশীও দেখেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এক চাষী চাষ করতে করতে দেখল তার মাঠের মাঝখানে পাতলা নীল পোশাকপরা অদ্ভুতদর্শন একটি লোক এদিক ওদিক দেখছে। চাষীর দিকে নজর পড়তেই ছুটে একটা গাছের নীচে চলে গেল। আর তাকে দেখা গেল না।

ইরানে প্রায় একই ব্যাপার। একজন ক্লান্ত পথিক পথের ধারে বিশ্রাম করছিল, হঠাৎ দেখল, পাহাড়ের গা বেয়ে দুজন ছোট্ট মানুষ, লম্বায় দু ফিটের বেশী নয়, তর তর করে নেমে আসছে। কিছুটা নেমে তার দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর ঝোপের পিছনে হারিয়ে গেল।

পথিক ছুটে তন্ন তন্ন করে ঝোপ অনুসন্ধান করল। কেউ নেই, শুধু ঝোপের সবুজ পাতাগুলো আগুনে ঝলসে যেন লালচে হয়ে গেছে।

পত্রিকাগুলো মন্তব্য করেছিল, খর্বকায় এই লোকগুলো নিঃসন্দেহে অন্য গ্রহের বাসিন্দা। আমরা যেমন অন্য গ্রহ সম্বন্ধে আগ্রহী, তারাও তাই। পৃথিবীতে নেমে এখানকার জল হাওয়া, মাটির অবস্থা, লোকের হালচাল নিরীক্ষণ করে।

কারো দেখা পেলেই অদৃশ্য বায়ুযানে মিলিয়ে যায়।

পত্রিকাগুলো এও লিখেছে।

NOT FOR SALE

এরা বোধহয় এসেছে মঙ্গল গ্রহ থেকে, কারণ একমাত্র মঙ্গলগ্রহে এ পর্যন্ত জলের চিহ্ন দেখা গেছে। জল আছে বলেই, জীবন থাকা সম্ভব।

টুনু ঠিক করে ফেলল, আজ সে যাদের মাথা নাড়তে দেখেছে তারা নির্ঘাৎ মঙ্গল গ্রহ থেকে ঘুমন্ত এই গ্রামের ওপর নেমেছে! তারা কল্পনাও করতে পারেনি, এই পৃথিবীর এক কিশোর তাদের হালচালের ওপর নজর রেখেছে।

টুনু মতলব করল, দিনে যতটা সম্ভব পড়ে নেবে, আর রাত্রে মঙ্গলগ্রহের এই প্রাণীগুলোর ওপর নজর রাখবে। ওই আলোটা আর কিছু নয় জ্বলন্ত হেলিকোপ্টার জাতীয় কিছু। অন্ধকার কক্ষপথে পথ দেখানোরও কাজ করে।

আনন্দে টুনুর নাচতে ইচ্ছা করল।

পড়াশোনার হয়তো একটু ক্ষতি হবে। তা হোক। ম্যাট্রিক পাশ করে কে আর দিগ্বিজয়ী হয়েছে। তার চেয়ে এমন একটা আবিষ্কারের ব্যাপার যদি ফলাও করে কাগজে ছাপাতে পারে, বিশদ বিবরণ দিয়ে, তাহলে টুনুকে ঘিরে বিজ্ঞানীদের ভিড় জমে যাবে। কাগজে কাগজে তার ফটো ছাপা হবে।

তার ওপর কোনরকমে যদি ওই খুদে চেহারার অন্তত একটা বাসিন্দাকেও খাঁচার মধ্যে পুরতে পারে, তাহলে তো কথাই নেই। সারা পৃথিবী টুনুকে নিয়ে লোফালুফি করবে।

মুখে বললেও সে রকম কিছু করতে টুনুর সাহস হল না। বিজ্ঞানে ওরা যথেষ্ট এগিয়েছে। খাঁচা চাপা দিতে গেলে এমন অস্ত্র টুনুর গায়ে ছুঁইয়ে দেবে যে টুনু কালো তরল পদার্থ হয়ে যাবে।

পরের দিন মামী দেখে বলবে, ওমা, এখানে গুড় ফেলল কে? বলেই ন্যাতা দিয়ে মুছে নেবে।

সারাটা রাত টুনুর ঘুম হল না। এপাশ আর ওপাশ করল।

মাঝে মাঝে উঠে জানলা দিয়ে দেখল। কোথাও একটু আলো নেই।

ভোরে উঠেই টুনু স্থির করল, এসব গোপন কথা কাউকে বলবে না। আরও কিছু দিন মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দাদের আনাগোনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে, তবে সব কিছু ফাঁস করবে।

কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টুনু ছটফট করতে লাগল।

কাউকে কথাটা বলতে না পারলে তার পেট ফেটে যাবার দাখিল।

এতবড় একটা কথা কাকেই বা বলবে!

মামা ভোরবেলা থেকে বাড়িছাড়া। মামীর বেশীর ভাগ সময় কাটে রান্নাঘরে। বাকি থাকে বিন্দু।

টুনু ঠিক করল কথাটা বিন্দুকে বলবে।

বিন্দু যখন ঘর মুছতে এল, তখন টুনু বলল, বিন্দুদি একটা কথা আছে।

NOT FOR SALE

আমার সঙ্গে? কি কথা?

জান তো, আমাদের পৃথিবী যেমন গ্রহ, তেমনই আশে পাশে আরও অনেক গ্রহ আছে। মঙ্গল, শুক্র, হার্সেল, বৃহস্পতি।

বাধা দিয়ে বিন্দু বলল, ওমা, তা আবার জানি না। গ্রহ কম আছে নাকি! মা তো কথায় কথায় বলে, কোন গ্রহ আমি সামলাব! বাবা বলে, গ্রহের ফের চলেছে।

টুনু তর্ক করল না। তর্ক করলে আসল কথা বলা হবে না।

তাই সে বলল, ওই সব গ্রহে প্রাণী আছে। মানে আমাদের মতন প্রাণী।

এবার বিন্দু মেঝের ওপর বসে পড়ল।

উৎসাহিত হয়ে টুনু বলতে লাগল।

প্রাণী আছে বটে কিন্তু দেখতে আমাদের মতন নয়। ছোট ছোট চেহারা। মাথায় লোহার মতন শক্ত শক্ত চুল। তুমি শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবে কোন একটা গ্রহ থেকে অদ্ভুত চেহারার সব প্রাণী তোমাদের গাঁয়ে নেমেছে।

আমাদের গাঁয়ে? বিন্দুর দুটো চোখ বিস্ফারিত।

হ্যাঁ বিন্দুদি, শুধু তোমাদের গাঁয়ে নয়, এই পিছনের মাঠে। আমি কাল রাত্রে স্বচক্ষে দেখেছি। একবার নয়, বার দুয়েক। জ্বলন্ত একটা প্লেন এসে নামল। তারপর খুদে খুদে সব লোকেরা বের হল সেটা থেকে।

বিন্দু উঠে দাঁড়াল। তুমি নিজের চোখে দেখেছ?

আলবত। তুমি রাত্রে যদি এ ঘরে আস তোমাকেও দেখাব। এই জানলা দিয়ে স্পষ্ট দেখা যায়।

টুনুর কথা শেষ হবার আগেই বিন্দু ছুটে বেরিয়ে গেল।

টুনু গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল।

এত বড় একটা আবিষ্কারের ব্যাপার পৃথিবীর লোককে কি করে সে জানাবে। এমন ব্যাপার হবে জানলে, সে নিজের ক্যামেরাটা নিয়ে আসত। কয়েকটা ফটো তুলে নিতে পারলে কেউ অবিশ্বাস করতে পারত না।

টুনু যখন চিন্তায় বিভোর, তখন আচমকা পিছন থেকে কে তাকে জাপটে ধরল।

প্রথমে টুনু ভাবল অন্য গ্রহের বাসিন্দারাই কেউ হবে, কিন্তু একটু পরেই বিন্দুর চিৎকারে তার সম্বিত ফিরে এল।

ভাল করে ধরে থাক মা, আমি তেলটা মাথায় ঢেলে দিই।

তারপরই মামীর গলা, আহা রাতদিন পড়ে পড়ে বাছার আমার মাথাটাই বিগড়ে গেছে গো, নইলে এরকম আবোল তাবোল কথা বলে! মধ্যমনারায়ণ তেলে পাগলেরও মাথা ঠাণ্ডা হয়। দে বিন্দু, একটু বেশী করে ঢেলে দে।

NOT FOR SALE

হড় হড় করে টুনুর মাথায় তেলের স্রোত নামল। গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবার যোগাড়। বহু কষ্টে সে বমি সামলাল।

টুনু অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে ছাড়াতে পারল না। মামীর বজ্রবন্ধন। বিন্দুও রীতিমত জোরে চেপে ধরেছে।

নিরুপায় হয়ে টুনু বসে রইল।

সেই তেল কপাল বেয়ে গালের ওপর। সেখান থেকে টপটপ করে শরীরে। রাগে, দুঃখে, অপমানে টুনুর দু চোখ জলে ভরে গেল।

টুনু একবার ভাবল, সারাদিন কিছু খাবে না। চুপচাপ এইভাবে বসে থাকবে।

তারপর তার মনে পড়ে গেল বিজ্ঞানের সাধনায় অনেক বাধা। যুগে যুগে দেশে দেশে বহু বিজ্ঞান সাধককে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, মৃত্যুও বরণ করতে হয়েছে।

আজ যারা এরকম ব্যবহার করছে, ভাবছে, টুনুর মাথায় গোলমাল হয়েছে, তারাই একদিন ফুলের মালা নিয়ে টুনুর কাছে এসে দাঁড়াবে।

অনেকক্ষণ ধরে টুনু সাবান ঘসে ঘসে স্নান করল। সাবান ফুরিয়ে গেল, কিন্তু গন্ধ বিশেষ কমল না। গম্ভীর হয়ে খাওয়া দাওয়া সারল। কারও সঙ্গে বিশেষ কথা বলল না। তবে বুঝতে পারল, বিন্দুদি আর মামী তাকে কেমন সন্দেহের চোখে লক্ষ্য করে যাচ্ছে।

সারা দুপুর টুনু বসে বসে পড়ল। এ ছাড়া উপায় নেই। আজ সারা রাত জেগে বসে থাকবে। অন্য গ্রহের বাসিন্দারা যদি নামে, তবে তাদের হালচাল নোট করবে।

রাতের খাওয়া তাড়াতাড়ি সেরে টুনু জানলার ধারে বসল। একটা বই দিয়ে হ্যারিকেনটা আড়াল করল, যাতে আলোর রেখা বাইরে কোথাও না পড়ে। কি জানি কাছাকাছি আলো দেখলে গ্রহের বাসিন্দারা সাবধান হয়ে যেতে পারে।

বরাত টুনুর।

একটু পরেই আলোর ঝলক দেখা গেল। সেই সঙ্গে খাড়াচুল বেঁটে চেহারার বাসিন্দাদের মাথা নাড়া।

টুনু উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল। আজকের আলো খুব তীব্র। একবার নিভেই দপ করে আবার জ্বলে উঠল!

এ দৃশ্য টুনু কাকে ডেকে দেখাবে। ভাবল মামী কিংবা বিন্দুদিকে ডেকে আনবে। তারা নিজের চোখে দেখুক।

কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে মামার কাশির শব্দ কানে এল। খাওয়ার পর মামা দাওয়ায় বসে অনেকক্ষণ তামাক খায়।

চেঁচিয়ে মামাকে ডাকতে টুনুর সাহস হল না। কি জানি যদি গ্রহের

NOT FOR SALE

বাসিন্দাদের কানে আওয়াজ যায়। তারা কোন রকম আলোর রশ্মি ফেলে টুনুকে ছাই করে দেয়।

তাই টুনু ঘর থেকে বেরিয়ে মামার পিছনে গিয়ে আস্তে আস্তে ডাকল, মামা, শিগ্‌গির। দেরি ক'র না।

হুঁকো সরিয়ে মামা উঠে দাঁড়াল। কিরে সাপ নাকি?

টুনু কোন উত্তর না দিয়ে মামার হাত ধরে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল।

জানলার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, বাইরে দেখ।

মামা দেখল। জমাট অন্ধকার। মাঝে মাঝে শুধু জোনাকির জ্বলা-নেভা।

টুনু মনে মনে কপাল চাপড়াল। হায়রে মামাকে কিছুই দেখানো গেল না।

মামা জিজ্ঞাসা করল, কি দেখব কি বাইরে? শেয়াল টেয়াল দেখেছিস, না কি?

না, না, টুনু মাথা নাড়ল, তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না মামা। আমি স্পষ্ট দেখেছি, অন্য গ্রহ থেকে একটা জ্বলন্ত যান ওইখানে নামে আর বেঁটে বেঁটে খাড়াচুল বাসিন্দারা মাথা নেড়ে ইশারা করে।

অ্যাঁ? মামা অবাক হয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে দূরে আবার আলোর দীপ্তি। খাড়াচুল বেঁটে লোকগুলো মাথা দোলায়।

ওই দেখ মামা, নিজের চোখে দেখ।

মামা দেখল। বারবার তিনবার আলো জ্বলে উঠল আর নিভল।

দেখা শেষ করে মামা হো হো করে হেসে উঠল। এত জোরে যে বিন্দু আর মামী ঘুম ছেড়ে উঠে টুনুর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

মানে, তুমি একে শহরের ছেলে তার ওপর বিজ্ঞানের ছাত্র নও, তাই আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারনি। ওদিকটা জলা। আমরা বলি ভৈরবের জলা। ওইসব জলা জায়গায় ওই রকম গ্যাস দেখা যায়। মিথেন গ্যাস। তার সঙ্গে ফসফিন যোগ হলেই ওই রকম জ্বলে ওঠে।

টুনুর মুখটা কালো হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে সে আমতা আমতা করে বলল, কিন্তু ওই বেঁটে খাড়া চুল মানুষগুলো?

মামা আবার হাসিতে ফেটে পড়ল।

ওগুলো মোটেই ভিন্ন গ্রহের বাসিন্দা নয়। তালগাছের চারা। এক সঙ্গে গোটা চার পাঁচ। আলেয়ার আলোয় ওরকম দেখাচ্ছে, আর বাতাসে পাতাগুলো নড়ছে বলে, তুমি ভাবছ, মাথা নেড়ে ইশারা করছে। কাল সকালে তুমি নিজে গিয়ে দেখে এস। তা হলেই আমার কথা সত্যি না মিথ্যা বুঝতে পারবে।

এবার শুধু মামা নয়, মামার সঙ্গে মামী আর বিন্দুও খিল খিল হেসে উঠল।

—সমাপ্ত—

NOT FOR SALE

শিকার

অফিস-ফেরত লোকনাথ ছুটে এসে চলন্ত ট্রাম গাড়ির পাদানীতে পা রেখেই চোখে অন্ধকার দেখল। গলা আর বুকে অসহ্য জ্বালা, মনে হল যেন তরল আগুনের স্রোত।

চোঁয়া ঢেঁকুর। অম্বলের লক্ষণ।

শরীরের দিকে চিরকাল লোকনাথের খুব নজর। ভিটামিন ছাড়া কিছু ছোঁয় না। অফিসে টিফিন করে শসার কুচি আর টম্যাটো। সকালে চা নয়, চেরোতার জল, আদা আর নুন। ভোরবেলা আর সন্ধ্যাবেলা আসন করে। একবার অফিসে সহকর্মীদের অনুরোধে চেয়ারে ময়ূরাসন দেখাতে গিয়ে মুশকিলে পড়েছিল। খোদ বড় সায়েব একেবারে মুখোমুখি। ময়ূরের প্রাণ যাবার দাখিল। বড় সায়েব গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, সরকার, অফিসটা সার্কাস দেখানোর জায়গা নয়, তার জন্য হাওড়ার ময়দান আছে।

এমন একটা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকে সার্কাস বলে উপহাস করায় লোকনাথ মনে মনে খুব চটেছিল কিন্তু চাকরি যাবার ভয়ে টুঁ শব্দটি করেনি। কেবল পরে সহকর্মীদের বলেছিল, আরে এসবের মর্ম ওরা কি বুঝবে। এসব হচ্ছে গুহ্যযোগ। হিমালয়ের গুহার আমদানী।

কণ্ডাকটর যখন টিকেট চাইতে এল, তখন আর একবার। বিশ্রী ঢেঁকুর। লোকনাথের মনে হল বুকটা পুড়ে বুঝি ছাই হয়ে গেল।

বাড়ির কড়া নাড়বার সময় আবার সেই ঢেঁকুর। এতক্ষণ লোকনাথ শুধু চিন্তিত ছিল এবার রীতিমত শঙ্কিত হ'ল।

আধ ঘণ্টায় তিনবার চোঁয়া ঢেঁকুর খুবই আশঙ্কার কথা। তার মানে অম্বল রোগটা শরীরে বেশ চেপে বসবার চেষ্টা করছে। আর নিস্তার নেই।

মনে মনে লোকনাথ একবার খাওয়ার হিসাব করল। না কোন অনিয়ম হয়নি, কোন অনাচার নয়। কোন্ ছিদ্র পথে এমন একটা মারাত্মক রোগ শরীরে ঢুকল, ভেবেও লোকনাথ কূল পেল না।

বাড়ির মধ্যে ঢুকেই লোকনাথ স্ত্রীকে বলল, কিচ্ছু খাব না। শরীর খুব খারাপ।

আজ ষোল বছর বিয়ে হয়েছে, একটি দিনের জন্যও লোকনাথের স্ত্রী শোনেনি তার স্বামীর একটু মাথা ধরেছে বা জ্বর হয়েছে। এখনও নিয়মিত ব্যায়াম করে।

NOT FOR SALE

কি হ'ল গো শরীরে? লোকনাথের স্ত্রী ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

আর কি, যাবার দাখিল। অম্বল ঢুকেছে দেহে। ও থেকে হেন রোগ নেই যে হয় না।

অম্বল?

হ্যাঁ, বার তিনেক, বলতে বলতে লোকনাথ মুখটা বিকৃত করল। আবার একটা ঢেঁকুর। আরও উগ্র, আরও দীর্ঘস্থায়ী।

বার চারেক চোঁয়া ঢেঁকুর উঠেছে। লোকনাথ সংশোধন করে বলল।

তাতে আর কি হয়েছে। আজকাল যা ভেজালের কারবার। কোথা থেকে কি হয়ে গেছে। একটু যোয়ানের আরক খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।

তাই হ'ল। মুখ হাত ধুয়ে লোকনাথ তক্তপোশে বসল। তার স্ত্রী যোয়ানের আরক নিয়ে সামনে দাঁড়াল।

দাও, হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা মুখে ঢালতে গিয়েই বিপত্তি। যোয়ানের আরক জিভে পড়া মাত্র, আবার ঢেঁকুর। এবার আরও সশব্দ, আরও প্রচণ্ড।

ফলে যোয়ানের আরকের সবটুকু লোকনাথের মুখ থেকে তার স্ত্রীর মুখের ওপর গিয়ে পড়ল। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে বিরক্ত গলায় স্ত্রী বলল, তোমার কি সবই বিশ্রী? ঢেঁকুর তোলার আর সময় পেলে না!

কি যে কথা বল, লোকনাথ নিস্পৃহ গলায় বলল, ঢেঁকুর কি আর আমি কনট্রোল করছি, যে সময়মত তুলব আর নামাব।

জামাটা গায়ে দিয়ে লোকনাথ বেরিয়ে পড়ল। খুব লম্বা খানিকটা হাঁটতে পারলে অম্বল কিছুটা কমতে পারে।

প্রায় পৌনে চার মাইল হাঁটার পর একটু যেন স্বস্তি পেল লোকনাথ। গলির মোড়ের রোয়াকে পাড়ার আড্ডা বসেছে, সেখানে গিয়ে দাঁড়াল।

কি খবর লোকনাথ? পাড়ার সরকারী খুড়ো জিজ্ঞাসা করলেন।

আজ্ঞে ভাল! বিকেলের দিকে একটু অম্বলের মতন হয়েছিল, এখন লম্বা হেঁটে অনেকটা ভাল বোধ...

কথা শেষ হবার আগেই লোকনাথ চোখ মুখ কোঁচকাল। আবার চোঁয়া ঢেঁকুর। সমস্ত শরীর গুলিয়ে উঠল। কষ্টে লোকনাথ বমির বেগ সামলাল।

সর্বনাশ, খুড়ো চোখ কপালে তুললেন, ভাল আর কোথায়? আহা, হা, এই বয়সেই পাজী রোগে ধরল! আমার এক ভগ্নীপোতের এই রোগ হয়েছিল। দশাসই চেহারা ছিল, মাস তিনেকের মধ্যে একেবারে প্যাঁকাটি। এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবরেজী, হকিমি কিছু আর বাকি রাখেনি।

এখন কেমন আছেন? সাগ্রহে লোকনাথ জিজ্ঞাসা করল।

খুব ভাল। জুতসই হয়ে বসে খুড়ো উত্তর দিলেন।

কিসে সারল?

NOT FOR SALE

হুঁ, এ সারবার রোগ কিনা। ভগবান কোলে তুলে নিলেন, তাতেই রোগ নিরাময় হ'য়ে গেল।

খুড়োর কথার সঙ্গে সঙ্গে লোকনাথ রোয়াকের ওপর বসে পড়ল।

খুড়ো তখনও থামেননি, ঠিক এই এক ব্যাপার। প্রথমে মাঝে মাঝে চোঁয়া ঢেঁকুর। তারপর অজীর্ণ রোগ, অগ্নিমান্দ্য। মাথার চুল উঠে যেতে লাগল। মুখে, গালে, কপালে রেখা পড়তে লাগল। চব্বিশ বছরের জোয়ান কদিনে পঁয়তাল্লিশ বছরের মতন চেহারা হ'য়ে গেল। মনে শান্তি নেই, রাতে ঘুম নেই, সে এক জীবন্মৃত অবস্থা।

এর কি কোন প্রতিকার নেই? লোকনাথ করুণ গলায় জিজ্ঞাসা করল।

কই আর। খুড়ো নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে উত্তর দিলেন, তবে যত দিন আছে, ইহলোকের কাজগুলোর একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে যাও। বৌমা আর ছেলের ব্যবস্থা। কোথাও ধার দেনা থাকলে শোধ করে যাও। কারুর কাছে কিছু পাওনা থাকলে, আদায় করার চেষ্টা কর। আর কি বলব লোকনাথ, তোমায় ছেলের মতনটি ভালবাসতাম। আপদে বিপদে তোমার জন্য করেওছি অনেক, আমার জন্য যা বিচার হয় করে যেও।

লোকনাথ উঠে এল। রাত্রেও কিছু খেল না। সারারাত ছটফট করল বিছানায়। মাঝরাতে হরিধ্বনি শুনে চমকে উঠে বসল। নিজের সর্বাঙ্গে হাত দিয়ে দেখল। না, সে নয়, অন্য কাউকে নিয়ে যাচ্ছে লোকেরা। ঈশ্বর জানেন এও অম্বলের রোগী কি না।

পরের দিন অফিসে গিয়েই লোকনাথ কথাটা বলল। কেউ যদি কোন ওষুধ বাতলাতে পারে। মাদুলি, তাবিজ, শিকড়, যা হোক কিছু।

বড়বাবু নন্দলালবাবুই কথাটা প্রথম বললেন, এর ওষুধ কিছুই নেই, একমাত্র উপায় চেঞ্জে যাওয়া। ভাল জায়গা বেছে চলে যাও। তবে কাউকে সঙ্গে নিয়ে নয়, একেবারে একলা। স্ত্রী পুত্র সঙ্গে গেলেই, চিন্তা সঙ্গে যাবে। চিন্তাই হ'চ্ছে এ অসুখের মূল কারণ।

লোকনাথের মনে পড়ে গেল, তার পকেট-ডায়েরীতে ভারতবর্ষের একটা ম্যাপ আছে। সেটা খুলে টেবিলের ওপর রেখে নন্দলালবাবুকে বলল, একটা ভাল জায়গা বেছে দিন না দাদা। গরীবের প্রাণটা বাঁচান।

নন্দলালবাবু আড় চোখে একবার ম্যাপটার দিকে নজর বুলিয়ে বললেন, ভুবেনেশ্বর ভাল জাগয়া। সেখানে যেতে পার। এখন অবশ্য আর ততটা ভাল নেই। নাক্স ভমিকা গাছ সব কেটে ফেলে সরকার সর্বনাশ করেছেন। তবু, অম্বলের পক্ষে এখনও খুব উপকারী। এই তো মাস ছয়েক আগে আমার এক শালা গিয়েছিল। মাস খানেকের মধ্যে এমন অবস্থা হ'ল যে কোন হোটেল আর তাকে রাখতে চায় না।

NOT FOR SALE

সেকি?

আরে হ্যাঁ, চার গুণ খাওয়া বেড়ে গেল। হোটেলের মালিকদের পোষাবে কেন। সবাই মিলে রেল ভাড়া দিয়ে তাকে কলকাতায় ফেরত পাঠিয়ে দিল। এখানেও মুশকিল। আমার শ্বশুর মশাই পেরে উঠলেন না। এখন ছোকরা তার শ্বশুরবাড়িতে আছে। সেখানেও তার শ্বশুরের দারুণ ধার দেনা হয়ে গেছে। বাড়ি বিক্রির খদ্দের খুঁজছেন।

বলেন কি? লোকনাথ আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট কুঁচকে বিশ্রী একটা ঢেঁকুর। কালোয়াতী ঢংয়ে।

অন্নদাচরণ টাইপিস্ট। লোকনাথের বয়সী। সব কথাতে তার ফোড়ন দেওয়া স্বভাব।

আরে দূর, ভুবনেশ্বর আবার একটা জায়গা। এসব রোগের জন্য চুণার যাওয়া উচিত। অম্বলের একেবারে যম। জলে লোহা, বাতাসে লোহা, মাটিতে লোহা। লোহার চাপে অম্বল গুঁড়িয়ে চূর্ণ হ'য়ে যায়। চূর্ণ করে বলেই জায়গার নাম চূণার।

চূণার? লোকনাথ অন্নদাচরণের দিকে ঘুরে বসল।

হ্যাঁ, এই তো আমার পিসতুতো ভাই গিয়েছিল সেখানে। কিচ্ছু হজম হত না। যা খেত, তাইতেই অম্বল। এমন কি কলমি শাকের ঝোল খেয়েও ঢেঁকুর। বোধ হয় মাস ছয়েক ছিল। একদিন দুপুরে পিসেমশাইয়ের কাছে এক রেজিস্টার্ড পার্শেল। খুলেই অবাক। আমার সেই পিসতুতো ভাইয়ের শার্ট আর প্যান্ট। পরে হোটেলের ম্যানেজারের চিঠিতে জানতে পেরেছিলেন, বাকি সব হজম হয়ে গেছে।

সমস্যার কোন সমাধান হ'ল না।

আসল কথাটা লোকনাথ শুনল অফিসের পর। সমীর তার প্রাণের বন্ধু। স্কুল, কলেজে এক সঙ্গে পড়েছে। অফিসেও বসে পাশাপাশি। বড়লোকের ছেলে। চাকরিটা প্রায় শখ।

সেই বলল, শোন লোকনাথ, ওসব চূণার, ভুবনেশ্বর ছাড়। কাছে পিঠে চমৎকার জায়গা রয়েছে। এক সময়ে আমাদের জমিদারী ছিল সেখানে। ছোট তরফের আমরা, বড় তরফ এখনও সেখানে থাকে। গাঁয়ের নাম মহিমপুর। ম্যালেরিয়া একেবারে নেই। আমি বলছি দিন পনেরো থাকলেই তোমার উপকার হবে। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি থাকবার কোন অসুবিধা হবে না। তুমি দিন দুয়েকের মধ্যেই রওনা হ'য়ে যাও। বর্ষা পড়ার আগে।

ঢেঁকুর সামলে লোকনাথ ঘাড় নাড়ল।

একদিন ভোরে বিছানা আর সুটকেস নিয়ে লোকনাথ রওনা হল। স্ত্রীও সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু লোকনাথ বারণ করেছে। খবরদার, সঙ্গে এস

NOT FOR SALE

না। চোঁয়া ঢেঁকুর বড় ছোঁয়াচে রোগ। একজনের কাছ থেকে আর একজনের হ'তে পারে। এক সঙ্গে তিনজনের হ'লে সর্বনাশের ব্যাপার। চোঁয়া ঢেঁকুরের ঠেলায় ঘরে ট্যাকা দায় হবে। শেষকালে কর্পোরেশনের লোক এসে হয় ত বেরই করে দেবে। শহরে থাকতে দেবে না।

মহিমপুরের মহিমা অসাধারণ। দিন পনেরোর মধ্যে সত্যি লোকনাথের শরীর ঠিক হ'য়ে গেল। দশ সের চালের ভাত আর সিকি পাঁঠা খেয়েও একটু ঢেঁকুর উঠল না, চোঁয়া ঢেঁকুর তো দূরের কথা।

বাড়িতে স্ত্রীকে আর অফিসে সমীরকে লোকনাথ আরোগ্যের সংবাদ দিয়ে দীর্ঘ চিঠি দিল। মনের আনন্দে রোজ সকাল বিকাল উঠানে সারসাসন আর উঠানের পাশের পেয়ারা গাছে উঠে মর্কটাসন করতে লাগল।

ব্যাপারটা ঘটল ফেরবার ঠিক দিন সাতেক আগে।

স্টেশনের ধার দিয়ে ভোরে লোকনাথ বেড়িয়ে ফিরছিল, বড় তরফের জমিদারবাবুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

বিরাট চেহারা। আড়াই মণের কম নয়। পরনে গেঞ্জি আর ধুতি মালকোঁচা দেওয়া। হাতে পাকা বাঁশের লাঠি।

লোকনাথকে দেখে হুংকার দিলেন, কে যায়!

পরিচয় লোকনাথের জানা ছিল না, তবু জাঁদরেল গোছের কেউ হবেন ভেবে, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে আত্মপরিচয় দিল। ছোট তরফের সমীরের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব সে কথাও বলল।

বড় তরফ দ্বিতীয় হুংকার ছাড়লেন, আমি বেঁচে থাকতে অন্য কোথাও ওঠবার দরকারটা কি ছিল? সমীরটার কি কোন কালে আক্কেল হবে না। তা আর কতদিন থাকা হবে এখানে?

লোকনাথ বলল, সাতদিন।

মোটে? তা হবে না, আরও মাসখানেক থেকে যাও।

লোকনাথ সবিনয়ে বলল, তা সম্ভব নয়। অফিসের ব্যাপার। আর ছুটি পাওয়া যাবে না।

হুঁ, শিকার টিকার আসে? বলেই বড় তরফ হুংকার দিলেন, জনার্দন!

আওয়াজে লোকনাথের পিলে ঠাঁই বদল করল।

পালোয়ান গোছের একজন ছুটতে ছুটতে এসে বড় তরফের ইঙ্গিতে বহু কষ্টে তাঁকে ঘাসের ওপর বসিয়ে দিল অনেক কসরত করে।

কিহে, বললে না? শিকার টিকার আসে?

লোকনাথ দু এক মিনিট ভেবে নিল, একবার গুলতি দিয়ে একটা গিরগিটি মেরেছিল। কত বয়স তার তখন। বড় জোর ন' দশ। এ কথা বলার কোন মানে হয় না। ভাবতে ভাবতে আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। একবার একটা বক শিকার করেছিল।

NOT FOR SALE

কি রকম?

লোকনাথ বলতে শুরু করল।

তার মেসোমশাইয়ের একটা বন্দুক ছিল। তাই নিয়ে তার মেসোমশাই আর সে নৌকা করে জলায় গিয়েছিল। মেসোমশাই ইদানীং জীবহত্যা করতেন না, তাই বন্দুকটা লোকনাথের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, মারো।

জল দেখা যায় না, এত বেলে হাঁস। লোকনাথ উপুড় হয়ে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে তাগ করতে লাগল। পাঁচ মিনিট হ'য়ে গেল, বন্দুকের শব্দ আর হয় না। শেষকালে মেসোমশাই বললেন, কি হে, ছাড়।

সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ হ'ল আর লোকনাথ গড়িয়ে পড়ল নৌকার পাটাতনের ওপর।

প্রায় দশ হাজার বেলে হাঁস ছিল, সব কটা অক্ষত দেহে উড়ে গেল। জলার এপারে ডাঙ্গার প্রায় কাছে বুড়ো একটা বক বসে ছিল, সেটা কাত হ'য়ে পড়ল।

মেসোমশাই বললেন, যাক, তবু মন্দের ভাল। চল, ওটাকেই আনা যাক।

বকটাকে তোলা হ'ল। অনেকক্ষণ ধরে ভাল করে মেসোমশাই নিরীক্ষণ করলেন। সারা দেহে কোথাও গুলির দাগ নেই।

মেসোমশাই ডাক্তার। পকেট থেকে স্টেথসকোপ বের করে বকটার বুক দেখলেন, চোখের পাতা টেনে টেনে দেখলেন, তারপর বললেন, গুলি লাগেনি। গুলির শব্দে হার্ট ফেল করেছে।

বড় তরফের হাসির তোড়ে দশ মিনিট কান পাতা গেল না। হাসি থামলে বললেন, এ সব পাখিটাখি শিকার নয়, একেবারে আসল জিনিস। পশ্চিমের জঙ্গলে চিতা যা আছে, রয়েল বেঙ্গলকে হার মানায়। চল, তারই একটা ঘায়েল করা যাক। লোকের অভাবে বহুদিন শিকারে যাই নি।

তাই ঠিক হ'ল। না বলার সাহস ছিল না লোকনাথের। বুকের মধ্যে গুর গুর করলেও মুখে লোকনাথ হাসি ফোটাবার চেষ্টা করল।

গাছের ওপর মাচা বাঁধা হল। একটা মরা ছাগল রাখা হ'ল একটু দূরে। চিতা বাঘের একটা সুবিধা। জ্যান্ত মরা কোনটাতেই অরুচি নেই।

সন্ধ্যার দিকে যাত্রা শুরু হল। দুজন জোয়ান অনেক কষ্টে বড় তরফকে কাঁধে করে মাচায় চড়াল। মচ মচ করে উঠল মাচা। গাছে গোটা কতক পাখি বসেছিল, তারা আর্তকণ্ঠে উড়ে পালাল।

লোকনাথও চড়ল। রাত গভীর হল। শুধু ঝিঁঝি আর নিশাচর প্রাণীর ডাক।

লোকনাথের একটু তন্দ্রার মতন এসেছিল, হঠাৎ বিদঘুটে এক চীৎকারে তন্দ্রা ভেঙে গেল।

কি হ'ল? খুব ফিস ফিস করে লোকনাথ জিজ্ঞাসা করল।

NOT FOR SALE

চুপ, বড় তরফ আস্তে ঠেলা দিল, এসে গেছে।

বড় তরফের পক্ষে ঠেলাটা আস্তে, কিন্তু আর একটু হ'লেই লোকনাথ মাচা থেকে নিচে পড়ে যেত।

আবার গর্জন।

এবার স্পষ্ট দেখা গেল। ফাঁকা জায়গায় এসে চিতাটা দাঁড়িয়েছে। বিরাট সাইজ। গায়ে গোল গোল দাগ। নীল দুটি চোখ আগুনের মতন জ্বলছে। লাল টকটকে জিভ।

চিতাবাঘ এর আগে অনেকবার লোকনাথ দেখেছে। এর চেয়ে কাছাকাছিও গিয়েছে, তবে সেখানে মাঝখানে লোহার গরাদ ছিল। আর সে গর্জনও যেন অনেক স্তিমিত। বড়বাবুর কাছ থেকে বকুনি খেয়ে এসে কেরানীর চাপা গুঞ্জনের মতন।

মরা ছাগলটার দিকে চিতাবাঘটার মোটেই নজর নেই। সে সোজাসুজি মাচার দিকে চেয়ে আছে।

মাচাটা সজোরে কেঁপে উঠতেই লোকনাথ বুঝতে পারল সে ভীষণ কাঁপছে। প্রায় ম্যালেরিয়া-রোগীর মতন। বন্দুকের তাগ করতে গিয়ে বড় তরফ বিরক্ত হ'য়ে বললেন, ও কি, হ'চ্ছে কি? ঠিক হয়ে বস না। মাচায় বসে আছ। তোমার কি ধারণা বাড়িতে ইজিচেয়ারে বসে আছ যে ওভাবে পা দোলাচ্ছো?

কি করে বড় তরফকে লোকনাথ বোঝাবে, শুধু পা দুটিই নয়, সর্বদেহ কাঁপছে। অন্তরাত্মা পর্যন্ত।

এক সময়ে আস্তে আস্তে সেই কথাই বলল, পা দোলাচ্ছি না, কাঁপছি। বাঘটা আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। কি বুঝি বলতে চায়।

বন্দুকটা কায়দা মত ধরে বড় তরফ উপুড় হবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বিরাট বপুর জন্য ঠিক সুবিধা করে উঠতে পারলেন না।

শুধু আড়চোখে লোকনাথের দিকে চেয়ে বললেন, শক্ত করে গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধো নিজেকে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে কাছাটা খুলে লোকনাথ ডালের সঙ্গে বাঁধল।

মিনিট তিনেক, কিন্তু লোকনাথের মনে হ'ল তিন প্রহর। বাঘটা গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। ল্যাজটা প্রবলবেগে আছড়াচ্ছে মাটির ওপর।

অন্ধকার ভেদ করে বড় তরফের আপসোস শোনা গেল, সর্বনাশ।

কি হ'ল?

বন্দুকটা আটকে গেছে। বহুদিন ব্যবহার করা হয়নি কিনা, তাছাড়া পুরোনো ধরনের বন্দুক। কেমন জাম হ'য়ে গেছে।

NOT FOR SALE

লোকনাথের দাঁতে দাঁতে লেগে গেল। জিভ শুকিয়ে কাঠ। বহুকষ্টে বলল, কি হবে।

কি হবে বড় তরফকে আর বলতে হ'ল না, চিতাবাঘই বলল। একটু গুড়ি মেরে দারুণ এক লাফ। মাচার ওপর পড়ে হড়কে নেমে গেল। নখ দিয়ে প্রবল বিক্রমে গাছের একটা ডাল আঁকড়ে ধরল।

বড় তরফ কোনরকমে মাচার কোণে গড়িয়ে পড়েছেন, কিন্তু লোকনাথ মাচায় আর নেই। বাঘের ঠেলায় ঝুলে পড়েছে। কাছা ডালে বাঁধা। লোকনাথ শূন্যে ঝুলছে। দুটো পা আর হাত দুটো বাতাসে দুলছে। আচমকা দেখলে অদ্ভুত কোন জন্তুর কথাই মনে হয়।

ডাল আঁকড়ে একটু এগিয়ে লোকনাথের মুখের কাছে চিতাবাঘটা মুখ নিয়ে যেতেই বিপত্তি।

বুক পকেটে নস্যির কৌটো ছিল, সেটা খুলে বাঘের মুখে চোখে গিয়ে পড়ল, তাতেও বাঘ ততটা কাবু হয়নি। এর আগে মাদ্রাজী আর পরিমল দুরকম নস্যির স্বাদ তার নেওয়া ছিল শিকারীদের দেহ চিবোবার সময়। কিন্তু তাকে ঘায়েল করল অন্য ব্যাপার।

জিভ দিয়ে সবে লোকনাথের মুখটা চাটতে শুরু করেছে, এমন সময় ঢেঁকুর। চোঁয়া, বিচিত্র ঢেঁকুর। ভয়ে গলা এমনিতেই কাঠ হ'য়ে ছিল, ঢেঁকুরটা বেরোল ঠিক ফেঁসে যাওয়া ব্যাগপাইপের মত।

বাঘটা হাত পা ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে মাটিতে পড়ল। তারপর মৃদু গর্জন করে, ল্যাজটা পায়ের মধ্যে ঢুকিয়ে তীরবেগে বনের মধ্যে অদৃশ্য হ'ল।

আশ্চর্য কাণ্ড! বাঘের শেষ গর্জনটা যেন গর্জন বলে মনেই হ'ল না। ঠিক যেন চোঁয়া ঢেঁকুরের মতন।

ভোর হ'তে লোকনাথ ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল।

দেখলেন! এত কষ্টে রোগটা সারিয়েছিলাম, পাষণ্ড বাঘটা মুখ চেটে কি সর্বনাশ করে গেল! কান্নার সঙ্গে সঙ্গে বার তিনেক চোঁয়া ঢেঁকুরের শব্দ হ'ল।

বড় তরফ ধমক দিয়ে উঠলেন, কি ছেলেমানুষী কর। ওই ঢেঁকুর তোমার আর আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে, তা জান। রোগ সেরে গেলে এতক্ষণ তো বাঘের পেটে যেতে। তাতে আর লাভটা কি হ'ত! তাছাড়া ও বাঘেরও তো দফা শেষ। একবার যখন অম্বলে ধরেছে, তখন আর ক'দিন!

—সমাপ্ত—

NOT FOR SALE

কৈলাস কাহিনী

মাঝরাতে একটা গোঙানির শব্দে দুর্গার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসেই বুঝতে পারলেন শিব যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন।

শরীর ঠিক থাকবে কি করে। নিয়মের বালাই নেই। দিনরাত নেশা ভাং করছেন। বারণ করলেও কথা কানে তোলেন না।

শিবকে ঠেলা দিয়ে দুর্গা বললেন, কি ব্যাপার অমন করছ কেন? কি কষ্ট হচ্ছে?

শিব উঠে বসলেন। দুহাতে পেটটা চেপে ধরে বললেন, কিছু বুঝতে পারছি না, রাত থেকে পেটটা বড্ড ব্যথা করছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

সে কি গো? এত করে বলি গাঁজার মাত্রা কমিয়ে দাও। সে শুনবে না। তাছাড়া যেমন হয়েছে তোমার নন্দীভৃঙ্গী। গাঁজার সঙ্গে কি মেশাচ্ছে কে জানে। দেখ তো আমি এখন কি করি।

উঃ, কিছু একটা কর। বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

শিব যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন।

নিরুপায় হয়ে দুর্গা একটা বরফের চাঁই ভেঙে শিবের পেটে ঘষতে লাগলেন। ছেলেমেয়েরা কেউ কাছে নেই।

পৃথিবীতে চারিদিকে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছে। কার্তিক সেখানে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। গণেশ বেচারার তো একটুও সময় নেই। ব্যবসায়ীদের খাতা পত্র নিয়ে ব্যস্ত। আয়করের হাঙ্গামা। লক্ষ্মী সরস্বতী শ্বশুরবাড়ী।

নন্দী-ভৃঙ্গী যে ভাং খেয়ে কোন্ গুহায় পড়ে আছে তার ঠিক নেই।

একটু ভোর না হলে কিছুই করা যাবে না।

সকাল হল কিন্তু শিবের পেটের যন্ত্রণা কমল না।

একটু বেলা হতে নন্দী ভৃঙ্গী এসে হাজির।

দুর্গা বিরক্ত হলেন, কোথায় থাক বল দেখি বাছারা? বাড়িতে এমন একটা বিপদ তোমাদের দেখা নেই।

নন্দী কাঁচু-মাচু হয়ে উত্তর দিল, মাঠাকরুণ, নিমের ডালের খোঁজে একটু নেমে গিয়েছিলাম, তাই আসতে দেরী হল। ঠাকুর সকালে নিমের দাঁতন করবেন বলেছিলেন।

NOT FOR SALE

আর দাঁতন, দুর্গা দুটো হাত ওলটালেন, পেট থাকলে তো দাঁত। কা তোমরা গাঁজার সঙ্গে কি মিশিয়েছ, তোমরাই জান। সারারাত ভীষণ পেটে যন্ত্রণা। মানুষটা নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে না।

ভৃঙ্গী চেঁচিয়ে উঠল, আপনার সিংহের দিব্যি মা। কিছু মেশাইনি তিব্বতের ওদিক থেকে একেবারে টাটকা তুলে এনেছি। পৃথিবীতে আজকা ওটার চাষই খুব বেশী হচ্ছে।

কি জানি কি ব্যাপার। তোমরা বাপু একটা ব্যবস্থা কর। দেবাদিদেবের ক চোখে দেখা যায় না।

নন্দী আর ভৃঙ্গী ফিস ফিস করে কি পরামর্শ করল, তারপর নন্দী বলল তাহলে ঠাকরুন আজ্ঞা করুন, অশ্বিনীকুমারদের একজনকে ডেকে আনি।

যা হয় একটা তাড়াতাড়ি কর।

দুর্গা আর এক চাঙড় বরফ শিবের পেটে চড়াতে চড়াতে বললেন।

নন্দী ভৃঙ্গী পলকে অদৃশ্য হল।

এক ঘণ্টার মধ্যে অশ্বিনীকুমারদের একজন এসে দাঁড়াল। ছোট। বড় বা ভুগছে। নড়বার উপায় নেই।

ছোটটিও খুব কাছে এল না। কিছু বলা যায় না। শিব কিরকম মেজা আছেন, কে জানে। কথায় কথায় তো তৃতীয় নয়ন দিয়ে আগুন ছোটে। ভ করে দিলেই হল।

দুর্গা এগিয়ে এলেন, এস, এস, অত দূরে দাঁড়িয়ে কেন?

ছোট অশ্বিনীকুমার আমতা আমতা করে বলল, না, এখানেই বেশ আছি কর্তার চোখে আগুন টাগুন নেই তো?

আর আগুন! কাল রাত থেকে যন্ত্রণায় চোখই খুলতে পারছেন না। পে অসহ্য যন্ত্রণা।

সাহস পেয়ে অশ্বিনীকুমার আস্তে আস্তে এগিয়ে এল। বরফের চাঁই সরি পেটটা টিপে-টিপে দেখল তারপর গম্ভীর গলায় বলল, এ আর দেখতে হবে না

কি হয়েছে? দুর্গা ভীত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

পিলে।

পিলে? অর্বাচীন কোথাকার! শিব হুংকার ছাড়লেন।

ব্যস, অশ্বিনীকুমার আর দাঁড়াল না। নক্ষত্রবেগে ছুটে পালাল। ওষুধে বাক্স পিছনে পড়ে রইল, খেয়ালই নেই।

কি হল, ওরকম ভাবে তাড়ালে কেন? দুর্গা বিরক্ত হলেন।

না, তাড়াব না। শিব দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, ডাক্তারি করতে এসেছেন! ওসব মান্ধাতার আমলের ডাক্তার দিয়ে চলবে না। আজকাল বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গেছে।

NOT FOR SALE

দুর্গা অবাক হয়ে বললেন, কি করতে চাও তুমি?

শিব দুর্গার কথায় কোন আমল না দিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলেন, নন্দী, ভৃঙ্গী।

আদেশ করুন বাবা। নন্দী ভৃঙ্গী ছুটে দুপাশে দাঁড়াল।

এসব হাতুড়ে কবিরাজদের কর্ম নয়। তোরা বাংলাদেশে চলে যা। অনেক বড় বড় ডাক্তার আছে সেখানে। সেখান থেকে ভাল একজন ধরে নিয়ে আয়।

নন্দী আর ভৃঙ্গী মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল।

নীচু হয়ে আস্তে ভৃঙ্গী বলল, ঠাকুর, বাংলাদেশের শহরের অলি গলিতে ডাক্তার। সবাইয়ের ঝকমকে তকতকে সাইনবোর্ড। ওর মধ্যে কে উৎকৃষ্ট কি করে চিনব বলুন? শেষকালে কাকে আনতে কাকে আনব, আপনি রেগে টং হয়ে যাবেন।

শিব কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপরে বললেন, ঠিক আছে, আয় তোদের দুজনের চোখে একবার হাত বুলিয়ে দিই, তাহলেই তোদের দিব্য দৃষ্টি খুলে যাবে।

দিব্য দৃষ্টি! নন্দী রীতিমত ভয়ে ভয়ে উচ্চারণ করল।

হ্যাঁ, দিব্য দৃষ্টি। তাহলেই কে কেমন ডাক্তার তোরা ঠিক চিনতে পারবি।

কি করে ঠাকুর? ভৃঙ্গী জিজ্ঞাসা করল।

শোন তবে, শিব থেমে থেমে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, যে সব রোগী ডাক্তারের ভুল চিকিৎসার জন্য মারা যায়, তাদের আত্মারা রোজ সেই ডাক্তারের বাড়ি কিংবা ডাক্তারখানার সামনে ভিড় করে। কাজেই যে ডাক্তারের কাছে দেখবি এইসব আত্মার ভিড় কম, তাকেই তুলে নিয়ে আসবি।

এই সময় দুর্গা এসে বাধা দিলেন।

ডাক্তারের খোঁজে যদি মর্ত্যেই পাঠাচ্ছ, তাহলে বাংলাদেশে কেন? কার্তিক বলছিল, ইউরোপ, আমেরিকায় চিকিৎসার নাকি আরও উন্নতি হয়েছে। তারা খুলি পর্যন্ত খুলে ভিতরের মাল মশলা বদলে দিচ্ছে।

এত কষ্টেও শিব হেসে ফেললেন।

আমার খুলি খোলবার প্রয়োজন হবে না গিন্নী, মগজের মাল মশলা মেরামত করবার দরকার নেই। সেরকম কিছু হলে তো তোমার ভাই শনিকেই ডাকতাম। ওর চেয়ে বড় সার্জন আর কে আছে? গণেশের মুণ্ডুটাই বেমালুম বদলে দিল। যাক্, বাংলাদেশের ডাক্তারই আমার দরকার। পুজো পার্বনে এখনও ওরাই আমাদের ডাকে। নৈবেদ্য দেয়। আমাদের ধাত ওদের জানা, কাজেই আমাদের চিকিৎসা ওরাই ঠিক করতে পারবে।

দুর্গা আর কিছু বললেন না। দুধ চাপিয়ে এসেছিলেন কড়ায়। রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

NOT FOR SALE

নন্দী আর ভৃঙ্গী বাংলাদেশের দিকে ছুটল।

কলকাতা শহর নন্দী আর ভৃঙ্গীর বেশ চেনা। মা দুর্গার সঙ্গে অনেক বছর ধরে আসছে। বড় বড় ডাক্তারের খোঁজও কিছু রাখে।

প্রথমেই দুজনে সবচেয়ে নামকরা ডাক্তারের বাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হল। কাছে আর যেতে হল না। ভিড় দেখেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। প্রায় মাইল দুয়েক লম্বা। সব রোগীদের আত্মার ভিড়। তার মানে, এত বড় ডাক্তারও ভুল চিকিৎসায় এতগুলো রোগীকে খতম করেছে।

নন্দী আর ভৃঙ্গী আর দাঁড়াল না। তার পরই যার নাম, সেই ডাক্তারের বাড়ির সামনে গেল। কিন্তু একই ব্যাপার।

বেলা দুটো যখন বাজে তখন নন্দীর আর ভৃঙ্গীর আর চলবার অবস্থা নেই। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ। ক্ষুধায় পেট চিন চিন করছে। এর মধ্যে কম করে অন্তত চল্লিশ জন নামী ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল, কিন্তু অল্প বিস্তর একই অবস্থা। কোথাও ভিড় হয়তো একটু বেশী, কোথাও একটু কম।

উপায়।

নন্দী বলল, উপায় পরে হবে। কিছু পেটে না পড়লে আমরাও আত্মা হয়ে যাব।

ভৃঙ্গী স্বীকার করল কথাটা সত্যি।

দুজনের ট্যাক থেকে পয়সা জড় করে দেখা গেল দেড় টাকা হয়েছে। ব্যস ওতেই হবে। এক টাকার ফুচকা আর আট আনার দু গ্লাস করে কোকাকোলা।

এ দ্রব্য দুটির ওপর নন্দী ভৃঙ্গীর অনেক দিন থেকে লোভ, কিন্তু দুর্গার কড়া শাসনে এসব মুখে তুলতে পারে না।

এবার মা সঙ্গে নেই, কাজেই আশ মিটিয়ে দুজনে খেল। আশ মিটিয়ে অর্থাৎ এক টাকায় যতটা কুলোয়।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে দুজনে মনুমেন্টের তলায় বসল।

কি করা যায়! ডাক্তার একটা ধরে না নিয়ে গেলে তো রক্ষা নেই। কিন্তু জেনে শুনে এসব ডাক্তার নিয়েই বা যায় কি করে।

নন্দীই মতলব দিল, চল, এক কাজ করি। শহরের ডাক্তার তো সব এই গোত্রের। তার চেয়ে শহরতলীতে খোঁজা যাক। কলকাতার কাছাকাছি ভাল ডাক্তার নিশ্চয় আছে।

তাই যাওয়া যাক। ভৃঙ্গী ঢেঁকুর তুলতে তুলতে বলল।

উত্তরপাড়া, বালি, কোন্নগর, শ্রীরামপুর, চন্দননগর। কোথাও সুবিধা হল না। দুজনে আরো এগিয়ে গেল।

হুগলী। হুগলীতে একটা সরু গলির মুখে ছোট এক ডাক্তারখানা। সেখানে গিয়েই নন্দী আর ভৃঙ্গী আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

NOT FOR SALE

মিল গিয়া। রাষ্ট্র ভাষায় দুজনেই আনন্দ প্রকাশ করল।

মাত্র দুটি আত্মার ভিড়।

নন্দী ভৃঙ্গীকে ইশারা করেই ভিতরে ঢুকে গেল।

একেবারে ছোকরা ডাক্তার। একমনে একটা মোটা বই পড়ছিল। বেয়াড়া চেহারার দুজন লোককে ঢুকতে দেখে ভ্রূ কুঁচকে বলল, কি, ম্যালেরিয়া না সান্নিপাতিক?

নন্দী আর ভৃঙ্গী কোন উত্তর দিল না। দুজনে ডাক্তারের দু পাশে দাঁড়িয়ে হঠাৎ তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল।

ডাক্তার প্রথমটা ভাবল ভূমিকম্প, তারপর মনে করল অ্যাটম ব্যোম, আবার মনে হল অন্য গ্রহ থেকে কেউ এসে তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে চলেছে।

মোট কথা তিনজনে আকাশে উড়তে লাগল। অন্য সকলের অদৃশ্য হয়ে।

এক ঘণ্টার মধ্যেই তিনজনে কৈলাসে হাজির।

ইতিমধ্যে শিবের অবস্থা বেশ মারাত্মক। যন্ত্রণা বেড়েছে। দুবার বমিও হয়েছে।

ডাক্তার দেখে শিব দুটো চোখ খুললেন। একটা চোখ বন্ধই রইল।

একি, এ যে একেবারে ছোকরা।

শিব ঠোঁট ওলটালেন।

নন্দী হাঁটু মুড়ে শিবের পাশে বসল। ফিসফিস করে বলল, আজ্ঞে যত বড় ডাক্তার, তত রোগীর আত্মার ভিড়। আমরা দুজনে সারা কোলকাতা চষে ফেলেছি। কোন ডাক্তারকে বাদ দিইনি।

ওকি করছেন?

হঠাৎ ডাক্তারের ধমকে নন্দী থেমে গেল।

না তাকে নয়, ডাক্তার দুর্গাকে ধমকাচ্ছে।

আপনি চাঁই চাঁই বরফ পেটের ওপর চড়াচ্ছেন কেন?

দুর্গা বিব্রত হয়ে বললেন, ওঁর পেটে একটা যন্ত্রণা হচ্ছে কাল রাত থেকে, তাই বরফ দিচ্ছি। যদি ব্যথাটা একটু কমে।

কিসের জন্য ব্যথা সেটাই জানলেন না, কেবল বরফ মালিশ করে যাচ্ছেন? চারদিকে বরফ, কিনতে তো আর হয় না, তাই বিনা পয়সায় চিকিৎসা করছেন বুঝি!

দুর্গা বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করলেন। হাজার হোক ডাক্তার। চটাচটি করা উচিত হবে না। এর কেরামতিটাই দেখা যাক।

ডাক্তার হাত দিয়ে বরফগুলো সব সরিয়ে দিল তারপর শিবের দিকে চেয়ে বলল, নাম কি আপনার?

শিব।

NOT FOR SALE

শিব কি? ডাক্তার চেঁচিয়ে উঠল, শিবচন্দ্র না শিবকুমার? তাছাড়া পদবী একটা থাকবে তো? ঘোষাল, নাগ, খান, খান্না যা হোক কিছু।

শিব খুব মৃদু কণ্ঠে বললেন, শিবচন্দ্র দেবাদিদেব চন্দ্রমৌলী মহেশ্বর।

বাবাঃ, এ যে একেবারে মালগাড়ী। ডাক্তার হাসল। যা হোক সরে আসুন, পেটটা দেখি।

শিব একটু সরে এলেন।

প্রথমে হাত দিয়ে টিপে টিপে তারপর পকেট থেকে নল বের করে পেটে লাগিয়ে ডাক্তার শুনতে লাগল।

এক সময়ে মুখ তুলে বলল, মহেশ্বর মশাই, পেটের মধ্যে তো সপ্ত সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছি। কাল আহার করেছিলেন কি?

আমার আর আহার, শিব ম্লান হাসলেন, সামান্য একটু গঞ্জিকা ধুতুরাসহযোগে।

শিব হাত দিয়ে গঞ্জিকার মাত্রাটা দেখালেন।

অ্যাঁ, অতটা গাঁজা! সর্বনাশ! গাঁজা আপনাকে ছাড়তে হবে মশাই।

এবার শিবের তৃতীয় নয়ন একটু জ্বলে উঠল। শিবকে গাঁজা পরিত্যাগ করতে আদেশ করে, এ কোন মহামূর্খ!

তোমার হাতে মাত্র দুটি রোগী এ পর্যন্ত মারা গেছে শুনে তোমাকে চিকিৎসার জন্য আনতে আদেশ দিয়েছিলাম। আমার রোগ তুমি ধরতে পারলে না। কতদিন তুমি ডাক্তারি আরম্ভ করেছ?

ডাক্তার বলল, আজ বেলা নটা থেকে।

এইবার শিব চমকে উঠলেন, সেকি, বেলা নটা থেকে শুরু? একদিনেই দুটো রোগী শেষ।

ডাক্তার অম্লান বদনে ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ। একটা রোগী বেলা বারোটায় গেল ভুল ইনজেকশনে। আর একটা গেল বেলা তিনটেয়। ডোজটা বেশী হয়ে গিয়েছিল।

অ্যাঁ! বিহ্বল শিব চীৎকার করে উঠলেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে ঠং করে একটা শব্দ। তাঁর মুখ থেকে কি একটা বেরিয়ে পাথরের ওপর গড়িয়ে পড়ল।

দুর্গা তাড়াতাড়ি জিনিসটা তুলে নিয়ে বললেন, একি কাণ্ড! আমার সিঁদুর কৌটো তোমার পেট থেকে বের হল?

শিব মাথা চুলকাতে চুলকাতে লজ্জা-জড়িত কণ্ঠে বললেন, তোমার সিঁদুর কৌটো! আমি অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারিনি। ধুতরো ভেবে গিলে ফেলেছিলাম। তাই পেটে অত যন্ত্রণা হচ্ছিল।

NOT FOR SALE

শিব দাঁড়িয়ে উঠলেন। ডাক্তারের মাথার ওপর ডান হাতটা প্রসারিত করে বললেন, আমি আশীর্বাদ করছি, তুমি মানুষ হও। যশের অধিকারী হও। তোমার জন্যই আমার যন্ত্রণার উপশম হল।

ডাক্তার খিঁচিয়ে উঠল, ওসব ফাঁকা আশীর্বাদ রাখুন চন্দ্রমৌলীমশাই। আপনাদের শুভেচ্ছায় আর কিছু হয় না। আমার দশনী বত্রিশ টাকা মিটিয়ে দিন। আমার রেট শহরে ষোল, আর মফঃস্বলে বত্রিশ। তারপর যাবার ব্যবস্থাও করে দিতে হবে। আপনার এই অনুচরদের বলে রাখুন।

হতভম্ব শিব দুর্গার দিকে চেয়ে হাত পাতলেন।

নিরুপায় দুর্গা স্বেচ্ছাসেবকদের নজর বাঁচিয়ে রাখা প্রণামীর টাকা একটা ভাঙা হাঁড়ির তলা থেকে বের করে গুণে গুণে ডাক্তারের হাতে দিলেন। সবশুদ্ধ ত্রিশ টাকা। দুটাকা কম হল।

দুর্গা হেসে বললেন, তুমি আমার এই সিঁদুর কৌটাটা নিয়ে যাও বাছা। এটা খাঁটি সোনার। দাম দু টাকার অনেক বেশী।

ডাক্তার হাত নাড়ল, খেপেছেন। আমাদের দেশে সোনার জিনিসের আর দাম নেই।

দুর্গা অবাক হয়ে বললেন, মানে সোনার বাংলা আর নেই!

ও সব শক্ত অর্থনীতির কথা আপনি বুঝবেন না। তার চেয়ে আমাকে ওই বাঘছালটা দিন। যেটা পেতে চন্দ্রমৌলীমশাই শুয়েছিলেন। ঠাকুরমা অনেক দিন ধরে একটা বাঘছালের জন্য খেয়ে ফেলছেন আমাকে।

শিব নীচু হয়ে বাঘছালটা ডাক্তারের হাতে তুলে দিলেন।

ডাক্তার একগাল হেসে বলল, ধন্যবাদ, চলি চন্দ্রমৌলী মশাই, দরকার পড়লে ডাক দেবেন। আসি মিসেস চন্দ্রমৌলী, টা টা।

সব কথা শেষ হবার আগেই নন্দী আর ভৃঙ্গী হেঁচকা টান দিয়ে ডাক্তারকে মাটি থেকে তুলে নিল তারপর সোঁ সোঁ করে ওপরে উঠে গেল।

—সমাপ্ত—

NOT FOR SALE

জেলেপাড়া যাত্রাপার্টি

মতলবটা প্রথম এল বনানীর মাথায়। পরীক্ষা শেষ। এখন থেকে গালে হাত দিয়ে পরীক্ষার ফলের আশায় বসে থাকার কোন মানে হয় না। এর মধ্যে কত কাণ্ড হবে। পরীক্ষার খাতা কুলির মাথায় নিখোঁজ। বলা যায় না, বরাত জোর থাকলে নিজের লেখা ইতিহাসের খাতার ঠোঙায় বনানী হয়তো মুড়ি চিবোতে পারবে। ওসব ভেবে এখন আর লাভ নেই। হাতে মাস দুয়েক সময় রয়েছে। বাড়িতে এতগুলো প্রায় সমবয়সী মেয়ে। আমোদ প্রমোদের একটা বন্দোবস্ত করতেই হবে।

দুপুরবেলা গুরুজনেরা বিছানায় কাত হলে সভা বসল তেতলার ঘরে। মেয়ে বড় কম নয়। বনানীরা চার বোন—বনানী, কাজল, বাবলী আর মিঠু। তিন খুড়তুতো বোন—মীরা, বুলি আর ডলি। সমবয়সী পিসী আছে ফুচি। তারপর ভাড়াটেদের মেয়েরাও এসে জুটেছে। খুচরোদের মধ্যে রয়েছে ঝুমা, মিলি।

সভা যখন, তখন সভাপতি অর্থাৎ সভানেত্রী একজন থাকা দরকার। মীরা সেই আসনে বসল। বসেই বলল, গতবারের মত পিকনিক করলেই তো হয়।

সঙ্গে সঙ্গে ফুচি আপত্তি জানাল, না বাবা, পিকনিকে আর আমি নেই। আমার খুব শিক্ষা হয়েছে। তা ছাড়া এই গরম। তার ওপর চারদিকে অসুখবিসুখ।

মীরার বোন বুলি গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে। বাজে কথা কম বলে। সে আস্তে আস্তে বলল, আমরা এতগুলো মেয়ে রয়েছি, একটা ভাল বই অভিনয় করলে তো পারি।

ফুচির বোনঝি মিলি বলল, আম নাচব মাচী। সেই নাচটা। আচার এল গগনে।

মিঠু একটু অন্যমনস্ক ছিল। 'আচার' কথাটা কানে যেতেই সোজা হয়ে বসল।

আচার আমাকে একটু দিও তো।

ফুচি হেসে অস্থির।

আচার মানে আষাঢ়। ছেলেমানুষ তো, কথা ঠিক মত উচ্চারণ হয় না।

ঝুমা ঠেলেঠুলে এগিয়ে গিয়ে বসেছিল। তার ধারণা, ছোট বলে তাকে কেউ আমল দেয় না। হয়তো অভিনয় থেকে বাদই দিয়ে দেবে।

NOT FOR SALE

তাই সে আগে ভাগে বলল, আমিও নাচব! লিপিটি মাখব।

লিপিটি অর্থাৎ লিপস্টিক।

এবার কাজল কথা বলল, অভিনয় যদি কর তো নতুন ধরণের বই ধর। পুরনো, একঘেয়ে বই করার কোন মানে হয় না। দরকার নেই, বই একটা লিখে নিতে হবে।

কিন্তু লিখবে কে? কাজলের দিদি বনানী বলল।

সকলের চোখ গিয়ে পড়ল মীরার ওপর। ইংরেজী, বাংলা দুটোই ভাল জানে। ঘর বন্ধ করে মাঝে মাঝে আবৃত্তিও করে। বাইরে থেকে তার গলা শোনা যায়। ছোটখাট একটা নাটকের বই কি আর লিখতে পারবে না!

মীরা দু হাত জোড় করল, দোহাই তোমাদের, ও কাজটি আমার দ্বারা হবে না। নাটক লেখা মুখের কথা না কি! বড় বড় লেখক ঘায়েল হয়ে যায়। দেখছ না, এখনকার নাট্যকাররা কেবল অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ করে নাটক চালাচ্ছে। অরিজিনাল নাটক কোথায়?

তাহলে? সভায় অনেকগুলো দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শোনা গেল।

এতক্ষণ ডলি চুপচাপ এককোণে বসেছিল। চুপচাপ বসবার কারণ ছিল। আসবার সময় ভাঁড়ার থেকে এক খাবলা বেলের মোরব্বা নিয়ে এসেছিল। কোণে বসে তারই সদ্ব্যবহার করছিল। এবার খাওয়া শেষ করে পাশে বসা মাদ্রাজী মেয়ে লছমীর জামায় হাতটা মুছে বলল, কেন, পদ্মপুকুরের হীরুবাবু তো রয়েছেন। তাঁকে বললেই একটা নাটক লিখে দেবেন।

মীরা ভ্রু কোঁচকালো, ডলি হীরুবাবু হীরুবাবু করছ কেন? হীরুকাকু বললেই পার।

বারে, আমাদের না হয় হীরুকাকু, সভার সকলের হীরুকাকু নাকি? তাই বলেছি হীরুবাবু।

যাক, সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হল অভিনয় করা হবে এবং অভিনয়ের জন্য নতুন বই লিখে দেবেন পদ্মপুকুরের হীরেনবাবু।

খবর পেয়ে হীরুবাবু সন্ধ্যার পর এসে হাজির। শুধু নাট্যকারই নন, নিজে ভাল অভিনয়ও করেন। একেবারে সোনায় সোহাগা।

মেয়ের দল তাঁকে ঘিরে বসল।

হীরুবাবু কিন্তু নতুন কথা বললেন।

থিয়েটার নয়, যাত্রা। আমাদের দেশের লুপ্ত এই শিল্পকে উদ্ধার করতে হবে। তবে ঠিক পুরোনো যুগের, পুরোনো ঢঙের যাত্রা নয়। আজকাল যেমন হয়েছে যাত্রার নতুন রূপায়ণ।

NOT FOR SALE

মেয়েরা কিছু বুঝল, কিছু বুঝল না, কিন্তু রীতিমত উত্তেজিত হল। হ্যাঁ, করতে হলে নতুন কিছু করা উচিত। শিল্পসম্মত উপায়ে পুরাতনকে নতুনের ছাঁচে ফেলে এ যুগের মতন করে গড়ে তুলতে হবে।

তারা রাজী।

দিন সাতেকের মধ্যে হীরুবাবু ছোটখাট একটা বই লিখে ফেললেন। অহল্যা উদ্ধার। খুব জম জমাট বই। বেশী মেয়ের দরকার হবে না। তবে যারা আছে, সকলেরই পার্টের ব্যবস্থা হবে।

প্রত্যেকদিন হীরুবাবু অফিস ফেরত এ বাড়িতে আসতে লাগলেন। তিনতলার ঘর বন্ধ করে প্রথমে ভূমিকা বণ্টন তারপর মহলা শুরু হল।

ঘর বন্ধ করে, কারণ মা কাকীমা পিসীমাদের দেখতে দেওয়া হবে না। আগে থেকে সব জিনিসটা দেখা হয়ে গেলে অভিনয়ের রাত্রে আর ভাল লাগবে না।

রামের পার্টটা নিয়ে একটু মন কষাকষির পালা শুরু হয়েছিল। এ ভূমিকার ওপর অনেকেরই লোভ ছিল। বইয়ের নায়কই রাম। তার পদস্পর্শে পাথর রূপান্তরিত হবে, অহল্যা মূর্তিতে। তখন হাততালি একেবারে বাঁধা।

তাছাড়া রাম দেবতা। লোকে সেইভাবেই নেয়। পার্টে ছোটখাট ভুল ত্রুটি হলে দর্শকরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনবে না।

মেয়েদের বেশ মনে আছে। পাশের মাঠে একবার চৈতন্যলীলা যাত্রা হয়েছিল। চৈতন্য সেজেছিল মোড়ের মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ছোকরা কর্মচারী নীলমণি। নীলমণি বাসী খাবার চালাত, খুচরো ফেরত দিতে গোলমাল করত। কিন্তু যাত্রার আসরে নীলমণিকে দেখে বৃদ্ধারা আর প্রৌঢ়রা গড়াগড়ি দিতে শুরু করলেন। প্রভু কৃপা কর। ঠাকুর দয়া কর।

এমনকি একবার পার্ট ভুলে নীলমণি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, তখন কে একজন বৃদ্ধা বলে উঠলেন, আহা, প্রভুর নবদ্বীপের কথা মনে পড়েছে।

কাজেই রামের পার্টটা পেলে সেইসব সুবিধা আছে।

দু-তিনজনকে বাছাই করে রামের পার্ট দেওয়া হল মীরাকে। লক্ষ্মণ কাজল। বেশী কথা নেই। কেবল সময়ে অসময়ে দাদা দাদা করা ছাড়া।

বিশ্বামিত্র বনানী। অহল্যা ফুচী। একটু লম্বা হয়ে যাবে। তা যাক, নাচতে জানে। নাচের মধ্যে দিয়ে রামকে প্রণাম জানাবে। বনবালা সাজবে ঝুমা, মিলি, মিঠু আর বাবলী। এছাড়া আরও অনেক পার্ট ছিল। বিদূষকের পার্ট পেল ডলি। হীরুবাবু বললেন, মেয়েটার এলেম আছে। হাসির পার্টে নাম করবে। একজন গম্ভীর ঋষির পার্টে বুলি নামবে। বুলির ঋষির পার্ট করতে কোন আপত্তি নেই, তার আপত্তি গোঁফ-দাড়ি পরতে। অথচ গোঁফ-দাড়ি হীন ঋষি কল্পনাও করা যায় না। অন্তত সেই যুগে।

NOT FOR SALE

অভিনয়ের গন্ধে বাড়ির কিছু ছেলেরাও এসে জুটেছিল। অখিল, বাবু, সুব্রত, শঙ্কর।

কিন্তু হীরুবাবু তাদের বোঝালেন। অভিনয় করা ছাড়াও অন্য অনেক কাজ রয়েছে। সবাই যদি রং মেখে বসে থাকবে তো, অতিথিকে আপ্যায়ণ কে করবে, কে প্রোগ্রাম বিলি করবে। গোলমালই বা কে থামাবে।

তা ছাড়া নতুন ধরনের যাত্রা। দৃশ্যপট নেই বটে কিন্তু ড্রপসীন একটা আছে। সেটা ঠিক সময়ে না টানতে পারলেই সব মাটি।

ছেলেরা রাজী হল।

হীরুবাবু এবার বললেন, আর একটা পাকা লোক দরকার।

পাকা লোক?

হ্যাঁ একদিক থেকে আমি প্রম্প্‌ট্‌ করব, আর একদিকে আর একজন দরকার।

সবাই আরতির কাছে ছুটে গেল।

পিসী প্রম্প্‌টিংটার ভার তুমি নাও। এমনিতেই তোমার গলা বেশ জোর। আস্তে কথা বলতেই পার না। তুমি মাঝারি গলায় বললেই আমরা বেশ শুনতে পাব।

সবচেয়ে কাতর অনুরোধ করল মীরা। কারণ তার পার্টই সবচেয়ে বড়।

আরতি তেড়ে এল, পালা সব। আমার বলে অফিসের ফাইল নিয়ে প্রাণ যাচ্ছে। প্রম্পটিং করার সময় কোথায়? তিনটে ব্রিজ তৈরীর কাজ চলছে, দুটো এঁদো পুকুর বোজাতে হবে। তার ওপর সাড়ে সাত মাইল টানা রাস্তা।

মেয়েরা পালিয়ে এল।

এবার বনানী বলল, হাসিদিকে ধরা যাক্‌। চমৎকার বাংলা পড়ায়। উচ্চারণও ভাল, আমার মনে হয় প্রম্প্‌টিং-এর কাজটা ভালই পারবে। তবে একটা মুশকিল হচ্ছে, বড্ড রাগী। কেউ পার্ট ভুলে গেলে স্টেজের ওপর তেড়ে না আসে।

হাসি রাজী হয়ে গেল, ঠিক আছে, তবে সবাই ভাল করে মুখস্থ করবে কিন্তু। পার্ট ভুলে গিয়ে লোক হাসিও না।

মীরা বলল, বায়োলজির রিটার নোট মুখস্থ করেছি। তার তুলনায় এ আর কি! তবে তুমি থাকলে সাহস হয়। একপাশে হীরুকাকু, একপাশে তুমি।

বুলিরও তাই মত।

কুড়ি পাতা কেমিস্ট্রির নোটও তো এক একদিনে কণ্ঠস্থ করেছি, তাও আব্বার তোতলা মাস্টারের দেওয়া নোট। তবে সেগুলো তো আর পরীক্ষার হলে দাড়ি পরে বলতে হয়নি। সেইখানেই তো ভয়।

যাক, পুরোদমে মহলা চলল।

NOT FOR SALE

ঠিক হল, ছাদের ওপর অভিনয়ের আসর হবে।

শ-খানেক লোক অনায়াসেই ধরবে। কিছু কার্ড ছাপানো দরকার। তা না হলে উটকো লোক উঠে পড়বে।

কিছু কার্ড ছাপাবার কি হবে, হীরুবাবু প্রশ্ন করলেন।

ডলি বলল, ঠিক আছে। টালিগঞ্জে আমার এক পিসেমশাই আছেন, তাঁর সঙ্গে অনেক প্রেসের আলাপ আছে। কার্ড ছাপাবার কোন অসুবিধা হবে না।

সব ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ হল।

সবাই আদাজল খেয়ে পার্ট মুখস্থ করতে আরম্ভ করল। যাদের নাচ আছে, তারা সময়ে অসময়ে এমন নাচের কসরত শুরু করল যে বাড়ির লোকের চলাফেরা করাই দায়। ছেলের দল ভলানটিয়ার। তারাও কম ব্যস্ত নয়।

অবশেষে অভিনয়ের দিন এল।

ছাদের একধারে একটু উঁচু করে স্টেজ করা হয়েছে। পিছনে কোন দৃশ্যপট নেই, শুধু একরঙা একটা পর্দা। সেটাই প্রাসাদ, সেটাই অরণ্য, সেটাই রাজপথ, দর্শকদের অনুমান করে নিতে হবে। সামনে অবশ্য একটা ভারী ড্রপ ফেলা।

ছাদের ওপর একটা অব্যবহৃত ঘর পড়েছিল, দুনিয়ার কাঠকুটো বোঝাই। সেটা সাফ করে সাজঘর হয়েছে। যাত্রার মতন সাজঘর থেকে সেজেগুজে কুশীলবরা আসরে নামবে, দর্শকদের মাঝখান দিয়ে।

সাতটায় অভিনয় আরম্ভ কিন্তু ছটা থেকেই পাড়ার মা মাসী ঠাকুমা দিদিমায় তিল ধারণের স্থান রইল না।

প্রথম প্রথম কার্ড চাওয়ার রীতি বহাল ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভিড় ঠেকানো গেল না।

ঠাকুমার কাছে বাবু কার্ড চেয়েছিল, ঠাকুমা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

মারব এক থাপ্পড়। কাঠ আবার কিসের রে? যত কাঠ ছিল সব তো বের করে ফেলেছিস ঘর থেকে। বলে রাখছি, তোমাদের নাচ হয়ে গেলে একখানি একখানি করে কাঠ ঘরে তুলতে হবে, নয়ত চ্যালাকাঠের বাড়ি মেরে তোমাদের শায়েস্তা করব।

বাবু আর দাঁড়ায়নি। তীরবেগে ড্রপের পিছনে পালিয়ে বেঁচেছিল।

কনসার্ট পার্টিও রয়েছে। পাড়ারই ছেলেরা। হারমোনিয়াম বেহালা আর বাঁশি।

হীরুবাবু দ্রুত পায়ে চারদিক তদারকি করে বেড়াচ্ছেন। দু-একজনের দু একটা ভঙ্গী ঠিক করে দিচ্ছেন। কি করে সবেগে প্রস্থান করতে হবে, কাউকে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছেন। যারা একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল, তাদের পিঠ চাপড়ে অভয় দিচ্ছেন।

NOT FOR SALE

অভিনয় শুরু হল সাড়ে সাতটায়। দর্শক চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এমন সময় ড্রপ সরে গেল।

বনবালাদের গান। ঝুমা, মিলি, মিঠু, বাবলী, সরস্বতী আর লালী। বনে অসময়ে বসন্ত এসেছে, তাই তারা হতবাক। তারা জানে না ঋতুরাজ শ্রীরামচন্দ্র এখানে পদার্পণ করেছেন।

তাদের গান বেশ ভালই হল। বাড়তি কায়দা হিসাবে দু-একজন পায়ের কাজ দেখাল। তাতেই একটু গোল বাধল। অবশ্য দর্শকদের চোখে ধরা পড়ল না।

পায়ের মুদ্রা দেখাতে গিয়ে মিলির পা ঝুমার পায়ে ঠেকে গেল। তার ঝকঝকে নতুন শাড়ীতেও। ঝুমাও ছাড়বার মেয়ে নয়। দু-হাত কোমরে দিয়ে নাচের ভঙ্গী করে মিলির পিঠে কনুইয়ের গুঁতো দিল। মিলি নেচে নেচে ঝুমাকে ধরবার চেষ্টা করল, ঝুমাও অন্য মেয়েদের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে ঘুরে তাকে এড়িয়ে যেতে লাগল।

দর্শকরা ভাবল এটা বুঝি নাচেরই একটা বিশেষ অঙ্গ। তারা হাততালি দিয়ে দুজনকে সংবর্ধিত করল।

ড্রপ নেমে আসতে ব্যাপারটার ইতি হল।

ড্রপ টানছে অখিল। নির্দেশ দিচ্ছে বাবু। তার গলায় সুতো বাঁধা হুইসিল। প্রোগ্রাম ধরে ধরে সুব্রত সাজঘর থেকে কোন্ দৃশ্যে কে আসবে তার ব্যবস্থা করছে।

পরেরটা খুব জমজমাট সীন।

বিশ্বামিত্র, রাম, লক্ষ্মণ, তিনজনকেই চমৎকার মানিয়েছে। রাম লক্ষ্মণের কাঁধে ধনুক। পিঠে তূণ। তাতে তীরের ফলা ঝকঝক করছে।

বিশ্বামিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা করছে। আর রাম লক্ষ্মণ শুনছে। ওর মধ্যেই লক্ষ্মণ একবার দর্শকবৃন্দের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখল। মা আর কাকীমা পাশাপাশি বসেছে। দুজনেই ফিকফিক করে হাসছে।

হাসির কী ব্যাপার হল? এমন একটা পৌরাণিক দৃশ্যে হাসির খোরাক থাকার কথা নয়। তবে কি ওর চুলের চুড়োটা ঠিকমত হয়নি? সবাই মিলে যা তাড়াহুড়ো করল, আর কয়েকটা ক্লিপ আঁটতে পারলে ভাল হত। লক্ষ্মণ একটু ম্রিয়মাণ হয়ে রইল।

কিন্তু বুলির প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই হাসির ফোয়ারা ছুটল। নবদুর্বাদল শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষেও হাসি চাপা দুষ্কর হয়ে উঠল।

আজানুলম্বিত পাকা দাড়ি, গোঁফ জোড়াও গাল ছেড়ে বেশ কয়েক আঙুল বেরিয়ে পড়েছে। একে বেচারী একটু খর্বকায়, তার ওপর জটার ভার আর গোঁফ দাড়ির ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়রান হয়ে পড়েছে।

NOT FOR SALE

ঠিক হল, ছাদের ওপর অভিনয়ের আসর হবে।

শ-খানেক লোক অনায়াসেই ধরবে। কিছু কার্ড ছাপানো দরকার। তা না হলে উটকো লোক উঠে পড়বে।

কিছু কার্ড ছাপাবার কি হবে, হীরুবাবু প্রশ্ন করলেন।

ডলি বলল, ঠিক আছে। টালিগঞ্জে আমার এক পিসেমশাই আছেন, তাঁর সঙ্গে অনেক প্রেসের আলাপ আছে। কার্ড ছাপাবার কোন অসুবিধা হবে না।

সব ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ হল।

সবাই আদাজল খেয়ে পার্ট মুখস্থ করতে আরম্ভ করল। যাদের নাচ আছে, তারা সময়ে অসময়ে এমন নাচের কসরত শুরু করল যে বাড়ির লোকের চলাফেরা করাই দায়। ছেলের দল ভলানটিয়ার। তারাও কম ব্যস্ত নয়।

অবশেষে অভিনয়ের দিন এল।

ছাদের একধারে একটু উঁচু করে স্টেজ করা হয়েছে। পিছনে কোন দৃশ্যপট নেই, শুধু একরঙা একটা পর্দা। সেটাই প্রাসাদ, সেটাই অরণ্য, সেটাই রাজপথ, দর্শকদের অনুমান করে নিতে হবে। সামনে অবশ্য একটা ভারী ড্রপ ফেলা।

ছাদের ওপর একটা অব্যবহৃত ঘর পড়েছিল, দুনিয়ার কাঠকুটো বোঝাই। সেটা সাফ করে সাজঘর হয়েছে। যাত্রার মতন সাজঘর থেকে সেজেগুজে কুশীলবরা আসরে নামবে, দর্শকদের মাঝখান দিয়ে।

সাতটায় অভিনয় আরম্ভ কিন্তু ছটা থেকেই পাড়ার মা মাসী ঠাকুমা দিদিমায় তিল ধারণের স্থান রইল না।

প্রথম প্রথম কার্ড চাওয়ার রীতি বহাল ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভিড় ঠেকানো গেল না।

ঠাকুমার কাছে বাবু কার্ড চেয়েছিল, ঠাকুমা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

মারব এক থাপ্পড়। কাঠ আবার কিসের রে? যত কাঠ ছিল সব তো বের করে ফেলেছিস ঘর থেকে। বলে রাখছি, তোমাদের নাচ হয়ে গেলে একখানি একখানি করে কাঠ ঘরে তুলতে হবে, নয়ত চ্যালাকাঠের বাড়ি মেরে তোমাদের শায়েস্তা করব।

বাবু আর দাঁড়ায়নি। তীরবেগে ড্রপের পিছনে পালিয়ে বেঁচেছিল।

কনসার্ট পার্টিও রয়েছে। পাড়ারই ছেলেরা। হারমোনিয়াম বেহালা আর বাঁশি।

হীরুবাবু দ্রুত পায়ে চারদিক তদারকি করে বেড়াচ্ছেন। দু-একজনের দু একটা ভঙ্গী ঠিক করে দিচ্ছেন। কি করে সবেগে প্রস্থান করতে হবে, কাউকে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছেন। যারা একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল, তাদের পিঠ চাপড়ে অভয় দিচ্ছেন।

NOT FOR SALE

অভিনয় শুরু হল সাড়ে সাতটায়। দর্শক চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এমন সময় ড্রপ সরে গেল।

বনবালাদের গান। ঝুমা, মিলি, মিঠু, বাবলী, সরস্বতী আর লালী। বনে অসময়ে বসন্ত এসেছে, তাই তারা হতবাক। তারা জানে না ঋতুরাজ শ্রীরামচন্দ্র এখানে পদার্পণ করেছেন।

তাদের গান বেশ ভালই হল। বাড়তি কায়দা হিসাবে দু-একজন পায়ের কাজ দেখাল। তাতেই একটু গোল বাধল। অবশ্য দর্শকদের চোখে ধরা পড়ল না।

পায়ের মুদ্রা দেখাতে গিয়ে মিলির পা ঝুমার পায়ে ঠেকে গেল। তার ঝকঝকে নতুন শাড়ীতেও। ঝুমাও ছাড়বার মেয়ে নয়। দু-হাত কোমরে দিয়ে নাচের ভঙ্গী করে মিলির পিঠে কনুইয়ের গুঁতো দিল। মিলি নেচে নেচে ঝুমাকে ধরবার চেষ্টা করল, ঝুমাও অন্য মেয়েদের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে ঘুরে তাকে এড়িয়ে যেতে লাগল।

দর্শকরা ভাবল এটা বুঝি নাচেরই একটা বিশেষ অঙ্গ। তারা হাততালি দিয়ে দুজনকে সংবর্ধিত করল।

ড্রপ নেমে আসতে ব্যাপারটার ইতি হল।

ড্রপ টানছে অখিল। নির্দেশ দিচ্ছে বাবু। তার গলায় সুতো বাঁধা হুইসিল। প্রোগ্রাম ধরে ধরে সুব্রত সাজঘর থেকে কোন্ দৃশ্যে কে আসবে তার ব্যবস্থা করছে।

পরেরটা খুব জমজমাট সীন।

বিশ্বামিত্র, রাম, লক্ষ্মণ, তিনজনকেই চমৎকার মানিয়েছে। রাম লক্ষ্মণের কাঁধে ধনুক। পিঠে তূণ। তাতে তীরের ফলা ঝকঝক করছে।

বিশ্বামিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা করছে। আর রাম লক্ষ্মণ শুনছে। ওর মধ্যেই লক্ষ্মণ একবার দর্শকবৃন্দের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখল। মা আর কাকীমা পাশাপাশি বসেছে। দুজনেই ফিকফিক করে হাসছে।

হাসির কী ব্যাপার হল? এমন একটা পৌরাণিক দৃশ্যে হাসির খোরাক থাকার কথা নয়। তবে কি ওর চুলের চুড়োটা ঠিকমত হয়নি? সবাই মিলে যা তাড়াহুড়ো করল, আর কয়েকটা ক্লিপ আঁটতে পারলে ভাল হত। লক্ষ্মণ একটু ম্রিয়মাণ হয়ে রইল।

কিন্তু বুলির প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই হাসির ফোয়ারা ছুটল। নবদুর্বাদল শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষেও হাসি চাপা দুষ্কর হয়ে উঠল।

আজানুলম্বিত পাকা দাড়ি, গোঁফ জোড়াও গাল ছেড়ে বেশ কয়েক আঙুল বেরিয়ে পড়েছে। একে বেচারী একটু খর্বকায়, তার ওপর জটার ভার আর গোঁফ দাড়ির ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়রান হয়ে পড়েছে।

NOT FOR SALE

বুলি বিতপা মুনি। প্রায় দুর্বাসারই সহোদর। কথায় কথায় ক্রোধ। মিনিটে মিনিটে অভিশাপ। তার অনুমতি না নিয়ে বিশ্বামিত্র এ অরণ্যে প্রবেশ করাতে বিতপা মুনি হুতাশনের মতন জ্বলে উঠেছে। এ চরিত্র রামায়ণে সেই হীরুবাবুর সৃষ্টি।

বিতপা যত চটে মটে কথা বলতে যায়, গোঁফ দাড়ি তত বাদ সাধে। কিছু চুল মুখের মধ্যে। গোঁফের প্রান্ত কানে সুড়সুড়ি দিতে শুরু করেছে। তার ওপর আবার হীরুবাবুর অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

ফলে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়াল।

রে অর্বাচীন ঋষি, এত স্পর্ধা তোর!

[দুত্তোর গোঁফের নিকুচি করেছে]

কোন্ বলে হয়ে বলীয়ান এ অরণ্যে পশেছিস তুই?

[ফিক ফিক করে হাসি, কারণ গোঁফের প্রান্ত কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছে]

জান না দুর্মতি, হেথা মহাতেজা মহর্ষি বিতপা করে অবস্থান।

[একমুঠো চুল মুখে চলে গেল। বমি না হয়]

তিষ্ঠ হেথা নরাধম, নতুবা যোগ বলে ভস্মস্তূপে পরিণত করিব রে তোরে।

[পার্টের পায়ে নমস্কার। গোঁফদাড়ি পরতে হবে বলে ছেলে হয়ে জন্মালাম না। উঃ]

নাটক বহির্ভূত কথাগুলো মৃদুকণ্ঠে হলেও, সামনের কয়েকসারির দর্শকদের বেশ কানে গেল। কিন্তু যারা একটু দূরে বসেছিল, তারা ঠিক বুঝতে পারল না। তারা ভাবল, বিতপা মুনি কথা বলবার ফাঁকে ফাঁকে দাঁত কিড়মিড় করে অভিশাপ দিচ্ছে।

পরে রামের মধুর বিনয় নম্র কথা শুনে বিতপা মুনি একটু ঠাণ্ডা হল। বিশ্বামিত্র, রাম আর লক্ষ্মণকে নিজের কুটিরে আমন্ত্রণ জানাল।

এ দৃশ্যটাও উতরে গেল।

ড্রপ পড়তেই বুলি দ্রুতপায়ে ভিতরে চলে এল। অবশ্য এর পরের দৃশ্যেও বিতপা মুনি আছে। প্রোগ্রামে লেখা স্থান—মুনির আশ্রম। কাল—সন্ধ্যা।

গোটা কয়েক বাতি নিবিয়ে দেওয়া হল। আর বাকি বাতিকটার সামনে বাবু পিচবোর্ড আটকে দিল। সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে বোঝাবার জন্য।

হীরুবাবু ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বুলিকে ঢুকতে দেখে বললেন, একী তুমি আবার স্টেজ ছাড়লে কেন?

এক হাত দিয়ে কোনরকমে দাঁড়ি-গোঁফ খুলে ফেলে বুলি বলল, স্টেজ কেন, এমন অবস্থা হলে, লোকে ভিটেমাটি পর্যন্ত ছাড়তে পারে।

NOT FOR SALE

কী হল কী?

ছারপোকা। কটা আছে কে জানে, তখন থেকে কুটকুট করে কামড়াচ্ছে।

শেষ দিকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে ভালভাবে কথা বলব কি, ছারপোকার কামড়ে প্রাণ যাচ্ছে।

ওঃ, সেইজন্য তোমার অনুতপ্ত কথাগুলোও একটু গরম গরম ঠেকছিল। দেখি দাড়িটা।

শুধু দাড়ি নয়, বিতপা মুনি দাড়ি গোঁফ দুটোই নির্বিবাদে হীরুবাবুর হাতে সমর্পণ করল।

আলোর কাছে নিয়ে এসে হীরুবাবু তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। ছোরপোকা দূরে থাক, ছারপোকার ডিমও নেই।

তারপর কথাটা মনে পড়তে বললেন, বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা। ছারপোকা নয় আটকাবার জন্য যে তারগুলো রয়েছে, সেগুলোই বোধহয় ফুটেছে।

বুলি বিরক্ত হল। মুনি ঋষির দাড়ি গোঁফ নিয়ে এই অপৌরাণিক রসিকতা করার কোন মানে হয়!

তাও কি আর একটা দুটো তার। অজস্র তারের খেলা। সার্কাসেও বোধ হয় এত থাকে না।

হঠাৎ হুইসিল পড়ে ড্রপ উঠে গেল। বিশ্বামিত্র, রাম। লক্ষ্মণ আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিল আসরে। বিতপা মুনিরও সেখানে থাকা উচিত ছিল, কারণ তার আশ্রমে এরা অতিথি।

বুলি ছুটে আসরে ঢুকল, হাতে গোঁফ-দাড়ি।

স্বাগত হে নরশ্রেষ্ঠ দীনের কুটিরে
বনভূমি ধন্য আজি তোমার পরশে।

দাঁড়ি-গোঁফের বাধা নেই, কাজেই বিতপা মুনি চমৎকারভাবে আবৃত্তি করে গেল। কোন অসুবিধা হল না।

লোকেরা কিন্তু তারিফ করার বদলে হেসে লুটিয়ে পড়ল।

প্রথমে বিশ্বামিত্র খেয়াল করেনি। ভাবাবেগে চোখ বন্ধ করেছিল। লক্ষ্মণ একটু অন্যমনস্ক ছিল। সাজঘরে বাচ্চা মেয়েরা লুচি তরকারি শেষ করছে। তাদের সঙ্গে ডলিও রয়েছে। অথচ কথা ছিল অভিনয় শেষ হলে সবাই একসঙ্গে খাবে। কী অন্যায়। অভিনয় শেষ হতে হতে লুচি তরকারিও শেষ।

মনে মনে লক্ষ্মণ ভাবল, একটা লুচি আর একটু আলু নিয়ে এলেই হত। তার তো পার্ট বেশী নয়। অন্য লোকের সংলাপের সময় রামের আড়ালে গিয়ে মুখে পুরে দিলে কে আর দেখত। অহল্যা উদ্ধার করতে এসেছে বলে লক্ষ্মণ উপবাসী থাকবে, রামায়ণে এমন কথা লেখা নেই।

NOT FOR SALE

কিন্তু রামের ঠিক চোখে পড়ে গেল।

সর্বনাশ, কোথাকার দাড়ি-গোঁফ কোথায় এসেছে। ভাবল, বিশ্বামিত্রের পাশ কাটিয়ে গিয়ে বুলিকে সাবধান করে দেবে, কিন্তু পারল না। বিশ্বামিত্র দুটো হাত প্রসারিত করে আহ্বান করছে বিতপাকে। তার পাশ দিয়ে যাবার জায়গা নেই।

রাম এক মতলব করল। হঠাৎ নতজানু হয়ে বসে বিশ্বামিত্রের কথা থামতেই বিতপা মুনির দিকে চেয়ে বলল,

ঋষি শ্রেষ্ঠ, এ কি অলৌকিক মায়াজাল করিলে বিস্তার।

গুম্ফ শ্মশ্রু উন্মোচিত করিলে কিভাবে প্রভু?

তখন বুলির খেয়াল হল। সর্বনাশ, উপায়! এখন এ গোঁফ-দাড়ি পড়তে গেলে লোকে তো আরও হাসবে। আরো হইচই করবে।

রামের কথায় দর্শকরা একটু ঘাবড়ে গেছে। ভাবছে বিতপা মুনি এইভাবে দাড়ি গোঁফ হাতে নিয়েই এ দৃশ্যে অভিনয় করবে।

কিন্তু বুলিও ছাড়বার পাত্রী নয়। দিদি মনে মনে তৈরী করে বাড়তি সংলাপ বলে প্রশংসা পাবে, আর সে চুপচাপ থাকবে তা কখনও হতে পারে।

মনে মনে একটু ভেবে নিয়ে বুলি গম্ভীর গলায় বলল,

বৎস এ নহে মায়ার বিস্তার।

তুচ্ছ ছারকীট অত্যাচারে নিপীড়িত আমি।

তাই গুম্ফ শ্মশ্রু করেছি নির্মূল।

পরিত্যাণ করিনু জঞ্জাল।

কথা শেষ করে বুলি দাড়ি-গোঁফ ছুঁড়ে ভিতরের দিকে ফেলে দিল।

সেই দিকে বসে হাসি প্রম্পট্ করছিল। রাম আর বিতপা নিজেদের তৈরী সংলাপ বলে যাওয়াতে সে বেচারী বিপদে পড়েছিল। তন্ন তন্ন করে বইয়ের পাতা খুঁজেও এসব কথা পাচ্ছিল না। কয়েকবার পাতা উলটে এদিক ওদিক দেখল, কিন্তু কোথাও দাড়ি-গোঁফের সংলাপ নেই।

হতাশ হয়ে মুখ তুলে চাইবার সঙ্গে সঙ্গে আরো বিপদ। বিতপা মুনির পরিত্যক্ত দাড়ি-গোঁফ হাসির চুলের ক্লিপের সঙ্গে আটকে গিয়ে তার মুখে ঝুলতে লাগল।

সংলাপ খুঁজে না পেয়ে ইতিমধ্যে তার মেজাজ গরম হয়েছিল, তারপর পরের দাড়ি-গোঁফ মুখের ওপর উড়ে এসে জুড়ে বসাতে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। সেই গোঁফ-দাড়ি শুদ্ধ স্টেজের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। বলল, তোরা ভেবেছিস কি মনে? যা ইচ্ছে তাই বলে যাবি অথচ আমাকে বলবি প্রম্পট্ করতে? তার ওপর দাড়ি-গোঁফ আমি পড়তে যাব কেন? প্রম্পটার কি কোথাও দাড়ি-গোঁফ পরে? এই রইল তোদের বই, আর রইল তোদের গোঁফ-দাড়ি।

NOT FOR SALE

বইটা হাসি আছড়ে ফেলল স্টেজের ওপর, কিন্তু গোঁফ-দাড়ি অনেক চেষ্টা করেও খুলতে পারল না। তার চুলের ক্লিপের সঙ্গে মোক্ষমভাবে সেগুলো আটকে গেছে। ফলে দাড়ি-গোঁফ সুদ্ধ হাসি লাফাতে লাগল স্টেজের ওপর।

হীরুদা বুদ্ধি করে ড্রপ ফেলে দিলেন বটে। কিন্তু দর্শকরা তখন হাসিতে ফেটে পড়েছে।

অনেক খোসামোদ করে হাসিকে ঠাণ্ডা করা হল। আর একটা মাত্র দৃশ্য। কোন রকমে এটা শেষ করতে পারলে হীরুবাবু গঙ্গাস্নান করে বাঁচবেন। মাথায় থাক বাঙলার সংস্কৃতি।

শেষ দৃশ্য। এই দৃশ্যে একটু কেরামতি ছিল। অনেক কষ্টে হীরুবাবু জিনিসটা কল্পনা করেছিলেন।

গেরুয়া রঙের পিচবোর্ড দিয়ে একটা পাথরের চাঁইয়ের রূপ দেওয়া হয়েছে। দুটো বেঞ্চের মাঝখানে একটু ফাঁক। তার মধ্যে অহল্যারূপী ফুচি শুয়ে থাকবে। তার ওপর রামচন্দ্র পা ঠেকালেই পিচবোর্ড ভেঙে পড়বে দুপাশে আর অহল্যা নৃত্যের ভঙ্গী করে জেগে উঠবে। হীরুবাবুর খুব আশা এমন জমাট দৃশ্য দর্শকদের আনন্দ দেবেই। তাদের হতবাক্‌ও করে দিতে পারে।

স্টেজ ছায়াচ্ছন্ন করে দেওয়া হল বাতি নিবিয়ে। শুধু দুটি বাতি দু কোণে জ্বলতে লাগল। ফুচি অনেক আগে থেকেই শুয়েছিল বেঞ্চের ফাঁকে। বেচারীর মাত্র এক সীন পার্ট, কিন্তু মোক্ষম পার্ট। নাচতে নাচতে নিবেদনের ভঙ্গীতে রামের শ্রীচরণে লুটিয়ে পড়বে। ঠিক মত করতে পারলে এই একটা দৃশ্যেই জমিয়ে দেবে। আবার বিশ্বামিত্র রাম আর লক্ষ্মণ প্রবেশ করল। আসরের মাঝখানে পাথর রূপী পিচবোর্ড। তার তলায় ফুচি অহল্যার বেশে।

এদিক থেকে করুণ সুরে বেহালা বাজছে। বিশ্বামিত্র নিজে শ্রীরামের বন্দনা শুরু করেছে। রাম যে নরদেহে নারায়ণ এ তত্ত্ব পৃথিবীর লোককে জানাচ্ছে। রাম নতমুখ। লক্ষ্মণও মুখটা ফিরিয়ে রয়েছে আসরের দিক থেকে। কারণ, তার মুখে বড় সাইজের একটা আলু। দাদার দেব মহিমা উপলব্ধি করছে আর একটু একটু করে আলু কামড়াচ্ছে।

বিশ্বামিত্র বন্দনা শেষ করে রামকে অনুরোধ করল পাদস্পর্শে পাষাণী অহল্যাকে উদ্ধার করার জন্য।

খুব ধীরে ধীরে রাম অগ্রসর হল। সমস্ত আসর নিঃস্তব্ধ। দু-একটি বৃদ্ধা চোখে আঙুল চাপা দিয়েছে। কয়েকজন ভক্তিরসের আধিক্যে ফুলে ফুলে উঠছে।

রামচন্দ্র নিজের দক্ষিণ পা পিচবোর্ডের উপর রাখল। অহল্যার সাড়া নেই।

কথা ছিল, মীরা পা ছোঁওয়ালেই ফুচি হাত দিয়ে পিচবোর্ডের

NOT FOR SALE

টুকরোগুলো সরিয়ে উঠে দাঁড়াবে। ঠিক মনে হবে পাষাণ চুর্ণ করে শাপমুক্তা অহল্যা নবজীবন লাভ করেছে।

মীরা গোড়ালি দিয়ে দু-একবার ঠুকল পিচবোর্ডের ওপর। এবারেও অহল্যা নীরব।

লক্ষ্মণ কৌতূহলী হয়ে একটু উঁকি দিয়েই চমকে উঠল। ফুচি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে।

সর্বনাশ! এ দৃশ্যে লক্ষ্মণের কথা নেই, কিন্তু কাজল নিজেকে সামলাতে পারল না। অবস্থা দেখে কথা বলে ফেলল।

মুখ খুলতেই আলুর টুকরো ছিটকে পড়ল বিশ্বামিত্রের পিঠে। বিশ্বামিত্র একটু চমকে উঠল বটে, কিন্তু সামলে নিল।

একটা যে গোলমাল হয়েছে সেটা আসরের ধারে বসা ছেলের দল ঠিক বুঝতে পারল। বাবু অখিলকে বলল, এইরে ফুর্চিদিদি ঘুমিয়ে পড়েছে, কী হবে?

অখিল পাশে পড়ে থাকা একটা বাঁশের টুকরো তুলে নিয়ে বলল, রাঙাদির যা দারুণ ঘুম। খোঁচা না দিলে কিছুতেই উঠবে না। মা তো রোজ পাখার খোঁচা দিয়ে তবে ওঠায়।

এদিকে রামচন্দ্র পা ঠুকে ঠুকে হয়রান। অহল্যা উদ্ধারের কোন লক্ষণই নেই। দর্শকরা শ্রীরামের দেবত্বে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে।

অখিল শুয়ে পড়ে বেঞ্চের তলায় বার দুয়েক খোঁচা দিল। ফুচির পিঠে, মাথায়। কাজ হল। ধমাস করে অহল্যা উঠে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে পিচবোর্ডের স্তূপ ভেঙে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পাথর ভেঙে আবার মানবীরূপে জেগে উঠল অহল্যা।

জেগে উঠে কিন্তু অদ্ভুত সব কথা বলতে লাগল।

এ কীরে এত রাত্তির হয়েছে, আমাকে আগে জাগাসনি? বিকেলের চা পর্যন্ত খাওয়া হয়নি, তোরা খেয়েছিস?

দর্শকরা পাল চাপা দেবার আগে হীরুবাবু ক্ষিপ্রহাতে ড্রপ টেনে দিলেন। তারপর আর তিলমাত্র অপেক্ষা করলেন না, পিছনের দরজা দিয়ে একেবারে পদ্মপুকুর।

দর্শকরা কোলাহল করতে করতে বেরিয়ে গেল।

সকলের গলা ছাপিয়ে ঠাকুমার কণ্ঠ শোনা গেল।

খুব হয়েছে, জেলেপাড়া যাত্রাপার্টি, খুব যাত্রা করেছ। এখন একটি একটি করে সব কাঠ আর বাঁশ ছোট ঘরে তুলে রাখ, না হলে শুধু অহল্যা উদ্ধার নয়, তোমাদের সবাইকে আমি উদ্ধার করব।

—সমাপ্ত—

NOT FOR SALE

বাল্লার বাহাদুরী

বয়স বারো বছর হলে হবে কী, কথা বলে বাহাত্তর বছরের বুড়োর মতন।

উড়িষ্যার ছোট্ট এক শহর। চারদিকে পাহাড় আর জঙ্গল দিয়ে ঘেরা। শহরের মাঝখানে ইস্পাত তৈরির কারখানা। তারই চারপাশ ঘিরে লোকের বসতি গড়ে উঠেছে।

বাল্লা পুজোর ছুটিতে বেড়াতে এসেছে পিসেমশাইয়ের কাছে। এদিক ওদিক যা দেখে, তাতেই নাক সিঁটকোয়। বাহাত্তর বছরের বুড়োর মতন পাকা পাকা কথা বলে।

একপাল সমবয়সী ছেলে সঙ্গী জুটেছে। তারাই বাল্লাকে সব দেখায়, কিন্তু বাল্লার বড় বড় কথার সামনে অবাক্ বনে থেমে যায়।

কুণাল একদিন বলল, ওই যে পশ্চিম দিকের বন দেখছ, সবাই বলে ওর মধ্যে নাকি চিতাবাঘ আছে। কী ঘন বন দেখছ, ভিতরে ঢোকাই যায় না।

বাল্লা নাক দিয়ে ঘোড়ার মতন একটা শব্দ করল। অবজ্ঞাসূচক। ছেলেদের দিকে ফিরে বলল, এ আবার একটা বন নাকি! এ তো ছোট একটা জঙ্গল। বন হচ্ছে সুন্দরবন। দিনের বেলা সূর্যের আলো যেমন যায় না, তেমনই রাতের বেলা চাঁদের আলোরও ঢোকবার উপায় নেই। আর বাঘ? চিতাবাঘ আবার বাঘ নাকি, ও তো বনবেড়াল। বাঘ বটে সুন্দরবনের। আমার মামাতো ভাই ঝন্টুদা যে বাঘটা সেদিন মারল সেটাই সতেরো হাত, অবশ্য ল্যাজ নিয়ে।

টুমু একমনে কথাগুলো শুনছিল। এবার বলল, কিসে মারল বাঘটাকে? পিস্তলে না রাইফেলে?

বাল্লা চোখ-মুখের অদ্ভুত একটা ভঙ্গী করে বলল, না, ঝন্টুদা বন্দুক পিস্তল কখনও ছোঁয় না। বাঘ শিকারের জন্য তো নয়ই। বলে, তা হলে আর সমানে সমানে লড়াই হল কোথায়? স্রেফ এক চড়ে বাঘটা মেরেছিল।

—এক চড়ে? আশপাশের সবাই একসঙ্গে প্রশ্ন করল।

বাল্লা একটা ইঁট পেতে ভাল হয়ে বসল। সকলের দিকে চেয়ে বলল, অবশ্য অসুবিধা একটু হয়েছিল। এপাশে ঝন্টুদা, ওপাশে বাঘ। মাঝখানে মাতলা নদীর খাল।

বাল্লার সঙ্গীরা সবাই তাকে ঘিরে বসল। এরকম এক চড়ে বাঘ মারার কাহিনী শোনবার জন্য।

NOT FOR SALE

বাঘ মানে রয়াল বেঙ্গল টাইগার। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে নাম হয়েছে ন্যালনাল বেঙ্গল টাইগার। জল খেতে এসেছিল—এপারে মানুষ দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখের পলক আর পড়ে না—জিভ দিয়ে লালও ঝরতে আরম্ভ করল। একবার একটা লোককে লাফিয়ে গাছ থেকে পেড়ে খেয়েছিল। দিন সাতেক আগেও নৌকা থেকে একটা আট বছরের বাচ্চাকে টেনে নিয়ে খেয়েছিল। সে স্বাদ এখনও জিভে লেগে রয়েছে। এবার একসঙ্গে একেবারে একজোড়া মানুষের বাচ্চা। কাজেই লোভ সামলানো দায়।

—এক জোড়া কেন? কুণাল প্রশ্ন করল।

—এক জোড়া মানে ঝন্টু আর টুন্টু দুই ভাই ছিল কিনা। ঝন্টুদা শিকারে এসেছিল আর টুন্টু সুদ আদায় করতে। সুন্দরবনের চাষী আর মধু-সংগ্রহকারীদের টুন্টু বছরের প্রথম দিকে টাকা ধার দেয় আর শীতকালে আসে সুদ আদায় করতে। সেই ঝন্টুদাকে আঙুল দিয়ে বাঘটাকে দেখাল। বলল, দাদা, ওই বাঘটাকে সাবাড় করে এস আগে, নইলে এখনই বিশ্রীভাবে চেঁচাতে শুরু করবে আর আমার সুদের হিসাব সব যাবে গোলমাল হয়ে। একে তো আরফান আলির ছত্রিশ নয়া পয়সার হিসাবটা কিছুতেই মেলাতে পারছি না।

ঝন্টুদা কোমরে বেল্টটা এঁটে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাঘমারা ওর কাছে একটা সমস্যাই নয়। কেবল মুশকিল হচ্ছে, ওপারে যাবে কী করে? শীতকালে অবশ্য জল কম, কিন্তু ঝন্টুদা একটুও সাঁতার জানে না। জলে নামলেই মারবেলের মতন টুপ করে ডুবে যাবে। বাঘটাকে এপারে যে আসতে বলবে, তাও সম্ভব নয়। একে তো বাঘ সভ্য ভাষা বোঝে না, তার ওপর এই শীতে ও যে জলে নামবে এমন ভরসা কম।

উপায়! এদিকওদিক দেখতে দেখতেই উপায় হয়ে গেল। একটু দূরে পারের ওপর প্রকান্ড একটা কুমির রোদ পোহাচ্ছে। ঝন্টুদা প্যান্টের পকেট থেকে দড়ি, পেরেক আর ছোট একটা হাতুড়ি বের করে কুমিরের দিকে এগিয়ে গেল। পা টিপে টিপে।

সুব্রত বলল, এসব জিনিস সব সময় তোর দাদার পকেটে থাকে বুঝি?

—থাকবে না! সুন্দরবনে কখন কী দরকার হয় ঠিক আছে! এসব আর কী? আর এক পকেটে সব সময়ে ক্যামেরা, মাইক্রোসকোপ, দেশলাই, ওষুধের শিশি কত কী যে থাকে, তার ঠিক নেই। তারপর ঝন্টুদা কুমিরের কাছে গিয়েই তার পিঠের ওপর লাফিয়ে উঠল। কুমিরটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। সঙ্গে সঙ্গে ঝন্টুদা নীচু হয়ে কুমিরের নাকে পেরেক দিয়ে একটা ফুটো করে তাতে দড়ি পরিয়ে দিল। তারপর দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে রইল কুমিরের পিঠে।

অখিল এতক্ষণ দুটো চোখ বিস্ফারিত করে গল্প শুনছিল। এবারে বলল, বুঝতে পেরেছি বাল্লাদা, কুমির স্টীমলঞ্চ হয়ে গেল।

NOT FOR SALE

খুশী হয়ে বাল্লা বলল, ঠিক বলেছিস। তারপর দড়িতে টান দিয়ে কুমিরের মুখ ঘুরিয়ে ওপারে পৌঁছতে ঝন্টুদার দশ মিনিটের বেশী লাগল না। এসব ব্যাপার দেখে বাঘটাও হতভম্ব হয়ে গেছে। পালাবার কথা আর তার মনে নেই। ঝন্টুদা একেবারে সামনাসামনি গিয়ে বাঘের গালে পেল্লায় এক চড়। ব্যস্, এক চড়েই বাঘের চোয়াল খুলে গেল। অন্তিমকালে একবার হালুম বলার সময়ও পেল না। তারপর ঝন্টুদা সেই বাঘকে কুমিরের পিঠে চাপিয়ে দড়ি ঘুরিয়ে আবার এপারে এসে নামল।

শ্রোতারা সবাই বিস্ময়ে হতবাক। এমন একটা ঘটনা শোনার পর আর বাল্লাকে এখানকার জঙ্গল আর চিতাবাঘের কথা বলাই চলে না।

তাই কুণাল এবার পাহাড়ের দিকে ফিরল।

—এখানকার পাহাড়গুলো কিন্তু খুব উঁচু। কী খাড়া পাহাড়, ওঠাই দায়।

বাল্লা দুচোখে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি ফোটাল—দূর, দূর, ওগুলো আবার পাহাড় নাকি! পাহাড় হচ্ছে হিমালয়! এসব হচ্ছে টিলা, টিলা।

অখিল দার্জিলিং গিয়েছিল। সে বলল, সত্যি বাল্লাদা, কী উঁচু আর বরফে ঢাকা!

বাল্লা ধমক দিল, থাম্! কী উঁচু! তুই উঠে দেখেছিস? পড়ার বইতেই তো পড়েছিস খুব উঁচু!

সুব্রত বলল, কেন তেনজিং আর হিলারী তো উঠেছিলেন। তাঁরা যে বিবরণ দিয়েছেন—

—চুপ কর, চুপ কর, বাল্লা যেন খেপে গেল, ওই বিবরণই মুখস্থ করে বসে আছিস। আসল কথা ওদের দুজনের কেউই বলেনি। না তিনু, না হিলু।

—সে কি?—আবার সমবেত কলস্বর।

আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই। দুজন নয়, তিনজন উঠতে শুরু করেছিল একসঙ্গে তেনজিং, হিলারী আর আমার আপন দাদা প্রবীর।

—তবে তোর দাদার নাম নেই কেন?—কুণাল প্রশ্নের খোঁচা তুলল।

—থাকবে আর কী করে। দাদার যা কাণ্ড। আনন্দ হলে যে আর জ্ঞান থাকে না!

দু-একজন উঠে দাঁড়িয়েছিল। আবার সবাই বাল্লাকে ঘিরে বসল। শুনতে হবে ব্যাপারটা।

—আটাশ হাজার বিরানব্বই ফুট উঠে তেনজিং, হিলারী দুজনেই কাত। তেনজিংয়ের গোড়ালি অবধি বরফ হয়ে গিয়েছিল আর হিলারীর নাকের ফুটোয় তুষারকণা জমে নিশ্বাস প্রায় বন্ধ। একটা নাকে আর কতটা নিশ্বাস নেবে?

অখিল ভয়ে ভয়ে বলল, কিন্তু নাকে তো অক্সিজেন পাইপ থাকে।

বাল্লা তেড়ে উঠল, খুব সবজান্তা হয়েছিস। অত ওপরে অক্সিজেনও তো

NOT FOR SALE

বরফ হয়ে যায়। দাদা যখন বাড়ি ফিরল, তখন দুটো চোখই বরফের হয়ে গেছে। সাত দিন আগুনের পাশে পাশে রাখার পর, তবে একটু একটু করে বরফ গলে।

এরপর আর কথা চলে না।

সবাই বলল, তারপর?

—তারপর দাদা প্রায় চুড়োর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, আর পৌনে এগারো ফুট বাকী, ব্যস দাদা আনন্দে আত্মহারা। জ্ঞান নেই। আনন্দ হলেই দাদা ভারতনাট্যম্ শুরু করে। বরফের ওপর তাই আরম্ভ করল। গোটা চারেক মুদ্রা সবে দেখিয়েছে, অমনি পা গেল হড়কে। বরফের ওপর দিয়ে দাদা গড়াতে শুরু করল। সর্বাঙ্গে বরফ শুধু মাথায় উলের টুপিটা দেখা যাচ্ছে।

তেনজিং আর হিলারী বসে বসে কোমরে সরষের তেল মালিশ করছিল, সেই দৃশ্য দেখেই লাফিয়ে উঠল। দুজনেরই চুল খাড়া করে ভয়ে দু-জোড়া ঠোঁট থরথর করে কাঁপছিল। এ নিশ্চয় হিমালয়ের তুষারমানুষ। মানুষের গন্ধ পেয়ে তাড়া করে আসছে। দুজনেই দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে আরম্ভ করল। কিছুক্ষণ পরেই খেয়াল হল দুজনে একেবারে চুড়োয় উঠে গেছে। দাদা নিজের সর্বনাশ নিজে করল। কাকে আর দোষ দেব।

আপসোসের ভঙ্গীতে বাল্লা ঘাড় নাড়ল।

সবাই চুপ করে বসে শুনল। একটি কথাও বলল না। তার পরের দিনই ছেলেদের একটা জরুরী সভা বসল। কেবল বাল্লাকে বাদ দিয়ে।

কুণাল বলল, অসহ্য। চালিয়াৎ বাল্লার বড় বড় কথা আর সহ্য করতে পারছি না। ওকে জব্দ করতেই হবে।

সুব্রত সায় দিল, 'হ্যাঁ, এমন জব্দ, যাতে বাছা আর কথাটি বলতে না পারে।

অনেক ভেবে চিন্তে মতলবও একটা ঠিক হল।

ভোরবেলা বাল্লা বেড়াতে বেরোয়। প্রথমে একলা, তারপর এক এক করে সঙ্গী জুটে যায়, কারণ বাল্লার পিসেমশাইয়ের বাসাটা একেবারে কোণের দিকে।

ঠিক হল কুণাল ভাল্লুক সেজে বাল্লাদের বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবে। দরজা খুলে জলজ্যান্ত ভাল্লুক দেখলেই নির্ঘাত বাল্লার দাঁতকপাটি লেগে যাবে। ভয়ে যখন ভিরমি যাবে তখন আড়াল থেকে বেরিয়ে সবাই তাকে টিটকিরি দেবে। বলবে, জয়, সাহসী বাল্লাবীরের জয়।

পরামর্শটা কিন্তু গোপন রইল না। ইতিমধ্যে টুমু বাল্লার খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে। সে চুপিচুপি বাল্লাকে গিয়ে খবর দিল।

—জান বাল্লাদা, তোমাকে সবাই মিলে এই রকম করে জব্দ করবে।

সব শুনে বাল্লা বলল, ঠিক আছে। আসুক কুণাল ভাল্লুক সেজে, তাকে একেবারে শেয়ালমারা করব।

NOT FOR SALE

পরের দিন ভোরবেলা বাল্লা দরজা খুলে বেরোল। রোজকার মতন পোশাক। বাড়তির মধ্যে কেবল হাতে একটা বেতের ছড়ি। পিসেমশাইয়ের কাছ থেকে ধার করা।

চাতালে দাঁড়িয়ে একটু লক্ষ্য করতেই দেখতে পেল। মহুয়া গাছের পাশে গাছ ধরে ভাল্লুক দাঁড়িয়ে। বোধ হয় কুণাল অপেক্ষায় রয়েছে, বাল্লা কাছ বরাবর গেলেই আচমকা তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে তাকে ভয় দেখাবে।

বাল্লা আস্তে আস্তে বাগানের পিছন দিয়ে ভাল্লুকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ভাল্লুকটাকে ঘাড় ফেরাবার অবসর না দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

—তবে রে বদমাইশ, এতখানি সাহস, আমাকে ভয় দেখাবি। আজ তোর একদিন, কি আমার একদিন। তোর হাড় এক জায়গায় আর মাস এক জায়গায় করব, আর চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাব।

কথা আর সেই সঙ্গে ছড়ির সপাত্ সপাত্। ভাল্লুকটা প্রথমে বেশ একটু হকচকিয়ে গেল তারপর ঘোঁতঘোঁত শব্দ করে তীরবেগে ছুটতে আরম্ভ করল।

বাল্লাও ছাড়বার পাত্র নয়। ভাল্লুকটার পিছনে ছুটল। উদ্দেশ্য ভাল্লুকের চামড়াটা খুলে কুণালকে বের করবে।

একটু এগিয়েই বাল্লা থেমে গেল। ঝোপের আড়াল থেকে ছেলেরা চেঁচাচ্ছে, এই বাল্লা যাসনি। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিসনি। দাঁড়িয়ে পড়।

বাল্লা দাঁড়াতে ছেলের পাল তাকে ঘিরে ফেলল। সামনেই কুণাল। তার কাঁধের ওপর ভাল্লুকের চামড়া। হাতে ভাল্লুকের মুখোশ।

বাল্লা একবার কুণালের দিকে আর একবার জঙ্গলের আড়ালে প্রায় মিলিয়ে যাওয়া ভাল্লুকটার দিকে চেয়ে, অ্যা বলে রাস্তার ওপরই লুটিয়ে পড়ল।

জ্ঞান হবার পর সবাই জিজ্ঞাসা করল, কীরে মৃগী আছে নাকি? হঠাৎ অ্যাঁ বলে মূর্ছা গেলি যে?

বাল্লা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, মূর্ছা গেলাম ভয়ে।

—ভয়ে?

—হ্যাঁ রে। প্রবীরদা কিংবা ঝন্টুদা যদি শোনে ছড়ি দিয়ে ভাল্লুক ঠেঙিয়েছি, এক চড়ে সাবাড় করতে পারিনি, তা হলে আমাকেই এক চড়ে খতম করে দেবে। সেই ভয়েই জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

দলের সবাই একবাক্যে স্বীকার করল বাহাদুর ছেলে বটে বাল্লা।

কেবল টুমু হাসতে লাগল মুখ টিপে টিপে।

—সমাপ্ত—

NOT FOR SALE

পিকনিক

মতলবটা প্রথম ডলির মাথায় এল। বেচারী মাসের মধ্যে দশদিন বিছানায় শুয়ে থাকে। জ্বর, গায়ে ব্যথা, সেই সঙ্গে নিশ্বাসের কষ্ট অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, টোটকা কিছু বাকী থাকে না। তারপর একদিন ঝেড়েঝুড়ে ওঠে। বই বগলে করে স্কুল যেতে আরম্ভ করে। মাকে লুকিয়ে একটু আধটু অনিয়ম করে। টিফিনের পয়সায় তেঁতুলের আচার কিনে খায়। কুপথ্য কিছু বাকী রাখে না। আবার এক সময়ে নিজেই বিছানায় শুয়ে পড়ে। গায়ের চাদরটা দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে চাকরটাকে ডেকে বলে, ভীম, মোড়ের ডাক্তার মজুমদারকে একবার খবর দাও তো। বলে, ডলি ব্যানার্জি বিছানায় শুয়েছে।

ডলির অনেকদিনের সাধ, সবাই মিলে একবার পিকনিক করবে। ওদের স্কুলে বার দুয়েক পিকনিক হয়েছে, কিন্তু দুবারই সে শয্যাগত। বসে বসে দিদিমণিদের সঙ্গে ফর্দ করেছে। কে কোন্ কাজের ভার নেবে, তাও ঠিক হয়েছে। অথচ পিকনিকের ঠিক আগের দিন বিকেল থেকে কাশি। দুর্জনে অর্থাৎ বাড়ির অভিভাবকেরা বলে এর জন্য দায়ী কাঁচা আমড়া, কিন্তু ডলি বলে বরাত। আগের জন্মে বোধ হয় নিজের ছেলেমেয়েদের পিকনিকে যেতে দেয়নি, তাই এ জন্মে এই অবস্থা।

এবার ডলি একটানা দু মাস ভাল রয়েছে। আশ্চর্য কাণ্ড আরও আশ্চর্য, লুকিয়ে কামরাঙ্গা কামড়ানো সত্ত্বেও, জ্বর আসেনি। কি জানি কিসে সারল। ডাক্তার বসাকের লাল ওষুধে, না ডাক্তার মজুমদারের সাদা পুরিয়াতে কিংবা ঠাকুমার দেওয়া তাবিজে।

যাহোক ডলি এবার নাছোড়বান্দা। পিকনিক একটা হবেই আর তাতে ডলি রীতিমত কলাপাতা পেতে খাবে।

বিজয়া উপলক্ষে সবাই এক সঙ্গে জুটেছে। বাড়ির দুই দিদি মীরা ও বুলি তো আছেই, সঙ্গে রয়েছে প্রায় সমবয়সী পিসি ফুচি। বাইরে থেকে এসেছে পিসতুতো বোন জয়ু আর তার পিসতুতো বোন মিলি। আরও সুবিধা, বাড়ি খালি। পাশের মাঠে পাড়ার ছেলেদের থিয়েটার হচ্ছে। বড়রা সব সেখানে।

—আমাদের একটা পিকনিক করলে হয়। আমরা কজন মিলে। বালিশে হেলান দিয়ে বিস্কুট চিবোতে চিবোতে ডলি বলল। অবশ্য শুধু বিস্কুট নয়,

NOT FOR SALE

তার আড়ালে তেঁতুলের আচারও ছিল। মীরার তীক্ষ্ম দৃষ্টির উত্তরে ডলি বলেছে, জেলী। খারাপ কিছু নয়।

ফুচি সদ্যশেখা নাচের দু একটা মুদ্রা দেখাতে দেখাতে তার ঠাকুমার পানের বাটাটা প্রায় উলটে ফেলেছিল, ডলির কথায় নাচ থামিয়ে বলল, পিকনিক মানে তো বনভোজন। এখানে বন কোথায় যে ভোজন করবি?

ডলি হাসল, সত্যি সত্যি বনে গেলে তো আমাদেরই ভোজন করে ফেলবে বাঘমশাইরা। তার চেয়ে আমাদের ছাদই ঢের ভাল।

মিলি নাক সিঁটকাল, উঃ, ছাদে আবার কেউ পিকনিক করে নাকি? আশপাশ থেকে সব লোকরা দেখবে। নজর দেবে, তার ওপর বাড়ির লোকরা ফোঁপরদালালি করবে, আমাদের কিছু করতেই দেবে না।

তাহলে? বুলি চুলের জট ছাড়াচ্ছিল। হতাশকণ্ঠে বললে।

জয়ু বললে, এক কাজ করলে হয়।

সবাই তাকে ঘিরে বসল।

—কীরে, কি করলে হয়? জঙ্গলে টঙ্গলে যেতে পারব না বাপু।

—না, না, আমি কাউকে সুন্দরবনে যেতে বলছি না। জয়ু ঘাড় নাড়ল, আমাদের বাড়ির পিছনে মোড়লদের জমি আছে দেখেছিস তো? কেমন বাগান আছে পুকুর আছে। পিকনিক করার চমৎকার জায়গা।

তবু বুলি সন্দেহ প্রকাশ করল, ওখানে পিকনিক করতে দেবে তো?

জয়ু অবজ্ঞার হাসি হাসল, দেবে না মানে। মোড়লদের সঙ্গে আমার খুব ভাব। ওদের বাড়ির ছেলে দুঃখী আমাদের টিউবওয়েলের মিস্ত্রী। আমাদের ডুমুর, বেল, বাতাবি লেবু দিয়ে যায়, একটি পয়সা নেয় না।

সকলেই খুশী হল, কেবল মীরা ছাড়া। আস্তে আস্তে বলল, কিন্তু ওখানে ইয়ে টিয়ে নেই তো?

—কিয়ে? মিলি হাসল।

—মানে ফোঁস!

বুলি ভ্রূ কোঁচকাল, কী যে বলিস দিদি। শীতকালে তো সাপেরা ঘুমোয়।

মীরা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, সব সাপ ঘুমোয় তা কি হয়? কতদিন মাঝরাতে আমি ঘুম ভেঙে দেখেছি, ঠাটু বসে বসে পান থেঁতো করছে কিংবা বসে আছে চুপচাপ। আমি জিজ্ঞাসা করতে বলেছে, আর দিদি, বুড়ো বয়সে কি আর ঘুম হয়। তেমনই বুড়ো সাপও থাকতে পারে দু একটা।

নিজের ঠাকুমাকে মীরা ঠাটু বলে। রাত্রে তাঁর কাছেই শোয়।

ফুচি বললে, বুড়ো সাপ নিজেই নড়তে পারবে না, ছোবল মারবে কি করে। তাছাড়া, আমি যদি স্কুলে শেখা তাণ্ডব নৃত্যটা শুরু করি, তাহলে সাপ কি, বাঘ থাকলেও তীরবেগে পালাবে। তাণ্ডব নাচের একটুখানি দেখাব নাকি?

NOT FOR SALE

সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

জয়ু বললে, না, না, এখানে তো সাপখোপের ভয় নেই, এখানে নেচে কি হবে। মিছামিছি ঠাকুমার পানের বাটা কিংবা দুধের ঘটিটা যাবে। তাহলে উলটে ঠাকুমাই তাণ্ডব নাচ সুরু করে দেবেন। পিকনিক আর করতে হবে না কাউকে।

মিলি বললে, ওসব বাজে কথা রেখে, তার চেয়ে ফর্দটা করে ফেলা যাক।

ফর্দের কথায় ডলি সোজা হয়ে বসল।

—ফর্দের জন্য ভাবনা নেই। আমি তো রয়েছি। স্কুলের পিকনিকে আমিই তো প্রত্যেকবার ফর্দ করি, যেতে অবশ্য পাই না।

পাশের তাক থেকে ডলি কাগজ আর পেনসিল টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করল। অন্য সবাই তার চারপাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

একবার উঁকি দিয়ে ফুচি বললে, ওটা আবার কি লিখলি? নতুন কোন খাবারের নাম?

ডলি বিরক্ত হল, ফুচিপিসিটা যেন কি! গণেশায় নমঃ বুঝি খাবারের নাম? সব শুভ কাজে লিখতে হয় না? দেখিস নি, ছোটকাকুর বিয়ের সময় বাবা ফর্দের উপর লিখেছিল।

ডলি খসখস করে ফর্দ লেখা শেষ করল। বিরাট ফর্দ। চোখ বুলিয়েই মেয়েদের চোখ ছানাবড়া।

জয়ু বললে, সর্বনাশ, এ কি করেছিস তুই? অত সব জিনিস কেনার টাকা আমরা পাব কোথায়? এ কি স্কুলের ব্যাপার যে মেয়েরা এক টাকা কিংবা আট আনা চাঁদা দিলেই এক গাদা টাকা উঠবে। মীরা গম্ভীর গলায় বললে, টাকা পয়সা আমি কিন্তু দিতে পারব না। পুজোর সময় ঠাটু একরাশ টাকার জিনিস কিনে দিয়েছে। নাইলনের ফিতে, ফ্রক, সুমিত্রা স্যান্ডাল। এখন কিছু চাইতে গেলেই বলবে, তার চেয়ে আমায় কেটে তোরা খা।

মিলি বললে, আমারও তাই অবস্থা। পুজোর তিন দিনে পাঁচ টাকার ফুচকা খেয়েছি, তারপর অম্বল কমাবার জন্য দু টাকার হজমীগুলি। মা আর একটি পয়সা দেবে না।

জয়ু এতক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে ফর্দর ওপর চোখ বোলাচ্ছিল, এবার মুখ তুলে বললে, ফর্দটা একটু ছোট করে দেওয়া যাক। বেশী হাঙ্গামা করার দরকার নেই। শুধু ভাত, মাংস, চাটনি, দই আর মিষ্টি।

ফুচি অপ্রসন্নকণ্ঠে বললে, এ ম্যা, শুধু ভাত? পোলাও করলেই তো হয়।

ডলি চেঁচিয়ে উঠল, পোলাও করবে কে? তুই? মনে নেই একবার পোলাও করতে গিয়ে কি হয়েছিল?

মনে আবার নেই। খুব আছে। ফুচির মা ফুচিকে ভাতের হাঁড়ির সামনে

NOT FOR SALE

বসিয়ে কপিওয়ালার কাছে কপি দর করতে গিয়েছিলেন, ফুচি, ভাতটা একটু দেখিস তো। যদি ফুলে ওঠে, একটু জল দিয়ে দিস।

এমন সুযোগ কেরামতি দেখাবার, ফুচি ছাড়ে নি। রোজ সাদা ভাত খেয়ে তার অরুচি ধরে গিয়েছিল। কিছুদিন আগে একটা পাকপ্রণালী সংগ্রহ করেছিল, পাশের বাড়ি থেকে। বসে বসে পলান্ন রন্ধনটা পড়েছিল। কিন্তু বিধি বাদী, শেষদিকের সব কটা পাতাই ছেঁড়া। পুরো প্রণালীটা আর শেখা হয়ে ওঠে নি। তবে যেটুকু মনে ছিল, তাই যথেষ্ট। ফুচি আর সময় নষ্ট করে নি। বাটা হলুদ, সবটুকু ঢেলে দিয়েছিল হাঁড়ির মধ্যে। লবঙ্গ আর দারচিনির কৌটো উপুড় করে দিয়েছিল। এদিক ওদিক খুঁজে ফুলদির এসেন্সের শিশিটাও খালি করে দিয়েছিল ভাতের ওপর।

অবাক্ করে দেবার জন্য মাকে আর কিছু জানায় নি।

তারপর আসন পেতে নিজের তৈরী পোলাও খাবার জন্য যখন অপেক্ষা করছিল, পাতে হলদে পোলাও পড়ার বদলে পিঠের ওপর মার প্রচণ্ড কষে পড়ল। হলুদে নয়, সারা পিঠ লালচে হয়ে উঠল।

কাজেই পোলাও করার কথাটা ফুচি মোটেই ভোলে নি। তাই সে ঢোঁক গিলে বললে, ঠিক আছে, পোলাওতে বড় হাঙ্গামা। সাদা ভাতই হোক। কিন্তু মাংসটা আমি রাঁধব, তা আগে থেকে বলে রাখছি।

ফর্দ ছোট করা হল। ঠিক হল, এক একটা জিনিস এক একজন যোগাড় করবে। মীরা, বুলি, ডলি তিন বোন যোগাড় করবে মাংস, ফুচি জলখাবারের চা, বিস্কুট আর চাটনি, মিলি দই আর জয়ু মিষ্টি।

সকাল থেকে জয়ুদের পিছন দিকের জমিটা পরিষ্কার করা হল। জয়ুর মা উনান কেটে সাহায্য করতে গিয়েছিলেন, মেয়েরা রুখে দাঁড়িয়েছে, উহুঁ, আজ বড়দের একেবারে প্রবেশ নিষেধ। কেউ উঁকি দিতেও পারবে না। সব কিছু আমরা করব।

ডলি চায়ের কাপগুলো ধুচ্ছিল, ঘাড় নেড়ে বললে, ঠিক কথা। মাংস রান্না হলেই যে পিসিমণি এসে বলবে, দেখি রে নুন ঝাল ঠিক হয়েছে কিনা, সেটি হবে না। আমার মা একদিন চাখতে চাখতে হাঁড়ির অর্ধেক মাংসই শেষ করে দিয়েছিল, তারপর বাবাকে কি বকুনি! চোখ বন্ধ করে বাজার করো নাকি? দুসের মাংস আনতে দিলাম, কতটুকু এনেছ!

চা পর্ব শেষ হল। অবশ্য একটু অসুবিধা হয়েছিল। চা মুখে দিয়েই সবাই মুখটা বেঁকাল, একি রে মিষ্টি হয় নি যে? কি রকম যেন লাগছে।

কেন লাগছে ফুচি চুপি চুপি ডলিকে বললে, একটা কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে ভাই।

—কিরে?

NOT FOR SALE

ঘুমচোখে তাড়াতাড়ি উঠে চিনির কৌটোর বদলে নুনের টিনটাই বোধ হয়—

ডলি ফুচির মুখে হাতচাপা দিয়ে বললে, চুপ চেঁচাস নি। এরা জানতে পারলে সব চা ফেলে দেবে। পিকনিকে এ রকম ছোটখাট ভুল হয়ই।

রান্নাবান্নার ব্যাপারে সবাই একটু উত্তেজিত ছিল বলে চিনির বদলে নুনটা আর বিষে বিস্বাদ ঠেকে নি কারো মুখে।

জয়ু একদিকে বসে কলাপাতার ওপর মাংস ঢেলে হলুদ, আদা আর দই মাখাচ্ছিল। আর একদিকে উনানের ওপর হাঁড়ি চড়িয়ে তাতে চাল ছাড়ছিল মীরা। ফুচি পাখার বাতাস করছিল। বুলি মিষ্টি আর দই পিঁপড়ের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য একটা পেয়ারা গাছের শক্ত ডালে সেগুলো ঝুলিয়ে রাখছিল। একটু দূরে ডলি মাদুরের ওপর বসে ছিল। শরীরটা যেন একটু খারাপ বোধ হচ্ছে। জ্বর আসবার সময় হলো কিনা কে জানে। কেবল ভাবছে, জ্বরটা আসার আগে পিকনিকটা যেন হয়ে যায়। খাওয়াদাওয়ার পর একটু শুতে হলে তার কোন আপত্তি থাকবে না। ডাক্তাররা তো কাছেপিঠে রয়েইছেন।

কেবল মিলি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠিক হয়েছে জলপাইয়ের চাটনি হবে, কিন্তু জলপাইটা তার একবারে পছন্দ নয়। কাছে একটা চালতাগাছ সে দেখতে পেয়েছে! দু একটা চালতাও যেন ঝুলছে। সুযোগ সুবিধা বুঝে গোটা দুই পাড়তে পারলে চাটনি সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে।

এদিক ওদিক চেয়ে সে গাছের ওপর উঠে পড়ল। এ ডালে ও ডালে পা দিয়ে একেবারে মগডালের কাছাকাছি। হাতের নাগালের মধ্যে একটা চালতা এসেও গিয়েছিল ছেঁড়বার মুখেই বিপত্তি!

আওয়াজটা প্রথমে বুলির কানে গিয়েছিল। তারপর একে একে সবাই শুনল।

—ওরে মারে, গেছি রে!

ছুটতে ছুটতে সবাই চালতাতলায় গিয়ে দাঁড়াল, কেবল মীরা ছাড়া। মীরা ভাতের হাঁড়ি আগলে বসে রইল।

চালতাতলায় মিলি চিতপাত হয়ে পড়ে রয়েছে। গাল, মুখ ছড়ে গিয়েছে। ফ্রকটাও ছিঁড়েছে দু এক জায়গায়। চোখে জল, হাতে চালতা।

—কি হল রে? কি করে পড়লি? খুব বেশী লেগেছে? ঈস, একদিকের গালটা যে ফুলে গেছে। সকলের সম্মিলিত প্রশ্ন।

দেহের দু এক জায়গা ছড়ে গেছে সত্যি, কিন্তু গাল ফোলে নি, অন্তত গাছ থেকে পড়ে নয়। বুলি যখন মিহিদানা পাকিয়ে রাখছিল, তখন মিলি

NOT FOR SALE

সন্তর্পণে একমুঠো মিহিদানা সরিয়ে মুখে পুরেছে। চিবোবার অবকাশ পায় নি, পাছে কেউ টের পায়। ভেবেছিল চালতাগাছে উঠে এক সঙ্গে দুটো কাজ সারবে। মিহিদানাও চিবোবে, চালতাও পাড়বে, কিন্তু গোলমালে কোনটাই ঠিক হল না। গালের মিহিদানা গালে আর গাছের চারটে চালতার মধ্যে শুধু একটা করায়ত্ত করতে পেরেছে।

ধুলো ঝেড়ে মিলি উঠে দাঁড়াল। কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, সবে চালতাটা ছিঁড়েছি এমন সময় একটা কাক এসে মাথায় ঠোকরাল। ওপরে কাকের বাসা ছিল, লক্ষ্য করি নি।

কাছে এসে জয়ু একটু নিরীক্ষণ করে বলল, মাথায় ঠুকরেছে, না গালে?

ফুচি আর পারল না। এতক্ষণ হাত পা নিশপিশ করছিল। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছিল না। জয়ুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অঙ্গভঙ্গী করে নেচে উঠল, স্থান কাল ভুলে।

—ও গালফুলো গোবিন্দর মা, চালতাতলায় যেও না।

মিলি চোখ কটকট করে চাইতেই ফুচি নাচ আর গান দুইই থামিয়ে দিল।

জয়ু মিলির হাত ধরে বললো, চল আমাদের বাড়ি, গালে একটু জ্যামবাক ঘষে দিলেই ফুলোটা কমে যাবে।

মিলি চালতাটা ডলির হাতে দিয়ে বললো, নে এই একটাতেই কোনরকমে চালিয়ে নে। তোরা সবাই জলপাই খাস, আমাকে বরং চালতাটা দিস। এত কষ্টে জোগাড় করলাম।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মিলি ফিরতেই সবাই অবাক্। আশ্চর্য ওষুধ তো! গালের ফোলা বেমালুম উধাও। মিলিও স্বীকার করল, বার দুয়েক মালিশ করতেই ফুলোটা কমে গেল।

আবার রান্নাবান্নার কাজ শুরু হল। ভাতটা হয়ে এসেছে। খুব সাবধানে গামছা দিয়ে ধরে মীরা হাঁড়িটা পুকুরধারে নিয়ে গেল ফ্যান গালাবার জন্য।

সাবধানে হাঁড়িটা কাত করে ফ্যান গালতে গালতে মীরা বিরক্ত গলায় বললে, আঃ, কী হচ্ছে ফুচি, হাঁড়ি নামিয়ে রেখেছি, এখনও বাতাস করছিস কেন?

বার দুই বলার পরেও যখন উত্তর এল না, তখন মীরা মুখ ফিরিয়ে দেখল। দেখেই তারস্বরে চিৎকার। হাঁড়ি কাত হয়ে রইল। মীরা তিন লাফে একেবারে বুলির ঘাড়ের ওপর।

বুলি একমনে বসে খরচের হিসাবটা লিখছিল। আচমকা মীরা ঘাড়ের ওপর পড়তেই বুলি হিসাবের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল। মীরার ওজন মিহিদানার চেয়ে অনেক বেশী। ঘাড় ভেঙে যাবার যোগাড়।

—কি রে? কি হ'ল কি?

NOT FOR SALE

—ওই দেখ। মীরা আঙুল দিয়ে পুকুরপাড়ের দিকে দেখাল।

সবাই দেখল। বিরাট এক লোমওয়ালা কুকুর। আধহাত লম্বা জিভ ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাংস আর ভাতের গন্ধে সহজে নড়তে চাইছে না।

মীরা নাকী সুরে বললো, তখনই আমি জয়ুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এখানে কিছু আছে নাকি বল? জয়ু বললে কিচ্ছু নেই। ওই তো দাঁড়কাক মিলিকে ঠোকরালে, বাঘা কুকুরটা একেবারে আমার গায়ের ওপর এসে ল্যাজ নাড়ছিল। আর একটু হলেই কামড়াতো। আমি ভেবেছি ফুচি বাতাস করছে।

জয়ু হাসতে হাসতে এগিয়ে এল।

—কেন মিছামিছি ভয় পাচ্ছিস, বুটি একবারে নিরীহ কুকুর। কিছু করে না। এই তো তিন দিন আগে দুঃখীদের বাড়িতে সিঁদ কেটে চোর ঢুকেছিল। কাপড় জামা বাসন কোসন সব পুঁটলি বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল চোর, আর বুটি সেই পুঁটলি মুখে করে চোরকে বড় রাস্তা অবধি এগিয়ে দিয়ে এসেছে। ভীষণ দয়ালু আর পরোপকারী কুকুর।

তবু মীরার ভয় গেল না। বললে, না ভাই, কিছু বলা যায় না। আমাকে পর বলে মনে নাও করতে পারে। তুমি বরং ওকে সরিয়ে নাও! বিশ্রীভাবে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। ক্লাস থেকে বের করে দেবার আগে কল্পনা দিদিমণি যেমন ভাবে চান, ঠিক তেমনই চাউনি।

অগত্যা জয়ু চেঁচিয়ে দুঃখীকে ডাকল।

—এই দুঃখী, তোদের বুটিকে সরিয়ে নিয়ে যা, আমাদের সব নষ্ট করে দিচ্ছে।

বার দুই ডাকার পর দুঃখী এসে দাওয়ায় দাঁড়াল। এক নজরে ব্যাপারটা দেখে নিয়ে বললে, ও তো কিছু করে নি দিদিমণি, কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু শুঁকছে।

বুলির মেজাজটা খারাপই হয়েছিল। তার ওপর মীরা ঘাড়ের ওপর এসে পড়ায় ঘাড়টা বেশ টনটন করছে, আবার কুকুর মুখটা তুলে বিশ্রীভাবে সব কিছু শুঁকছে।

তাই সে চেঁচিয়ে উঠল, তবে আর কি, শুঁকছে বলে সাত খুন মাপ। ঘ্রাণ করা মানেই তো অর্ধেক ভোজন। আমরা সবাই বুঝি ওই নেড়ি কুকুরটার উচ্ছিষ্ট খাব?

এত কথা দুঃখী বুঝলে না। সে তাড়াতাড়ি দাওয়া থেকে একটু নেমে কুকুরটাকে ডাকল, এই বুটি চলে আয় এদিকে। মেয়েদের বনভোজন হচ্ছে, তুই ওখানে গিয়েছিস কেন?

দুঃখীর ধমকের সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা মাথা নীচু করে তীরবেগে পুকুরের অন্য

NOT FOR SALE

দিকে চলে গেল। কুকুরটা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যেতে মীরা আস্তে আস্তে এগিয়ে ভাতের হাঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সরাটা খুলে কিছু ভাত মাটিতে পড়ে গিয়েছে। খুব সাবধানে সরা চাপা দিয়ে মীরা হাঁড়িটা তুলে এদিকে নিয়ে এল। সেই উনানে এবার চাটনি বসানো হল। জলপাই আর চালতা মেশানো চাটনি।

ওদিকে মাংস ফুটছে। সবাই মাঝে মাঝে একবার করে কাছে গিয়ে মাংসের অবস্থাটা দেখে আসতে লাগল। মানুষের চেয়েও মাংসের অবস্থা আরও মারাত্মক, অন্তত সিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে। কতকগুলো পাঁঠা দ্রুত বিগলিত হয়, আবার কিছু হাড়সর্বস্ব পাঁঠা আছে, যারা মরেও মানুষকে কষ্ট দেয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফুটবে টগবগ করে তবু সিদ্ধ হবে না। এরাই রামপাঁঠা, তাই রামায়ণে আছে, মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী!

মাংস ফুটুক যতক্ষণ ইচ্ছা, ততক্ষণ মেয়েরা ঠিক করল একটু আমোদপ্রমোদ করবে। পিকনিক মানে তো আর কেবল জঙ্গলে বসে খাওয়া নয়, বন্ধুরা মিলে কিছুটা হই হই করা। সবাই এসে মাদুরের উপর জড়ো হল। প্রথমে জয়ু আর বুলির গান, তারপর মিলির নাচ, তারপর মীরার গীটার হবার কথা, কিন্তু মীরা গীটার আনে নি, কাজেই ডলির আবৃত্তি, সবশেষে ফুচির বিখ্যাত শিকারী নৃত্য। বিখ্যাত নিশ্চয় কারণ এই নাচের জন্য ফুচি দু দুবার প্রাইজ পেয়েছে।

কিন্তু শুরুতেই বিপত্তি। জয়ু আর বুলি 'হে নূতন' গানটার প্রথম লাইন গাইবার সঙ্গে সঙ্গে দাওয়া থেকে বুটির বিকট চিৎকার শুরু হল। থামবার নাম নেই, কাজেই মেয়েদেরই গান থামাতে হল।

বুলি চটে গিয়ে বললে, খুব জায়গায় নিয়ে এসেছ জয়ু। দরদ দিয়ে একটু গাইবারও উপায় নেই!

জয়ু দোষ কাটাবার চেষ্টা করল, ডাকুক না বুটি, আমরা কান না দিলেই হল।

বুলি মানল না, আমরা না হয় কান না দিলুম, কিন্তু ওরকম শব্দ হলে আমাদের গানই তো কারও কানে যাবে না।

জয়ু এগিয়ে পুকুরপাড় অবধি গেল। চেঁচিয়ে বললে, এই দুঃখী, বুটিকে থামা না। আমাদের গানের সঙ্গে ও গাইছে কেন?

দুঃখী হাসল, বুটিকে থামানো যাবে না দিদিমণি, ভুল সুরে গান শুনলেই ও ক্ষেপে যায়।

—কী! এবার জয়ু ক্ষেপল, ভারী গানের সমঝদার তোমার কুকুর। ভুল সুর আর ঠিক সুরের ও ছাই বোঝে।

—বোঝে দিদিমণি, দুঃখী ঘাড় নাড়ল, খুব গাইয়ে বংশের কুকুর যে।

NOT FOR SALE

গ্রামোফন রেকর্ডে যে কুকুরের ছবি দেখ চুপ করে বসে গান শুনছে, সে বুটির ঠাকুরদার আপন পিসেমশাই।

মিলি মুখ বেঁকাল, ছেলেটা তো ভারী ফাজিল!

কাজেই গান থামিয়ে নাচ শুরু হল। মিলির নাচ। বেশ ভালই হচ্ছিল কিন্তু আশপাশের বারান্দায় লোক জড়ো হতে মিলি নাচ থামিয়ে দিল।

—না, ভাই, লোকেরা এমন উঁকিঝুঁকি দিলে নাচা যায় না।

ডলি বললে, কী হয়েছে, মনে কর না স্টেজে নাচছিস। সেখানেও তো লোক থাকে।

মিলি ভ্রূ কোঁচকাল, আহা, কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা। এটা কি যাত্রার আসর নাকি, যে চারদিক থেকে লোক দেখবে? তাছাড়া স্টেজেরই বা কি ছিরি! দুবার ইঁটে হোঁচট খেলুম, একবার তো কাঁটা গাছে হাঁটু ছড়েছে। আমি বলেই তাই খানিকটা তবু নাচলুম।

মিলিকে আর নাচানো গেল না। সে মাদুরের ওপর বসে পড়ল।

ডলির আবৃত্তি শুরু হল।

পঞ্চনদীর তীরে, বেণী পাকাইয়া শিরে উঁক্,
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে উঁক্।

বার তিনেক 'উঁক্' করে ডলি থামল। অতটা তেঁতুলের আচার লুকিয়ে লুকিয়ে না খেলেই হত। কেবল হেঁচকি উঠছে।

তবু কোনরকমে দম নিয়ে ডলি খানিকটা এগোল।

হাজার কণ্ঠে গুরুজীর জয় উঁক্
ধ্বনিয়া তুলেছে দিক্।
নূতন জাগিয়া শিখ উঁক্ উঁক্

সকলে অবাক্। জাগরণের পরম লগ্নে দুর্ধষ শিখজাতি এভাবে উঁক্ উঁক্ করবেই বা কেন! অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এরপর মোগলরাও 'উঁক্ উঁক্' করবে। এভাবে হেঁচকি তুলতে তুলতে দুটো জাত কতক্ষণই বা যুদ্ধ করবে। তার চেয়ে এখানে থেমে যাওয়াই ভাল।

এবারে শেষ অনুষ্ঠান। ফুচির শিকারী-নৃত্য।

এতক্ষণ কেউ লক্ষ্য করে নি। ঝোপের আড়াল থেকে বিচিত্র সাজে সেজে এসেছে! মাথায় সবুজ শাড়ির পাগড়ি। আর একটা শাড়ি জড়িয়েছে ফ্রকের ওপর। হাতে ছোট একটা বাঁশের লাঠি। এ সব সাজসজ্জা সে ব্যাগের মধ্যে এনেছিল। কাউকে দেখায় নি।

ফুচির নাচ কিন্তু খুব জমে গেল। একবার শুধু পাগড়িটা খসে গিয়েছিল মাথা থেকে। ফুচি ভ্রুক্ষেপ করে নি। পাগড়ি ছাড়াই নাচতে লাগল।

সবাই বার দুয়েক হাত তালিও দিল, কিন্তু তারপরই বিপর্যয় ঘটল।

NOT FOR SALE

অনেক দূরে মৃগ বেড়াচ্ছে। মাংসের হাঁড়িটা মৃগ। সেটাই শিকারীর লক্ষ্য। হাতের লাঠিটা বল্লম। সেটা নানাভাবে ঘোরাতে ঘোরাতে শিকারী এগোচ্ছে আর পেছোচ্ছে। মৃগের খুব কাছে গেছে শিকারী। ফুচির আর জ্ঞান নেই। হাতের লাঠি পেয়ারা গাছের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ছুটে যেতেই সর্বনাশ হল। হাতের লাঠি গিয়ে পড়ল পেয়ারা ডালে টাঙানো দইয়ের হাঁড়ির ওপর। পাশে ঝোলানো মিহিদানার প্যাকেটও ফেটে চৌচির। ফলে ফুচি যখন রঙ্গমঞ্চে আবার প্রবেশ করল তখন তার কিম্ভুতকিমাকার চেহারা। মাথা বেয়ে দই গড়িয়ে পড়ছে, সারা মুখে দই আর মিহিদানায় মাখামাখি। বাঁ দিকের চোখটা মিহিদানার অন্তরালে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন।

সব মেয়েরা হায় হায় করে উঠল। এত টাকার জিনিস শিকারীর বল্লমের খোঁচায় খতম্! কিন্তু বেশীক্ষণ আপসোস করারও সময় পেল না। বিশ্রী পোড়া গন্ধ আসছে কোথা থেকে। শিকারীর তো এই অবস্থা, তার মৃগের অবস্থা বুঝি আরও শোচনীয়।

আপাতত ফুচিকে রেখে সবাই মাংসের হাঁড়ির দিকে ছুটল।

মাংসটা একটু ধরে গিয়েছে, তাই থেকেই গন্ধ বেরোচ্ছে। জয়ু জল ঢেলে মাংসের হাঁড়িটা নামিয়ে ফেলল।

বেশ বেলা হয়ে গিয়েছিল বলে এবার খেতে বসা উচিত। যা ব্যাপার চলেছে, যত দেরি হবে, ততই বিপদ বাড়বে। এমনিতে তো দই আর মিষ্টি শেষ। মাংসটাও সুবিধা হল না। সম্বল শুধু চাটনি আর ভাত।

ডলি ওরই মধ্যে একবার হতাশকণ্ঠে বলল, খুব একটা ভুল হয়ে গেছে।

সবাই জিজ্ঞাসা করল, কী, কী ভুল হয়েছে?

আসবার সময় পাঁজিটা একবার দেখে এলে হত। আমার মনে হয় যাত্রাটা শুভ হয় নি।

অন্যসময় হলে সবাই ঠাট্টা করত, কিন্তু যে ভাবে একটার পর একটা দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে, কেউ আর ডলির কথায় আপত্তি করল না। নিশ্চয় অশ্লেষা কিংবা মঘা এসব কাণ্ড ঘটাচ্ছে। নিদেনপক্ষে বারবেলা।

সবাই কলাপাতা নিয়ে বসল। ততক্ষণে ফুচি দই আর মিহিদানার প্রলেপমুক্ত হয়েছে।

জয়ু পরিবেশন করল। সকলকে দিয়ে তারপর সে বসবে।

সকলের পাতে ভাত ঢেলে দেওয়া হল। ওপর থেকে মাংসের ঝোল। তলার মাংস বেশ একটু পুড়ে গিয়েছে।

বুলির পাতে মাংসের ঝোল পড়তেই আশ্চর্য কাণ্ড! ভাতের প্রকাণ্ড একটা ডেলা কলাপাতার ওপর সরে সরে বেড়াতে লাগল।

সবাই অবাক্। এমন চলন্ত ভাত এর আগে কেউ দেখে নি।

NOT FOR SALE

ডলি বুলির পাশে বসে ছিল। সে বললে, দিদিভাই, মা ঠিক কথাই বলে। ভাত লক্ষ্মী। সেই লক্ষ্মী সচলা হয়েছেন। আমাদের মহাভাগ্য লক্ষ্মীর এ রূপ আমরা দেখতে পেয়েছি।

কথার সঙ্গে সঙ্গে ডলি সাষ্টাঙ্গে পাতের ওপর প্রণাম করল। মুখে বললে, মা তোমার বোনকে আমার ওপর একটু কৃপা করতে বল। শুধু ওই অঙ্ক আর ইংলিশ সেকেন্ড পেপারটা!

অন্য মেয়েরাও নিজেদের পাত ছেড়ে বুলির পাতের সামনে এসে জড়ো হল। যদি নিমেষের জন্যও একবার দেবীদর্শন হয়ে যায়।

অদৃষ্ট! চলন্ত ভাতের স্তূপ থেকে কালো অবয়ব একটা দেখা গেল। গোল গোল দুটি চোখ। সম্ভবতঃ লক্ষ্মীর বাহন।

মেয়েরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, মা, একবার দেখা দাও। দেবী প্রসন্না হও। অনেকে প্রার্থনা করতে শুরু করল। লক্ষ্মীর আবাহন।

বেশীক্ষণ স্তব করতে হল না। ভালগুলো সব সরে যেতেই মেয়েরা লাফিয়ে উঠল। তারপর পরিত্রাহি চিৎকার।

পরিপুষ্ট একটি কোলা ব্যাঙ। শরীরের দু এক জায়গা ঝলসে গিয়েছে। অনেক কষ্টে নড়াচড়া করছে।

বোঝা গেল মীরা যখন পুকুরপাড়ে হাঁড়িটা কাত করে রেখে কুকুরের ভয়ে পালিয়ে এসেছিল সেই সময় ভেকরাজ হাঁড়ির মধ্যে ঢুকেছে গরম ভাতের মধ্যে ঢুকে কাবু হয়ে পড়েছে, আর বেরোবার সুযোগ পায় নি।

মিলি আর ডলি বমি করতে শুরু করল। মীরা চোখ বুজে চিৎকার। ফুচি নাচের ভঙ্গীতে হাত পা ছুঁড়তে লাগল। ব্যাঙটি তখন বুলির পাত থেকে ডলির পাতে এসে উঠেছে।

চিৎকার শুনে জয়ুর মা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তখন ব্যাঙটাকে ঘিরে মেয়েদের তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়েছে।

জয়ুর মা চিৎকার করে বললেন, এই মেয়েরা, খুব পিকনিক হয়েছে, চলে আয় সব। মুড়ি আর নারকোল রেখেছি, চায়ের সঙ্গে খাবি আয়।

মেয়েরা মাথা নীচু করে চলে এল। আসতে আসতে ফুচি শুধু একবার বললে, তোরা অমন করে আমার গা থেকে দই মিহিদানাগুলো চেঁছে না নিলেই পারতিস। এমন খিদে পেয়েছে, খিদে পেলে আমি আবার সাপ ব্যাঙ বাছি না।

—সমাপ্ত—

NOT FOR SALE

হীরুদার গোয়েন্দাগিরি

হীরুদাই নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনল। যাকে বলে খাল কেটে কুমির আনা।

ব্যাপারটা খুলেই বলি।

আধা শহর বেগমপুর। স্কুল আছে, কলেজ আছে, সিনেমা হল আছে। কলকাতা থেকে ট্রেনে সাঁইত্রিশ মাইল। এখানকার ছানা আর ডাব বিখ্যাত। আরও একটা জিনিস বিখ্যাত সেটা পরানদার দোকানের চা। তাও আবার ময়লা ডিশ আর হাতল ভাঙা কাপে যখন খদ্দেরদের দেওয়া হত। এই দোকান সকাল সাতটা থেকে রাত সাতটা অবধি ঠাসবোঝাই। স্কুল আর কলেজের ছেলেই বেশী। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থেকে শুরু করে এম. সি. সি.র খেলা, মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের ঠোকাঠুকি, রকেটে চাঁদে পৌঁছানোর তোড়জোড় সব কিছুই গরম গরম চলত। এছাড়া রাজা উজীর বাদশা ছিলই।

প্রায় সব আসরেই বক্তা হীরুদা আর সকলে শ্রোতা।

হীরুদা এতদিন একটানা কলকাতায় ছিল। চাকরির চেষ্টায়। হেন অফিস নেই যেখানে মাথা ঠোকে নি কিন্তু নো ভেকেন্সির বোর্ডে মাথা ঠুকে ঠুকে কেবল মাথাই ফুলল, চাকরির কোন সুরাহা হয় নি। একদিন তাই দুত্তোর বলে হীরুদা বেগমপুরে চলে এল খুড়োর কাছে। উদ্দেশ্য ব্যবসা করবে। হয় ডাব চালান দেবে কিংবা ছানা। ভগবান যদি দেন, তাহলে দুটোই।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় এক। ডাব ছানা কোনটাই নয়, হীরুদা একেবারে অন্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ল।

সেদিন চায়ের আসরে রোজকার মতন বক্তা হীরুদা, বিষয়—শখের গোয়েন্দাগিরি।

চায়ের কাপে আড়াই দিনের বাসি পাউরুটি ডুবোতে ডুবোতে হীরুদা বলল, গোয়েন্দা যদি বলতে হয় তো সর্বেশ্বর বরাটকে। তাঁর কাছে তোদের কিরীট রায়, প্রতুল লাহিড়ী, ব্যোমকেশ একেবারে ছেলেমানুষ। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে বছর তিনেক আগে গিয়েছিলেন ওদের ছিঁচকে চোর ধরার পদ্ধতিটা শেখবার জন্য, সর্বেশ্বর বরাটের সঙ্গে আলোচনা করে ওখানকার কর্তা ম্যাকডুগাল সায়েব তো হতভম্ব। বলল, মিঃ বরাট, আপনি আমাদের এখানে কেন এসেছেন?

NOT FOR SALE

আপনাকে জ্ঞান দিতে পারি এমন শক্তি আমাদের নেই। তার চেয়ে প্রত্যেক বছর আমার দু-একজন সহকারীকে বরং আপনার কাছে পাঠাব, আপনি শিখিয়ে পড়িয়ে একটু তালিম দিয়ে দেবেন। সেই থেকে প্রত্যেক বছর দুজন করে লোক সর্বেশ্বরবাবুর কাছে আসে, তাঁর নিধুগুন্ডা লেনে।

একটু থেমে হীরুদা চায়ে চুমুক দিয়ে নিল। তারপর সামনের উদগ্রীব কতগুলো দৃষ্টির দিকে চেয়ে বলল, এই সর্বেশ্বর বরাটের সঙ্গে একটানা দুটি বছর কাটিয়েছি একেবারে পাশাপাশি তক্তপোশে। তোরা হয়তো বিশ্বাস করবি না, কত ছোট খাটো কেস যে সর্বেশ্বরবাবু আমার হাতে তুলে দিয়েছেন, তার হিসাব নেই। ওই যে পুঁটিয়াগড়ের দলিল চুরির ব্যাপার, যেটাতে পুলিস হিমশিম খেয়ে গেল, ঠিক তিন দিনের দিন আসামীকে হাজির করে দিলাম সর্বেশ্বরবাবুর সামনে। তারপর ধাপার মাঠে যে মুণ্ডহীন দেহটা পাওয়া গিয়েছিল, সাতদিনের মাথায় গার্ডেনরীচের ডাস্টবীন থেকে মুণ্ডটি উদ্ধার করে দিয়েছিল এই শর্মা। চলে আসবার সময় সর্বেশ্বরবাবু আমার দুটো হাত চেপে ধরে কি কাকুতি-মিনতি। তুমি থাক হীরু। আমার বয়স হয়েছে। আর ছুটোছুটি করতে পারি না। এ বয়সে তোমার মতন এমন সহকারী পেলে নিশ্চিন্ত হতে পারি। যা রোজগার করব, আধাআধি বখরা।

দয়াল একেবারে পাশেই বসে ছিল। হীরুর অনুগত ভক্ত। সে তৎগতচিত্তে সব শুনছিল! হীরুদা একটু থামতেই বলল, তা থাকলেই তো পারতে হীরুদা। এই জঙ্গলে কেন মরতে এলে?

হীরুদা দুটি চোখে কৃপার ভাব ফোটাল। অবহেলার ভঙ্গীতে বলল, টাকাটাই কি পৃথিবীতে সব দয়াল। এদিকে খুড়োকে দেখবার কেউ নেই। প্রতি সপ্তাহে একটা করে চিঠি যাচ্ছে। কর্তব্য একটা আছে তো!

তা নিশ্চয় আছে। এরপর আর হীরুর অমন লোভনীয় প্রস্তাব ছেড়ে আসার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন চলে না।

কিন্তু পরের দিনই বিপদ! আর এক বিরাট কর্তব্যের মুখোমুখি দাঁড়াল হীরুদা।

ভোরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে রোজকার মতন ছানাপটিতে চলেছে, হঠাৎ মাঝপথে বিপুল বপু এক ভদ্রলোক পথ আটকে দাঁড়ালেন।

—নমস্কার হিরণ্ময়বাবু!

আড়চোখে লোকটিকে জরিপ করতে করতে হীরুদা বলল, আমার নাম হীরেন।

—ও মাপ করবেন, পুরো নামটা জানা ছিল না। পাড়ার ছেলেরা হীরুদা

NOT FOR SALE

হীরুদা বলছিল, আমি ভেবেছিলাম বুঝি হিরণ্ময়। তা হীরেনবাবু আমাকে বাঁচান, আমার ভারী বিপদ।

লোকটির চেয়েও হীরুদা বিপদে পড়ল বেশী। জলজ্যান্ত মানুষ। ওজনে পৌনে তিনমনের কম নয়। দিব্যি নাৱ গোপাল প্যাটার্ন চেহারা। বিপদটা আবার কোথায়!

—কি বিপদ আপনার?

—চলুন, যেতে যেতে সব বলছি। ভদ্রলোক এগোতে শুরু করলেন। বিস্মিত হীরুদা পিছনে পিছনে চলল।

রাস্তার মোড়েই একটা জীপগাড়ি। ভদ্রলোক হীরুদার দিকে চেয়ে বললেন, উঠে বসুন হীরুবাবু। যেতে যেতে সব বলছি।

হীরুদা উঠল। ভদ্রলোকও উঠতে উঠতে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন, চল পলাশপুর।

পলাশপুর বেগমপুর থেকে মাইল পঞ্চাশেক। কিন্তু সেখানে কেন? যেতে আসতেই তো ঘণ্টাচারেক লেগে যাবে। ততক্ষণে ডাব আর ছানার কি অবস্থা হবে।

এইবার হীরুদা বিপদে পড়ল। কিন্তু আপত্তি করতে গিয়েই বাধা। ভদ্রলোক একেবারে দুটো হাত জড়িয়ে ধরলেন।

—আপনার কোন অসুবিধা হবে না। আমি পলাশপুরের জমিদার অনুকূল সরকার। অবশ্য এখন আর জমিদার নই। তবু কিছু জমিজমা আছে। আপনাকে গরিবের বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে। আপনার ব্যবসার কথাও শুনেছি। একদিনের লোকসানে আপনার এমন কিছু ক্ষতি হবে না, আমি সব পুষিয়ে দেব। আপনি আমায় বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

এবার হীরুদা বলেই ফেলল, আমি, আমি আপনাকে কি বিপদ থেকে উদ্ধার করব?

ভদ্রলোক হাত ছাড়লেন না। বললেন, আপনি ছাড়া আর কে পারবে বলুন। সর্বেশ্বর বরাটের সহযোগী আপনি, কত বড় বড় ব্যাপারের সুরাহা করেছেন।

এতক্ষণ পরে হীরুদা ব্যাপারটা বুঝতে পারল। কাল বিকালের চায়ের আসরের গালগল্পের ফল। এখন উপায়! বোঝা গেল, চায়ের আসরে কিংবা তার ধারে কাছে পলাশপুরের জমিদার ছিলেন। সম্ভবতঃ স্বকর্ণেই সব কিছু শুনেছেন।

হীরুদা নিজেকে সামলে নিল। নিজের হাতে কাটা খাল দিয়ে কুমির ঢুকেছে, সুতরাং তার সঙ্গে বোঝাপড়া তাকেই করতে হবে।

সীটে হেলান দিয়ে হীরুদা বলল, আপনার বিপদটা কি বলুন তো?

NOT FOR SALE

ভদ্রলোক প্রায় কাঁদ কাঁদ গলায় বললেন, বিজন আজ মাস খানেকের ওপর নিখোঁজ। বহু সন্ধান করেছি, কোথাও পাই নি। তাকে দয়া করে এনে দিন।

হীরুদা হাসল। আর অন্ধকার নেই, একটু একটু করে সব কিছু পরিষ্কার হচ্ছে। স্কুল ফাইনালের ফল বেরিয়েছে প্রায় মাস দুয়েক। এরপরই বাঙলা দেশের বহু ছেলে নিখোঁজ হয়। তবে অনেকেই ফিরে আসে। মামার বাড়ি কিংবা মাসীর বাড়ি কাটিয়ে মাথা নীচু করে সংসারে ঢোকে। পলাশপুরের জমিদার বাড়ির ছেলের হাতে পয়সা-কড়ি থাকা স্বাভাবিক। কাজেই তার ফিরে আসতেও দেরি হচ্ছে।

গোয়েন্দার ধরনে মুখে একটা সবজান্তা ভাব ফুটিয়ে হীরুদা জিজ্ঞাসা করল, বিজনের বয়স কত?

—তা বছর সাতেক হবে।

বছর সাতেক? হীরুদা দম নিল। তা হলে তো স্কুল ফাইনালের ব্যাপার নয়। এ তো ছেলেধরার ব্যাপার?

—আন্দাজ করছি চেহারা নিশ্চয় হৃষ্টপুষ্ট।

ভদ্রলোক অবাক হলেন। আশ্চর্য, ঠিক ধরেছেন তো। হাজার হোক, সর্বেশ্বর বরাটের সহযোগী আপনি, এসব তো আপনার নখদর্পণে।

হীরুদা গলাটা আরও গম্ভীর করল, চেহারার একটু বর্ণনা দিন তো, শুনি।

—গায়ের রং মেটে মেটে, ওই আপনি যা বললেন মোটা সোটা চেহারা, কটা চোখ, বাঁকানো শিং।

—শিং? হীরুদার মাথাটা পিছনের সীটে সজোরে ঠুকে গেল।

—হ্যাঁ, তবে বয়স আন্দাজে শিংয়ের সাইজ বেশ ছোট।

—তার মানে বিজন কোন ছেলে নয়?

ভদ্রলোক জিভ কামড়ালেন, আরে, না, না! বিজন আমার পাঁঠার নাম। ছেলে নেই, পুলে নেই, ওই পাঁঠাটি সম্বল করে বেঁচে ছিলাম। হীরেনবাবু, আপনি কথা দিন, বিজনকে আমার বুকে ফিরিয়ে দেবেন।

কথা দেওয়া দূরে থাক, হীরুদার মুখে কথাই ফুটল না। পলাশপুর পৌঁছানো পর্যন্ত সে চুপচাপ চোখ বুজে বসে রইল।

ভদ্রলোকও হীরুদাকে বিরক্ত করলেন না। ভাবলেন, গোয়েন্দা হীরেনবাবু নিশ্চয় মনে মনে সমস্ত ঘটনা ভাবছেন। পলাশপুরে নেমেই হয়তো বিজনের পাত্তা বলে দেবেন।

পলাশপুরের জমিদার বাড়ি দেখেই হীরুদার চক্ষুস্থির!

জরাজীর্ণ দুতলা বাড়ি। বেশ কয়েক বছর সংস্কার হয় নি। চামচিকে আর ইঁদুরের আস্তানা।

NOT FOR SALE

খাওয়া দাওয়ার পর পলাশপুরের জমিদার অনুকূলবাবু বিজন-নিখোঁজের কাহিনী সবিস্তারে হীরুদাকে বললেন।

এই পাঁঠাটি এক প্রজার উপহার। রুগ্‌ণ, জীর্ণ চেহারা ছিল তখন। অনুকূলবাবু প্রায় বুকের রক্ত দিয়ে তাকে মানুষ করেছিলেন। শোবার ঘরে তাঁর তক্তপোশের পাশে বিজনের জন্যে ছোট একটি তক্তপোশ তৈরী হয়েছিল। মোলায়েম খড়ের বিছানা। গলায় রূপোর ঘুঙুর। বসবার ঘরে বিভিন্ন ভঙ্গীতে বিজনের অনেকগুলো ফটো। এক ভোরে বিছানা থেকে উঠে রোজকার মতন বিজনকে খবরের কাগজ খাওয়াতে গিয়েই অনুকূলবাবু অবাক। বিজন নেই। ঘুঙুর পড়ে রয়েছে। অথচ দরজা জানলা সমস্ত বন্ধ।

—আপনার কাউকে সন্দেহ হয়? হীরুদা তক্তপোশে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে জিজ্ঞাসা করল।

—সন্দেহ যাকে হয় তার নাম করাই তো বিপদ।

সূত্রের সন্ধান পেয়ে হীরুদা তাকিয়া ছেড়ে সোজা হয়ে বসল, কি রকম?

—সন্দেহ তো হয় রাজীব ঘোষালকে।

—তিনি কে?

এখানকার থানার অফিসর। যত বার আমার সঙ্গে বিজনকে দেখেছেন, বলেছেন, অনুকূলবাবু পাঁঠাটাকে থানায় দান করে ফেলুন, আমরা একদিন ফিস্ট করি।

কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে অনুকূলবাবুর দু-চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

থানার অফিসরকে সন্দেহ হয় শুনে হীরুদা একটু চুপসে গেল। যতগুলো গোয়েন্দা কাহিনী পড়েছিল, তাতে এমন ঘটনা হয়েছে বলে মনে করতে পারল না।

খাওয়াটা একটু বেশী হওয়ায় ঘুমও আসছিল। একটু গড়িয়ে নিতে পারলে হত। তাই হীরুদা বলল, আমি দুপুরে একটু চিন্তা করে নিই, আপনি বরং আমার খুড়োর কাছে একটা খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

—সে জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি ওই চায়ের দোকানের পরানবাবুকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছি। সাত দিনের জন্য আপনি পলাশপুরে থাকবেন।

—সাত দিন? বলেই হীরুদা সামলে নিল, সাত দিন লাগবে কেন?

অনুকূলবাবু পুলকিত হলেন, তাতো নিশ্চয়, আপনার মতন গোয়েন্দার কাছে এ তো তুচ্ছ ব্যাপার। সেই ধাপার মাঠের ধড়ের কাছে তো কিছুই না।

হীরুদা আর কথা বাড়াল না। ঘুমে চোখ ঢুলছে। দাঁড়িয়ে উঠে যেতে

NOT FOR SALE

গিয়েই সামনের জানলার সঙ্গে ধাক্কা খেল, সঙ্গে সঙ্গে জানলার কপাটটা খুলে পড়ল।

অনুকূলবাবু অপ্রস্তুত হলেন, কিছু মনে করবেন না। অনেকদিন এসব মেরামত হয় নি কিনা।

হীরুদা কিছুই মনে করল না। বরং অন্ধকারে আলোর ইশারা দেখতে পেল। এ ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ থাকলেও, বাইরে থেকে অনায়াসেই জানলার কপাট সরিয়ে ঘরে ঢোকা যায়। তারপর ঘুমন্ত বিজনকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাওয়া তো খুবই সহজ ব্যাপার।

অচেনা জায়গা। হীরুদার ঘুমটা গাঢ় হল না। একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব, তাও ঠক করে একটা শব্দ হতেই হীরুদা চমকে বিছানার ওপর উঠে বসল।

জানলার কাছে মাঝারি সাইজের একটা টেবিল। তার ওপর একটা মাটির ঢেলা পড়ে গুঁড়িয়ে গেছে। সম্ভবতঃ বাইরে থেকে কেউ ছুঁড়েছে।

হীরুদা উঠে টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গোয়েন্দা হওয়ার এই এক মহা বিপদ। সব ব্যাপারে চোখ রাখতে হয়, নাক গলাতে হয়। ঠিক ঢেলার গুঁড়োর পাশেই একটা পাকানো কাগজ। কাগজটা হাতে করে তুলেই হীরুদা চমকে উঠল। সর্বনাশ এ যে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে একেবারে সাপের আওতার মধ্যে এসে পড়ল। এখন উপায়!

সাদা কাগজে লাল অক্ষরে বড় বড় করে লেখা। গোয়েন্দা, সাবধান! বিজনের ব্যাপারে হাত দিতে এসো না। প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ইতি মাকড়সা।

সমস্ত শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে। হীরুদা আস্তে আস্তে বিছানায় ফিরে এল।

ঠিক সেই সময় একটি চাকর ঘরে ঢুকল চা আর সিঙাড়া নিয়ে। হীরুদা কম্পান্বিত কণ্ঠে তাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, এখান থেকে বেগমপুরে যাবার ট্রেন কখন বলতে পার?

চাকরটা কাপ আর প্লেট নামিয়ে বলল, আজ্ঞে রাত সাড়ে সাতটায়।

—স্টেশন এখান থেকে কতদূর?

—তা মাইল দুয়েক। একেবারে সোজা সড়ক। পিচের রাস্তা।

হীরুদা মন ঠিক করে ফেলল। আর এখানে নয়। গোয়েন্দাগিরি করতে এসে শেষকালে পৈতৃক প্রাণটা যাবে। তাও একটা পাঁঠার জন্য। আজ রাতেই চুপি চুপি পালাতে হবে। কিন্তু বেরোবার মুখেই বাধা। একেবারে রাস্তার ওপর অনুকূলবাবু।

—কোথায় যাচ্ছেন? ভেবে কিছু কূলকিনারা পেলেন?

—একবার স্টেশনের দিকে যাব। তাছাড়া আশপাশটাও একটু দেখা দরকার।

NOT FOR SALE

—বেশ তো জীপটা তাহলে বের করতে বলি? অনুকূলবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—না, না, হীরুদা মাথা নাড়ল, জীপ বের করবেন না, আপনিও সঙ্গে যাবেন না, তাহলেই অপরাধী সাবধান হলেই, আর কিছু করা যাবে না।

—তা ঠিক। অনুকূলবাবু সায় দিলেন।

—কিছু মনে করবেন না আপনি, প্রতাপগড়ের মেজ রানীর নেকলেসের একটা বৈদূর্যমণি চুরির ব্যাপারে ঠিক এই জন্য সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। মহারাজা গাড়ি নিয়ে সব সময় সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন।

অনুকূলবাবু পিছিয়ে গেলেন, ঠিক কথা, ঠিক কথা। আপনার কাজের অসুবিধা হয় এমন কিছু কখনই আমার করা উচিত নয়। বিজনকে ফিরে পাবার পথে কোন বাধা সৃষ্টি হোক তা আমি চাই না।

হীরুদা আর দাঁড়াল না। একবার বেগমপুরে পৌঁছতে পারলে তবে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়বে। বিদেশ বিভুঁয়ে মাকড়সার পাল্লায় পড়ে প্রাণ হারানো সমীচীন হবে না।

হীরুদা যখন স্টেশনে গিয়ে পৌঁছল তখন সাড়ে ছটা। তার মানে ট্রেনের জন্য আরও এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।

ছোট্ট স্টেশন। টিমটিম করছে একটি বাতি। আশপাশের ঝোপ থেকে মাঝে মাঝে শেয়াল ডেকে উঠছে। একটা ভাঙা বেঞ্চের ওপর হীরুদা বসল।

একটু পরেই ট্রেনের শব্দ হল। এ ট্রেন কলকাতা থেকে আসছে। পলাশপুর ছুঁয়ে যাবে পীরনগর। স্টেশনে জনকয়েক লোককেও ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল। আবছা অন্ধকারে ঠিক তাদের বোঝা গেল না।

হীরুদার ট্রেনের তখনও আধঘণ্টা দেরি। সে বেঞ্চের ওপর পা তুলে দিয়ে, প্রথমে গুনগুনিয়ে তারপর একটু জোরে গান ধরল। গানের গলা তার কোন কালে ছিল না, তবে শখ বহুদিনের। মেসে থাকতে আর একজনের হারমোনিয়ম নিয়ে সময় পেলেই সাধনা করত। গান ওই একটিই জানা ছিল, তাও সবটা নয়, লাইন দুয়েক। গোয়েন্দা সর্বেশ্বর বরাটের প্রিয় গান। পুলিসের রিপোর্ট পড়তে পড়তে কিংবা লাশের ছবি দেখতে দেখতে তিনি আস্তে আস্তে গাইতেন। ব্যাকুল বসন্ত ফিরে ফিরে আসে ফিরে ফিরে যায়, জীবনে আমার কিছু হলো না গো হায়।

—এ গানটা শুনে শুনে হীরুদাও শিখেছিল। বিশেষ করে অফিসে অফিসে ঘুরে হতাশ হয়ে এসে এ গানটা মনের অবস্থার সঙ্গে খুব খাপ খেত। আজকেও স্টেশনে একান্তে ভাঙা বেঞ্চে বসে হীরুদা দরদ দিয়ে এ গানটাই গাইছিল।

হঠাৎ খেয়াল হল পেছনের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরে।

NOT FOR SALE

—বা, বা, এই তো বেশ গলা, এঁকেই ধরে নিয়ে চল।

দরকার নেই কলকাতার বড় গাইয়েতে। সে আর আসছেও না। আজ রাতে আর গাড়ি নেই।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর কতক্ষণ সভার কাজ বন্ধ থাকবে।

কথাগুলো ঠিক হীরুদার কানে যায় নি, চেঁচামেচিতে সে তাড়াতাড়ি বেঞ্চ ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কে? কে আপনারা? হীরুদার মন থেকে মাকড়সার ভয় তখনও যায় নি।

—মশাইয়ের নাম? মশাইকে তো এর আগে আর পলাশপুরে দেখি নি। তাগড়া জোয়ান একটি ছেলে আস্তিন গুটিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল!

মিনিট দুয়েক হীরুদা একটু ভেবে নিল। আসল কথা বললে তো আর নিস্তার নেই। এখনই পাঁজাকোলা করে নিয়ে গিয়ে খতম করে দেবে। কাকপক্ষীও টের পাবে না। হীরুদার মাথায় এক বুদ্ধি এসে গেল। ঢোঁক গিলে বলল, এখানে হরিনাথবাবুর কাছে এসেছিলাম।

—হরিনাথবাবু? তিনি আবার কে? কোন্ পাড়ায় থাকেন?

—কোন্ পাড়ায় থাকেন তা তো জানি না। আমি অনেক খোঁজ করেও পেলাম না। মস্ত গুণী লোক। কাওয়ালী। আর খেয়ালের রাজা। আমার নিজেরও একটু গান-বাজনার শখ আছে কিনা। তবে আমার আধুনিক। ক্ল্যাসিকাল শেখবার জন্যই তাঁর কাছে আসা।

হীরুদার কথা আর শেষ হল না। সবাই মিলে 'হুররে' বলে একবার চিৎকার করে উঠল। তারপর ষণ্ডামার্কা দুজন এগিয়ে এসে পলকের মধ্যে হীরুদাকে কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে ছুটল।

বেশীদূর নয়। স্টেশনের বাইরের গাছের গোড়ায় অনেকগুলো সাইকেল রাখা ছিল। তারই একটার ওপর বসিয়ে। হীরুদাকে চালাতে হল না। হীরুদা সামনের রডে, আর একজন তীরবেগে সাইকেল চালাতে লাগল। আগে, পিছনে আরও অনেকগুলো সাইকেল।

হীরুদা প্রথমে ভেবেছিল বুঝি তার ছদ্মপরিচয় ফাঁস হয়ে গিয়েছে। এরাই মাকড়সার দল। গোয়েন্দাকে খতম করতে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটু পরেই আসল ব্যাপারটা শুনল, কিন্তু তাতে ভয় বিশেষ কমল না।

কলকাতা থেকে এক গায়ক আসার কথা, এদের সভায় গাইবার জন্য, কিন্তু সাতটার গাড়িতেও সে আসে নি। অনামী সংঘের বরাত ভাল, আর একজন ভাল গায়ক একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে।

হীরুদাকে যখন সভামঞ্চের পাশে নামাল, তখন তার দুটো পা-ই ঠকঠক করে কাঁপছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখল আসরে তিল ধারণের স্থান নেই।

NOT FOR SALE

বেশির ভাগই চাষী মজুরদের দল সকলেরই পাশে মোটা বাঁশের লাঠি। এরা খেপলে কি অবস্থা হবে ভাবতেও হীরুদার হৃদ্‌কম্প হল। কি কুক্ষণেই পলাশপুরের জমিদারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল!

—নিন, কোন গানটা গাইবেন বলুন, অ্যানাউন্স করি। সেই ষণ্ডামার্কা ছেলেটা আবার সামনে এসে দাঁড়াল।

হীরু জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিল। এর চেয়ে মাকড়সার হাতে পড়লেও ঢের ভাল ছিল। এক গুলিতেই হয় তো শেষ করে দিত। এতগুলো লোকের লাঠির ঘায়ে থেঁতলে মরতে হত না।

মরিয়া হয়ে হীরুদা বলল, একবার হারমোনিয়মটা দিন, একটু প্র্যাকটিস করে নি। আপনাদের এত বড় সভা, লোক হাসাতে তো আর পারি না।

ঠিক কথা। হারমোনিয়ম এল। মঞ্চের এক কোণে হীরুদা রেওয়াজ করতে বসল। তাকে ঘিরে অনামী সংঘের সভ্যরা।

হীরুদার সম্বল একটি গানের দুটি লাইন। তাও এই দুঃসময়ে কথাগুলো ভাল করে মনে পড়ল না। গলা শুকিয়ে কাঠ। বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটছে। হাঁটুর সঙ্গে হারমোনিয়মের ঠোকাঠুকি হচ্ছে, ঠক্, ঠক্, ঠক্।

প্রথম লাইন, ব্যাকুল বসন্ত ফিরে ফিরে আসে, কিন্তু অনেক চেষ্টার পর হীরুদার গলা থেকে শুধু আওয়াজ বের হল, ব্যা, ব্যা, ব্যা।

হীরুদা থামল। সামনে জাদরেল যে ছেলেটি বসে ছিল, তাকে বলল, শুনুন, আমার গানের যা লাইন, তাতে উদ্বোধন সংগীত না করে, সমাপ্তি সংগীত করুন। একেবারে শেষকালে আমি গাইব। জয়জয়ন্তী সুরটা মাঝরাতেই ভাল জমে, আপনি গুণী ব্যক্তি, আপনাকে আর বেশী কি বোঝাব।

ছেলেটি বিজ্ঞের মতন ঘাড় নাড়ল, তারপর অন্য সকলের দিকে ফিরে বলল, ঠিক আছে, ওরে ফটকে, হাবা, ভুতো প্রথমে জিমন্যাস্টিক শুরু করে দে। ওসব গানফান শেষকালে হবে।

হীরুদার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। অনামী সংঘের বার্ষিক অধিবেশন। আজ সভা, কাল সভ্যদের ফিস্ট, হইহই ব্যাপার।

জিমন্যাস্টিক একটু জমে উঠতেই সকলের অলক্ষ্যে হীরুদা আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এল। কোন ভুল নেই, নিজের কানে শুনেছে। প্রথমে ভেবেছিল প্রতিধ্বনি, তারপরই মনে পড়ল খোলা মাঠে আসর। প্রতিধ্বনি আসবে কোথা থেকে।

এগোতেই নজরে পড়ল। মেটে মেটে গায়ের রং, সুপুষ্ট চেহারা একটু ছোটছোট শিং। এ বিজন না হয়ে যায় না। হ্যাজাকের আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

NOT FOR SALE

যতবার হীরুদা গানের লাইন বলতে গিয়ে ব্যাব্যা করেছে, ততবার বিজন নিজের লোক ভেবে ঠিক উত্তর দিয়ে গেছে। হীরুদা কান খাড়া করে শুনেছে।

বিজন একমনে কাঁঠাল পাতা চিবোচ্ছিল, হীরুদা আস্তে আস্তে পাশ দিয়ে গিয়ে নিজের আলোয়ানটা তার ওপর চাপা দিয়ে দিল, যেন টুঁ শব্দ না করতে পারে। তারপর খোঁটাসুদ্ধ তুলে নিয়ে হীরুদা তীরবেগে পীচের রাস্তা ধরে ছুটল।

হীরুদা যখন পলাশপুরের জমিদার বাড়ির চৌকাঠে এসে পৌঁছল, তখন রাত হয়েছে। হীরুদার অবস্থাও শোচনীয়। মুক্তকচ্ছ, শার্টের অর্ধেকটা কাঁটাগাছে লেগে ছিঁড়ে গেছে, সারা কাপড়ে চোরকাঁটা, খড়ের গাদার মধ্যে একবার পড়ে গিয়েছিল, মাথা বোঝাই খড়। তবু বিজনকে ছাড়ে নি।

হাঁকডাকে অনুকূলবাবু বেরিয়ে এসেই চেঁচামেচি শুরু করলেন, এই যে এসেছেন। আমি তো ভয়েই মরি। বিজনকে খুঁজতে এসে গোয়েন্দাই নিখোঁজ হল। কি ভয়ংকর ব্যাপার!

হীরুদা এত কথার কোন উত্তর দিল না। আলোয়ানটা খুলে বিজনকে নামিয়ে দিয়ে বলল, এই নিন মশাই আপনার পাঁঠা। আজ রাত্রেই আমার যাবার বন্দোবস্ত করে দিন। জরুরী ডাক এসেছে।

অনুকূলবাবু বিজনকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে আদর করতে করতে বললেন, সে কি, এই রাতেই চলে যাবেন। আপনি আমার যা উপকার করেছেন—

বাধা দিয়ে হীরুদা বলল, থাকবার উপায় নেই। খবর এসেছে শক্তিগড়ের রাজার ভায়রাভাইয়ের মুক্তাবসানো একপাটি নাগরা হাওয়া হয়েছে, কাল ভোরেই আমায় সেখানে যেতে হবে।

অতএব। সেই রাত্রেই জীপ বেরোল। অনুকূলবাবু হীরুদার হাতে করকরে একটা একশ টাকার নোট দিয়ে বললেন, আপনার ঋণ শোধ হবার নয়। দয়া করে আর একদিন যদি পায়ের ধূলো দেন।

জীপ চলতে শুরু করেছে। মনে হল অনেক দূর থেকে যেন হল্লার শব্দ ভেসে আসছে। কপালের ঘাম মুছে হীরুদা বলল, ব্যা-ব্যা-ব্যস্ত হবেন না। আবার দেখা হবে। গোয়েন্দাগিরি যখন পেশা তখন ডাকলেই আসব। আজ চলি, নমস্কার!

—সমাপ্ত—

NOT FOR SALE

বাদশার কাণ্ড

বাদশাকে চেন? রামপরায়ণবাবুর ভাইপো। দেখতে ছোট্ট হলে হবে কি, সবাই বলে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত বুলিতে ঠাসা বোঝাই। সর্বদাই মতলব ভাঁজছে। কি করে কাকে ঘায়েল করবে।

আর বাড়ির লোকগুলোও তেমনি। কেবল তাকে চোখে চোখে রাখছে, যেন জেলখানার কয়েদী। একটু আড়ালে গিয়ে সবে আচারের জারে হাত ঢুকিয়েছে, অমনি মায়ের চিৎকারের পর চিৎকার।

বাদশা, বাদশা কোথায় গেলি? মাঝে মাঝে বাদশার ইচ্ছে হয়, সত্যি বাদশা হয়ে সবাইকে কোতলই করে ফেলে। যা হোক, মার ডাকে তাড়াতাড়ি আচারের হাতটা মুখে মুছে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘাড় হেঁট করে বলল, ডাকছ মাতা?

অতি বিনয়ের সময় বাদশা বিশেষ বিশেষ শব্দ সাধু ভাষায় প্রয়োগ করে। কিন্তু সাধু ভাষায় গলে যাবার মেয়ে মা নন। ঝুঁকে পড়ে চোখদুটো কুঁচকে বাদশার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, হ্যাঁরে বাদশা, তোর ঠোঁটের ওপর অত তেল কেন?

বাদশা জিভ দিয়ে তেল মুছে নেবার শেষ চেষ্টা করল, কিন্তু ফল হল না। তেল তো মুছলই না, বরং সারাটা গাল বেয়ে তেল জবজবে হয়ে রইল।

এভাবে বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা যায় না। বিশেষ করে মা যখন প্রশ্নের উত্তর পাননি।

বাদশা বলল, কাল তুমি বললে না, বেলা অবধি হুড়োহুড়ি না করে তাড়াতাড়ি স্নান করে নিবি, তাই তেল মেখে নিলাম না।

মা ঘাড় নাড়লেন। দু'চোখে অবিশ্বাসের ঝিলিক।

হ্যাঁরে, তেল শুধু ঠোঁটে আর গালে মাখলি? চুলে নয়, শরীরের অন্য কোথাও নয়।

এবার বাদশা কপট অভিমানে ঠোঁট ফোলাল।

আমি তো আর দশানন নই মা, যে বিশটা হাতে একসঙ্গে মাথায়, পিঠে, বুকে, পায়ে, সর্বাঙ্গে তেল চাপড়াব। সবে গালে মেখেছি, অমনি তো তুমি চিৎকার করতে শুরু করলে, বাদশা, বাদশা। আমি তেলের বাটি রেখে ছুটে চলে এলাম।

NOT FOR SALE

মায়ের সন্দেহ যাবার নয়। দুটো হাত বাদশার কাঁধে রেখে মুখটা তার গালের কাছে নিয়ে গিয়ে বাতাসে কি শুঁকলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, উহুঁ, এ তো জবাকুসুম তেল নয়। এ তো অন্যরকম গন্ধ।

বাদশা প্রমাদ গনল। কোনরকমে নিজের কাঁধদুটো মায়ের থাবা থেকে ছড়িয়ে একটু নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বলল, তা এবার মনে পড়েছে মা, ওই যে দু'বেলা বাবা যে টনিকটা দিয়েছে, সেটা খাচ্ছি তো, তাই এরকম হয়েছে। মা তখনও বিস্মিত।

টনিক খেলে গাল তেল চটচটে হবে কেন?

বাদশা আপত্তি করল, তেল চটচটে কেন হবে? তৈলাক্ত হয়েছে। আমাদের স্বাস্থ্যনীতির বইতেই তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, স্বাস্থ্যবানের চর্ম তৈলাক্ত হয়। গাল থেকে আমার শুরু হয়েছে মা, আস্তে আস্তে সর্বাঙ্গই তৈলাক্ত হয়ে যাবে, মানে আর মাসছয়েক টনিকটা খেলেই।

রামপরায়ণবাবু পাশের ঘরে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ভাইপোর কথাগুলো কানে সবই গিয়েছিল। তিনি কাগজ হাতে বেরিয়ে এসে বললেন, আমি তো আর একটা কথা ভাবছি বাদশা।

বাদশা কোনরকমে মায়ের সামনে থেকে সরে জ্যাঠার খুব কাছে এসে দাঁড়াল, জ্যাঠার হাতের একটা আঙুল ধরে বলল, কি জেঠু? তোমার গালে তেলের খনিটনি বের হল না তো, আসামে কিন্তু অনেক জায়গায় প্রথম প্রথম এই রকম মাটির ওপর তেল ভাসে। তাহলে তো খুব চিন্তার কথা।

বাদশাও দমবার ছেলে নয়। একগাল হেসে বলল, তাহলে তো ভালই হয় জেঠু, তোমার চায়ের বাগান তো আছেই এবার তেলের খনিও একটা হয়ে যাবে।

এহেন বাদশা বেশ একটু বিপাকে পড়ে গিয়েছে। অনেক ভেবেও কিছু কুলকিনারা করতে পারছে না।

সামনে পরীক্ষা, তাই বাড়িতে হুকুম হয়েছে মাস্টারমশাই রবিবার সকালেও পড়াতে আসবেন। অথচ রবিবার সকালে পাড়ার মণ্টুর সঙ্গে বাদশার ঠিক হয়েছে, ভোর থেকে ছাতে মাঞ্জা দেবে, আর মাঞ্জা তৈরি হয়ে গেলে সারাটা দুপুর ঘুড়ির কেরামতি দেখাবে। গোটা সাতেক ঘুড়ি কিনে চিলেকোঠার ঘরে লুকিয়ে রেখে এসেছে। কিন্তু সকালটা যদি মাস্টারমশাইয়ের কাছেই কাটে, তাহলে সব নষ্ট। তাছাড়া মণ্টুর কাছে মুখ দেখানোও যাবে না। বলবে, ছি ছি কথা দিয়ে কথা রাখে না, সে আবার মানুষ।

অথচ বাড়িতে অনবরত সবাই বলে, মানুষের দাম তার কথায়। আশুতোষ, বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে বিধানচন্দ্র পর্যন্ত কথার মর্যাদা রক্ষা করে গেছেন। কিন্তু এ কথাটা বাদশা বলতে গেলেই বাড়িতে হুলস্থূল ব্যাপার আরম্ভ হয়ে যাবে।

NOT FOR SALE

মানুষ যে কেন এতদিন ছোট থাকে, ঈশ্বর জানেন। গালে হাত রেখে বাদশা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই তো রবিবার সকালে জেঠুর ঘরে বিরাট আড্ডা বসে। সকাল ন'টা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত। কাপ কাপ চা আর থালা থালা খাবার। আর কি প্রচণ্ড হাসি। বেশ মনে আছে বাদশার, একদিন বিকট হাসির দমকে একটা টিকটিকির লেজই খসে গিয়েছিল। আর বাবা তো রুগী আর ডিসপেনসারি নিয়েই ব্যস্ত। সময়ে কোনদিন নাওয়া খাওয়া করেন না। অথচ তার বেলা কেউ একটি কথাও বলে না। কেবল এক রবিবার একটু মাঞ্জা দিলে আর ঘুড়ি ওড়ালেই বাদশার যত দোষ।

শত্রুপুরী। বাদশা শত্রুপুরীর মধ্যে বাস করছে।

ঠক্ ঠক্ ঠক্।

দরজার শব্দ হতেই বাদশা চমকে উঠল, তারপরই মনে পড়ল ঠাকুর কি একটা কাজে বাইরে গেছে, তাই মাস্টারমশাইয়ের খাবারের থালাটা নিয়ে যাবার জন্য মা ডাকছেন। বাদশা উঠে থালাটা নিয়ে টেবিলের ওপর রাখল। মাস্টারমশাই হাত মুখ ধুতে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎচমকের মতন বুদ্ধিটা বাদশার মাথায় খেলে গেল।

টেবিলের পাশেই আলমারি। নমুনা হিসাবে নানা জায়গা থেকে যেসব ওষুধ বিষুধ বাড়ি আসে, বাদশার বাবা সেগুলো এর মধ্যেই রেখে দেন। ওর মধ্যে গোলাপী বড়িগুলো যে জোলাপের সেটা বাদশার বেশ জানা। জানা, কারণ মায়ের ধমকানিতে মাসে একবার ওই বড়ি গিলতে হয়।

আর কালবিলম্ব না করে বাদশা গোটা পাঁচেক বড়ি মাস্টারমশাইয়ের গরম দুধে ফেলে দিল তারপর বাংলা কবিতার বই খুলে চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করল বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

পড়তে পড়তেই আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখল মাস্টারমশাই তরকারি সহযোগে বাইশখানা লুচি শেষ করে, দুধের বাটিতে চুমুক দিলেন। বাদশা অন্য এক কবিতা ধরল। জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো।

পরের দিন ভোর থেকেই বাদশা ছাদে উঠে মাঞ্জার সরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, মায়ের ঘরে কয়েক ডাকের উত্তরে খুব মৃদুগলায় বলল, মাস্টারমশাই এলেই আমাকে ডেকে দিও মা, আমি নেমে আসব।

দশটা বেজে গেল। মাস্টারমশাই এলেন না। ওরই মধ্যে মণ্টু একবার মনে করিয়ে দিল, হ্যাঁরে বাদশা, আজ সকালে তোর মাস্টারমশাইয়ের আসার কথা ছিল না?

মাঞ্জা দিতে দিতে যথাসম্ভব উদ্বিগ্ন গলায় বাদশা বলল, তাঁর কথাই তো অনবরত ভাবছি ভাই। সামনে পরীক্ষা, এ সময়ে সকালে-বিকালে পড়তে হবে। শরীরগতিক কেমন আছে, কে জানে।

NOT FOR SALE

মাস্টারমশাই এলেন একেবারে দিন তিনেক পর। কোটরগত চোখ, দুটো গাল চুপসে গেছে। চেহারা বেশ কাহিল। কণ্ঠস্বরে আগের মতন জোর নেই।

বললেন শরীর বড় খারাপ হয়ে পড়েছিল। তিন দিন বার্লি খেয়ে ছিলাম।

বাদশা বীজগণিতের বই খুলে বহুকষ্টে হাসি সামলাল।

এই ব্যাপারের পর থেকে বাদশার কেমন একটা ধারণা হয়ে গেল যে চিকিৎসাশাস্ত্র তার বেশ করায়ত্ত। সময়ে অসময়ে রোগীর ত্রাণের জন্য, কিংবা সহজ মানুষকে বিপাকে ফেলার জন্য ওষুধ-বিষুধ দেওয়াটা খুব দোষের নয়।

বাদশার ডাক্তারি শুরু হয়ে গেল। বাবার নতুন ওষুধের শিশি এলেই বাদশা মনোযোগ দিয়ে দেখে। রোগীর সঙ্গে বাবা যখন কথা কন, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনে। মাঝে মাঝে অন্য দু-একজন ডাক্তার বন্ধুও আসেন। ওষুধপত্র নিয়ে বাদশার বাবা তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেন। বিশেষ কোন ওষুধের বা বড়ির দোষ গুণ সম্বন্ধে। বাদশা তন্ময় হয়ে শোনে।

বাদশার এই ব্যাপারই কাল হল। হোলির দিনকতক পরে বাড়ির ঠাকুর বাদশার বাবার কাছে এসে দাঁড়াল, সঙ্গীন অবস্থা। গলা দিয়ে একফোঁটা স্বর বের হচ্ছ না। পনেরো দিন ধরে ঢোল সহযোগে 'রামা হো' করে রামের কৃপায় গলার দফা রফা।

বাদশার বাবা অবজ্ঞাভরে একবার চেয়ে দেখলেন তারপর বললেন, গরম জলে নুন ফেলে কুলকুচি কর বার কয়েক। ঠিক হয়ে যাবে।

ঠাকুর ভেবেছিল ডাক্তারবাবু ওষুধ কিংবা বড়ি দেবেন। যাতে সে দু'দিনে চাঙ্গা হয়ে উঠবে, কিন্তু তার বদলে স্রেফ কুলকুচি। মনটা রীতিমত খুঁতখুঁত করতে লাগল।

শুধু ঠাকুরের নয়, বাদশারও মনে খুঁতখুঁতানি শুরু হল। দিন কয়েক আগে তার বাবা এক শিশি সাদা বড়ি এনে মাকে বলেছিলেন, গলা ব্যথা আর গলা ধরার চমৎকার ওষুধ বেরিয়েছে। আলমারির নিচের তাকে রেখে দিলাম। দরকার হলে বলো।

অমন ধন্বন্তরি ওষুধ বাড়িতে থাকতেও ঠাকুরকে শুধু গরম জলের নির্দেশ দিবার কোন মানে হয় না। তা নয়, এই ঠাকুরের ওপর বাবার একটু রাগ আছে, বিশেষ করে সেদিন অমন চমৎকার ভেড়ার মাংসটা নুনে পুড়িয়ে দেবার পর থেকে।

ঠিক আছে, বাবা ওষুধ না দেন, বাদশা তো রয়েছে। আলমারির কোথায় কি আছে তার নখদর্পণে।

বাবা বেরিয়ে যেতেই বাদশা আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আলমারির পাল্লা খুলেই তার চক্ষুস্থির। সাদা বড়ি ভরা শিশি রয়েছে বটে, কিন্তু একটা নয় তিনটে। কোনটা গলাব্যথা সারার ওষুধ ঠিক করাই মুশকিল।

NOT FOR SALE

বাদশা পিছপা হবার ছেলে নয়। ওরই মধ্যে থেকে একটা শিশি বের করে নিল। ছিপি খুলে গোটা চারেক বড়ি বের করে পাতলা কাগজে মুড়লো। এটা সে বাপের কাছ থেকেই শিখেছে, তারপর যেখানে ঠাকুর কম্বল বিছিয়ে শুয়েছিল, সেখানে গিয়ে বলল, এই নাও ওষুধ। দু'ঘণ্টা অন্তর একটা করে খাবে।

ওষুধের কথা শুনে ঠাকুর ধড়মড় করে উঠে বসল। হাত বাড়িয়ে বড়িগুলো নিতে নিতে বলল, ডাক্তারবাবু দিয়ে গেছেন বুঝি?

কথাগুলো অবশ্য সে খুব কষ্ট করেই উচ্চারণ করল।

বাদশা আর বেশি কথা বলল না। বেশিক্ষণ দাঁড়ালও না সেখানে। রোগীর সঙ্গে বেশি অন্তরঙ্গতা করাটা ডাক্তারের পেশার পক্ষে ক্ষতিকর, যেটা বাদশা এই অল্পবয়সেই বুঝেছিল।

বড়িগুলো ভালই। পরের দিন সকালেই ফল পাওয়া গেল।

প্রথমে রামপরায়ণবাবুর কানে গেল। কামারের হাপরের মতন ফ্যাস ফ্যাস শব্দ একটানা।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমেই রামপরায়ণবাবু থমকে দাঁড়ালেন। ঠাকুর চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে। নিশ্বাসের তালে তালে বুকটা ওঠানামা করছে, আর মুখ থেকে ওই রকম শব্দ। রামপরায়ণবাবু কান পেতে কিছুক্ষণ শুনলেন। মনে হচ্ছে যেন ঠাকুর 'রাম' 'রাম' বলা চেষ্টা করছে, কিন্তু শব্দ বের হচ্ছে 'আম' 'আম'। কণ্ঠস্বর অবিকল ভিজে ঢাকের অনুরূপ। রামপরায়ণবাবু সান্ত্বনা দিলেন, কোন ভয় নেই। ডাক্তারবাবু উঠলেই খবর দিচ্ছি। একটা বড়ি টড়ি দিয়ে দেবে।

অ্যাঁ! রামপরায়ণবাবুর কথা শেষ হবার আগেই দুটো চোখ কপালে তুলে ঠাকুর একটা আর্তনাদ করে উঠল, তারপর এক বগলে কম্বল আর এক বগলে বালিশ নিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল, রামপরায়ণবাবুকে একেবারে হতভম্ব করে।

এরপর মাস দুয়েক বাদশা বেশ একটু সাবধান হয়ে গেল। ওষুধ আর বড়ির শিশির দিকে গেলোই না।

কিন্তু একদিন সুযোগ জুটে গেল। দুপুরবেলা বাড়ির সবাই ঘুমে অচেতন। কেবল বাদশা বাইরের দাওয়ায় গুলি খেলছিল, এমন সময় একটি মহিলা এসে হাজির।

বাদশার আশ্চর্য লাগল। রোগীর দল যা আসে, সকালে আর বিকালে। সবাই জানে দুপুরবেলাটা ডাক্তারবাবুর দিবানিদ্রার সময়, তবে এ মহিলা এখন এসে দাঁড়াল যে?

কাকে চাই? গুলিগুলো প্যান্টের পকেটে রেখে বাদশা জিজ্ঞাসা করল।

ডাক্তারবাবুকে। মহিলার গলার স্বর কান্না-মেশানো।

NOT FOR SALE

ডাক্তারবাবু এখন ঘুমোচ্ছেন।

একটা কাজ করতে পারবে বাবা? মহিলা অনুনয় করল।

আমি বাবা নই, বাদশা। কি কাজ করতে হবে।

ডাক্তারবাবু উঠলে বলবে আমি অশোকবাবুর বাড়ি থেকে আসছি। অশোকবাবুর হাঁপানিটা ভীষণ বেড়েছে। বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন। ব'লো, আমি তাঁর মেয়ে এসেছিলাম।

বাদশা ঘাড় নাড়ল। এ আর শক্ত কথা কি। বাবা উঠলেই ঠিক বলবে। বাবা বিছানা থেকে নামবার আগেই বাদশা কথাটা বলল।

ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন তারপর বাদশার মা'র দিকে ফিরে বললেন, আর ওষুধপত্র দিয়েই বা কি হবে? একবছর ধরে ওষুধ, ইনজেকশন তো বড় কম দিইনি। ভদ্রলোকের বয়সও হয়েছে আর অসুখটা বড় বেয়াড়া।

বাদশা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনল। শুনল বটে, কিন্তু কথাগুলো ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। এমন অসুখও পৃথিবীতে আছে নাকি, যা সারাতে ডাক্তারবাবুও হার মেনে যায়।

সন্ধ্যার দিকে ডাক্তারবাবু বেরিয়ে যাবার পরই মহিলা এসে হাজির। বাদশা নিচে বসে পড়ছিল, তখনও মাস্টারমশাই আসেননি।

মহিলাকে দেখে বাদশা গিয়ে দাঁড়াল। অশোকবাবুর কথা ডাক্তারবাবুকে বলেছ?

বাদশা ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ।

কি বললেন?

ডাক্তারবাবু যা বলেছেন তা বলতে বাদশার সাহস হল না। শুনলে মহিলা হয়তো এখনই ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করবে। তাই বাদশা গম্ভীর গলায় বলল, একটা ওষুধ রেখে গেছেন।

ওষুধ রেখে গেছেন? মহিলা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে বলল, কই দাও। এখনই নিয়ে গিয়ে বাবাকে খাইয়ে দিই।

মহিলাকে অপেক্ষা করতে বলে বাদশা আলমারির সামনে এসে দাঁড়াল। পাল্লা ধরে টান দিতেই কপালে হাত চাপড়াল। সর্বনাশ, এযে তালা বন্ধ। ঠাকুরের ব্যাপারে নিশ্চয় বাদশাকে সন্দেহ করেছে, তাই সে ওষুধে যাতে হাত না দিতে পারে তারই কঠোর ব্যবস্থা হয়েছে।

এখন উপায়? মহিলা হাত পেতে বাইরে দাঁড়িয়ে। কি বলবে তাকে? এদিক ওদিক চোখ ফিরিয়েই বাদশার নজরে পড়ে গেল।

কোণের টেবিলের নিচে এক ডেকচি ভরা কাচের গুঁড়ো আছে, সাবু আছে, মুরগির ডিম গোলা অছে। একেবারে খুরধার মাঞ্জার সব উপকরণ।

NOT FOR SALE

জানলার তাকের ওপর থেকে বাদশা মোটা দেখে একটা শিশি পেড়ে নিল, তারপর ডেকচি থেকে হাত দিয়ে পদার্থটা তুলে শিশিতে ভরে ফেলল।

মহিলা উদ্গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাদশাকে দেখেই বলল, এনেছ বাবা?

শিশিটা মহিলার হাতে তুলে দিতে দিতে বাদশা বলল, এটা খাবার ওষুধ নয় কিন্তু মালিশের ওষুধ। একটু গরম করে নিয়ে বুকে বেশ করে মালিশ করতে হবে।

আগ্রহে শিশিটা জাপটে ধরে মহিলা দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন ভোরবেলা। ডাক্তারবাবু বসে বসে পত্রিকা পড়ছিলেন, বাদশা রান্নাঘরে চা ডিমের তদারকে ব্যস্ত, এমন সময় হাঁউমাউ করতে করতে মহিলাটি ডাক্তারবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল।

শব্দটা বাদশার কানে ঠিক গিয়েছিল আর জানলার ফাঁক দিয়ে দৃশ্যটাও তার চোখ এড়ায়নি। তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ আর ডিমের রেকাবিটা নামিয়ে বাদশা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। পিছনের দরজা দিয়ে, বাইরের ঘরের পাশ দিয়ে মাথা নিচু করে, বড় নালাটা ডিঙিয়ে একেবারে গঙ্গার ধার অবধি যাবার ইচ্ছা ছিল।

বাইরের ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতেই বাদশার কানে এল তার বাবার সান্ত্বনাবাণী।

আর কি করবে বল? মানুষ তো আর চিরদিন নয়। আমরা ওষুধ দিতে পারি কিন্তু পরমায়ু তো আর দিতে পারব না। বয়সও তো হয়েছিল। কান্নাকাটি করে আর লাভ কি? মহিলা এবারে ডাক্তারবাবুর দুটো পা জড়িয়ে ধরল, ডাক্তারবাবু, আপনি ধন্বন্তরী। সব ডাক্তার এক কথা বলেছে, এ রোগ সারবার নয়। আপনিও তো ইনজেকশন আর ওষুধ কম দেননি, কিন্তু কাল খোকার হাতে যে মালিশের ওষুধটা রেখে গিয়েছিলেন, সেটা একেবারে দৈব ওষুধ। আপনি যেমন বলে গিয়েছিলেন, ওষুধটা একটু গরম করে রাত এগারোটা অবধি বাবার বুকে মালিশ করেছি। একেবারে ধুঁকছিলেন, মালিশের পর যন্ত্রণা অনেক কমে গেল। আরামে ঘুমোতে লাগলেন। আজ ভোরে আমার উঠতে একটু দেরি হয়েছে, খটখট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি বাবা বিছানায় নেই। দরজা খোলা। বাইরে গিয়েই অবাক। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বাবা ক্রিকেট খেলছেন। ওই মালিশ আমায় আর এক শিশি দিন ডাক্তারবাবু।

এই অবধি শুনেই বাবার অবস্থা বুঝতে পেরে বাদশা আর অপেক্ষা করল না। তীরবেগে মাঠঘাট পেরিয়ে একেবারে নাগালের বাইরে চলে গেল। ছুটতে ছুটতে বুকে হাঁপ ধরে গেল। তা ধরুক, হাঁপানির ভাল ওষুধ তো ঘরেই রয়েছে। বাদশার হাতের কাছে।

—সমাপ্ত—

NOT FOR SALE

সর্পিণী

কাহিনীটা শুনলাম ভাইফোঁটার দিন। বোন রেণু থাকে নাটোর পার্কে। রাতে ভুরিভোজনের ব্যবস্থা ছিল। আহারপর্বের আগে রেণুর সাজানো ড্রইংরুমে জমিয়ে গল্প চলছিল। গল্প ঠিক নয় —সত্য কাহিনী। সাপের কথা।

আমার খুড়তুতো ভাই মণির বাড়ি ভবানীপুরে, একেবারে শহরের প্রাণকেন্দ্রে বলা যেতে পারে। সেখানে নাকি কদিন আগে সাপের আবির্ভাব হয়েছিল। আশেপাশে জঙ্গল তো দূরের কথা, অযত্নবর্ধিত বাগানও ছিল না। চারধারে শান বাঁধানো উঠান। ঝকঝকে, তকতকে। সূচ পড়লে কুড়িয়ে নেওয়া যায়।

মাঝরাতে মণি বাথরুমে যাবার জন্য উঠে চৌকাঠের কাছে রাখা চটি জোড়ায় পা গলাতে গিয়েই চমকে উঠল। তার মনে হল যেন বরফের ওপর পা রেখেছে, এমনি তুহিনশীতল। তাড়াতাড়ি সুইচ টিপে আলো জ্বালতেই তিন পা পিছিয়ে এল।

লম্বায় ফুট খানেক। গায়ের বর্ণ হলদে, তার ওপর আড়াআড়িভাবে কালো ডোরা। এঁকেবেঁকে মেঝের ওপর দিয়ে বইয়ের সেলফ্-এ আশ্রয় নিল।

এই ভবানীপুরে মণির জন্ম। এই বাড়িতে। বাড়িটি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। উইলে স্পষ্ট করে লেখা আছে পুত্র-কলত্র নিয়ে মণি এ ভদ্রাসন ভোগ-দখল করবে। সাপের সঙ্গে বসবাস করতে হবে এমন কথা কোথাও লেখা নেই।

ঘরের মধ্যে একটি লাঠি অবশ্য আছে কিন্তু সে লাঠিটা যে দেয়ালের কোণে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে, বইয়ের সেলফটি তারই পাশে। অর্থাৎ লাঠি করায়ত্ত করতে হলে সাপটিকে অতিক্রম করতে হবে।

মণি এবার নিজের শোবার ঘরে ফিরে গেল। দুই ছেলে ঝন্টু আর টুন্টু বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, তাদের ডেকে তুলল।

ঝন্টু আড়মোড়া ভেঙে উঠেই খাট থেকে নেমে হনহন করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

মণি তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল তাকে।

কিরে, কোথায় যাচ্ছিস?

মুখ হাত ধুয়ে বেরিয়ে পড়ি।

NOT FOR SALE

রোজ গড়ের মাঠে প্রাতঃভ্রমণ করা ঝন্টুর অভ্যাস। সে ভাবল, বোধ হয় ভোর হয়ে গেছে। তাই বাবা ডেকে তুলল।

মণি ব্যাপারটা বুঝল। বলল, না না, ভোর হয়নি। ঘরে সাপ ঢুকেছে। টুন্টুও জেগে উঠেছিল, কিন্তু খাট থেকে নামেনি। দু হাঁটুর ওপর মুখটা রেখে ব্যাপারটা কি বোঝবার চেষ্টা করছিল। সে এবার বলল, সাপ? খাট নড়ে উঠতে আমি মনে করলাম ভূমিকম্প। সাপটা বোধহয় চিড়িয়াখানা থেকে এসেছে। চারদিকেই তো খাদ্যাভাব। খবর পেয়েছে আজ সকালে আমাদের রেশন এসেছে।

মণির স্ত্রী ইলা বিছানার ওপর বসে গলায় আঁচল দিয়ে মনসার স্তব শুরু করেছিল। সে কোনো কথা বলল না।

খাটের তলা থেকে ঝন্টু তার ছাতাটা বের করল। অবশ্য ছাতার আর বিশেষ পদার্থও নেই। স্কুলে যাওয়া-আসার পথে অন্য ছেলেদের সঙ্গে হকি খেলার জন্য ছাতাটি ব্যবহার করায় ছাতাটি প্রায় হকি স্টিকের আকারই ধারণ করেছে।

প্রথমে ছাতি হাতে ঝন্টু, মাঝখানে মণি, একেবারে শেষে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে টুন্টু পড়ার ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়ায়।

সাপটি ইতিমধ্যে বোধহয় নড়াচড়া করেছে। সেলফ থেকে একটি বই মেজের ওপর পড়ে রয়েছে খোলা অবস্থায়। টুন্টুর বই। দূর থেকে বইয়ের চেহারা দেখেই টুন্টু বুঝতে পারল বইটি সরল বীজগণিত প্রবেশিকা। সাপটিকে ধারে কাছে কোথাও দেখা গেল না।

ঝন্টু ছাতি দিয়ে দরজায় ঠকঠক করল। কাজ হল। সাপটি চেয়ারের একটি পায়াতে জড়িয়ে ছিল, আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে নেমে এঁকেবেঁকে বীজগণিত বইটার ওপর শুয়ে পড়ল।

সর্বনাশ করেছে। টুন্টু চীৎকার করে উঠল, ও বইটা ছোঁয়া যাবে না। বিষে ভরতি হয়ে গেছে। কালই ও বই ফেলে দিতে হবে।

বইটাকে বাড়ি-ছাড়া করতে পারলে টুন্টু বাঁচে। মাসের মাঝামাঝি, বাবা যে এখনই নতুন একটা বই কিনে আনবে এমন আশঙ্কা কম। সাপের কল্যাণে অন্তত দিন পনের টুন্টু বীজগণিতের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

টুন্টুকে সাহস দেবার জন্য মণি বলল, সাপটা বিষধর নাও হতে পারে। সব সাপের তো আর বিষ থাকে না।

টুন্টু বলল, সাপটার বিষ আছে কি না পরীক্ষা করে দেখতেই হয়? সোজা উপায় তো রয়েছে।

কিসের সোজা উপায়?

NOT FOR SALE

আড়চোখে বাপকে একবার দেখে নিয়েই টুণ্টু বলল, সাপটাকে হাঁ করিয়ে গালের দুপাশে বিষের থলি আছে কিনা দেখে নিলেই হয়।

উত্তরে মণি কনিষ্ঠ পুত্রের দিকে কটমট করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।

'তাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা হচ্ছে' সাপটা সম্ভবত তার আভাস পেয়ে থাকবে, তাই পিতা-পুত্রের কথাবার্তার সুযোগে সে দরজার দিকে এগোতে লাগল। প্রায় নক্ষত্র গতিতে।

ঝণ্টু ছাতি নিয়ে তৈরি ছিল। বার পাঁচেক ছাতির বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করতেই ছাতি আর সাপ দুটোই দেহরক্ষা করল।

সাপের এ কাহিনী মণিই বলেছিল রেণুর ড্রইং রুমে বসে।

এ পর্যন্ত বলেই সে থেমে গেল।

বেলাদি এসে ঘরে ঢুকলেন। রেণুর বড় ননদ। থাকেন আসাননগরে, ভাইফোঁটার ব্যাপারে দিনকয়েক হল এখানে এসেছেন।

একটা কৌচে বসতে বসতে বললেন, কিসের গল্প হচ্ছে?

বললাম, সাপের।

বেলাদি হেসে বললেন, শহরে সাপের গল্প, তার মানেই বানানো।

মণি তার তীব্র প্রতিবাদ করল, কখনই না। একেবারে খাঁটি সত্যি কাহিনী। আপনি এ ধরনের প্রশ্ন তুলবেন জানলে সাপের চামড়াটা রেখে দিতাম।

মণির কথায় বেলাদি হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, শোন, আমি একটা সাপের গল্প বলি। অবশ্য গল্প এটা মোটেই নয়, আমার চোখে দেখা ঘটনা।

সবাই আমরা বেলাদিকে ঘিরে ঘন হয়ে বসলাম।

বেলাদি আরম্ভ করলেন।

আসাননগর দুটি জিনিসের জন্য বিখ্যাত, একটা আম, আর একটা সাপ। দুটোই একেবারে খানদানী। আমাদের বাড়িটা দুতলা, ওপর তলায় আমি থাকি, নিচেটা এতদিন খালি ছিল। গত মাসে ভাবলাম, কেন একতলাটা এভাবে পড়ে থাকে, ভাড়া দিয়ে দিই। আজকাল কোথাও তো আর লোকের কমতি নেই। সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াটে জুটে গেল। স্বামী-স্ত্রী দুজন লোক। নির্ঝঞ্ঝাট, আমারও কথা বলবার লোক হল।

বেশ দিন কাটছিল, হঠাৎ একদিন মাঝরাতে ভদ্রলোক চেঁচামেটি শুরু করল। আমি নিচে নামলাম।

কি হল?

প্রকাণ্ড এক সাপ জালার পিছনে।

ভদ্রলোক হাত দিয়ে কোণের দিকে দেখাল।

আজ নতুন নয়, দশ বছরের ওপর আমি জানি। ওই কোণে জালার মধ্যে

NOT FOR SALE

একজোড়া রাজগোখরোর বাস। বাস্তুসাপ। কোনদিন কারো অনিষ্ট করে না। অনেক দিন দেখেছি, সিঁড়ির চাতালে দুজনে ভোরের রোদে শুয়ে আছে। আমি আস্তে আস্তে বলেছি, সর, সর, আমি নামব।পথের মাঝখানে এভাবে রোদ পোহায়। সঙ্গে সঙ্গে সাপ দুটো নেমে উঠোন পার হয়ে বাইরের বাগানের দিকে চলে গিয়েছে।

মণি হেসে বলল, সাপ বাংলা ভাষা বেশ বোঝে মনে হচ্ছে। এদেশে জন্মের ফল, না বাঙালী পরিবারের ঘনিষ্ঠতার জন্য?

কি জানি, সে সব কথা বলতে পারব না। যা ঘটেছে সেটাই শুধু তোমাদের জানাচ্ছি। তাই ভদ্রলোককে বললাম, আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। ওরা বাস্তুসাপ, অনিষ্ট না করলে, কখনও আপনাদের অনিষ্ট করবে না।

ভদ্রলোক রেগে উঠল, আপনার কথায় মোটেই ভরসা পাচ্ছি না।জাত-সাপ নিয়ে একঘরে বাস করার সাহস আমার নেই। আপনি একটা ব্যবস্থা করুন ।

ব্যবস্থা আর কি করব! রাতটা আপনারা দুতলায় কাটাবেন চলুন। কাল সকালে যা ভাল বিবেচনা করেন করবেন।

তাই হল। ওপরে আমার বাড়তি ঘরে স্বামী-স্ত্রী রাত কাটাল। সকালবেলা নিচে নেমে গেল।নামবার আগে ভদ্রলোক বলল, আজ থেকেই বাড়ি খোঁজার চেষ্টা করব। বাড়ি পেলেই পালাব। এ বাড়িতে আমাদের পোষাবে না।

দিন তিন চার সাপের দেখা পাওয়া গেল না। বাড়ির মধ্যে তো নয়ই, এধারে ওধারে কোথাও নয়। ভদ্রলোক বোধহয় কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি খোঁজার বিরতি দিয়েছিলেন।

কয়েক দিন পর সিঁড়ি দিয়ে নামছি, ভদ্রলোক ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সর্বনাশ হয়েছে, আবার সাপ বেরিয়েছে, এবার একা নয়, একজোড়া।

ভদ্রলোক কোন স্কুলের মাস্টার। স্কুল বন্ধ তাই বাড়িতেই থাকে। সকালে বসে বসে খাতাপত্র দেখছিল, হঠাৎ আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখল, নালার মধ্যে দিয়ে একজোড়া সাপ মন্থর গতিতে বাইরে থেকে ঘরে ঢুকছে রাজকীয় মর্যাদায়, যেন প্রাতঃভ্রমণ শেষ করে নিজেদের ডেরায় ফিরছে।

আমি উঁকি দিয়ে দেখলাম। একটা সাপ অদৃশ্য, আর একটা সাপের পরিপুষ্ট ল্যাজের কিছুটা দেখা যাচ্ছে।

ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললাম। আমার কথা বিশ্বাস করুন, এরা কোন অনিষ্ট করে না। আগে আগে আমার দাদা, বৌদি ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রায়ই এসে থাকত নিচের তলায়। তারাও সাপ দুটোকে দেখেছে, কিন্তু কোনদিন কোন ক্ষতি করেনি।

NOT FOR SALE

ভদ্রলোক অধৈর্যকণ্ঠে বলল, মাপ করবেন, আপনার স্তোকবাক্যে কোন সান্ত্বনা পাচ্ছি না। সাপটার ব্যবস্থা আমি নিজেই করছি।

ভদ্রলোক তীরবেগে বেরিয়ে গেল।

আমি গামছা কাঁধে পুকুরে স্নান করতে যাচ্ছিলাম, আর যেতে পারলাম না। চুপচাপ সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বৌটি এসে আমার কাছে দাঁড়াল। পাংশু মুখ। খুব অল্প বয়স। মনে হল বেশ ভয় পেয়েছে।

তার কাঁধে হাত রেখে বললাম, মিথ্যেই তোমার কর্তা ভয় পাচ্ছেন। এ বাস্তুসাপ। কখনও গৃহস্থের অনিষ্ট করবে না।

বৌটি বলল, আপনি ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলুন। আমার বড্ড ভয় করছে, মনে হচ্ছে, একটা অমঙ্গল যেন এগিয়ে আসছে। সত্যি, এ পর্যন্ত তো ওরা আমাদের কোন ক্ষতি করেনি। আমাদের দিকেও আসে না।

একটু পরেই ভদ্রলোক ফিরল। সঙ্গে বলাই হাড়ী। তার হাতে মোটা একটা লাঠি। বলাই আমাদেরই প্রজা। আমরাই তাকে থাকবার জন্য ভূমি ছেড়ে দিয়েছি।

আমাকে দেখে বলাই প্রণাম করল, তারপর ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বলল, কই, সাপ বাগানের কোন্ দিকে?

বাগানে নয়, ঘরের মধ্যে।

ভদ্রলোক আঙুল দিয়ে দেখাল।

বলাই একবার ঝুঁকে পড়ে দেখেই সরে এল। হাতের লাঠিটা পাশে রেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলল, ও সর্বনাশ। ও দুটি খাস মনসার চর। ওঁদের গায়ে আঘাত করলে ভিটেমাটি উচ্ছন্ন যাবে। বংশে বাতি দেবার কেউ থাকবে না।

বলাইয়ের সঙ্গে আমিও উঁকি দিয়েছিলাম। দেখলাম, জালার পাশে দুটি সাপই ফণা তুলে রয়েছে। প্রসারিত ফণার ওপর গোরুর খুরের চিহ্ন। বোধহয় আমাদের কথাবার্তায় একটু বিচলিত হয়েছে।

বলাই চলে গেল। আমিও পুকুরে নামলাম স্নান করতে।

স্নান সেরে যখন ফিরছি, আবার ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল। মাঠ দিয়ে ফিরছে। হাতে বন্দুক। আসাননগরে বন্দুক আছে দুজনের। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সৌরীন গাঙ্গুলীর আর ডাক্তার অমল রায়ের। তাঁদের কারো কাছ থেকে বোধহয় চেয়ে এনেছে।

আমি আর কোন কথা না বলে ওপরে চলে এলাম। বুঝতে পারলাম ভদ্রলোকের মতিচ্ছন্ন হয়েছে। ভাল কথা কানেই তুলবে না। তবে মনের মধ্যে একটা আশা ছিল, বাস্তুসাপদের কেউ অনিষ্ট করতে পারবে না। মা মনসা তাঁর বাহনদের রক্ষা করবেন।

NOT FOR SALE

সকাল কেটে দুপুর গড়িয়ে বিকাল। বন্দুকের শব্দ পেলাম না। মনে মনে আশ্বস্ত হলাম। যাক, সর্বনাশ ঘটেনি। কাল সকালেই ভদ্রলোককে বলব স্ত্রীকে নিয়ে ওপরে চলে আসতে। আমি নিচের তলায় চলে যাব।

সন্ধ্যা হবার একটু আগে বসে বসে একটা কাঁথা সেলাই করছিলাম, হঠাৎ গুড়ুম করে শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের উৎকট চীৎকার।

ছুটে নেমে এলাম। ঘরের দরজা খোলাই ছিল। তখনও বেশ আলো। দেখতে কোন অসুবিধা হল না।

একটা সাপ মাঝখানে পড়ে ছটফট করছে। ঠিক প্রসারিত ফণার নিচে গুলি লেগেছে। মেঝের চারপাশে রক্তেরে ছিটে। আর একটা সাপকে দেখতে পেলাম না, কিন্তু জালার মধ্যে থেকে নিষ্ফল আক্রোশের একটানা শব্দ কানে এল। ফোঁস ফোঁস করে তীব্র একটা আওয়াজ। কিছুক্ষণ ছটফট করে সাপটা নিস্তেজ হয়ে পড়ল। দেখলাম, তার মুখের কাছে একবাটি দুধ রয়েছে। বুঝতে পারলাম, দুধের লোভ দেখিয়ে সাপটাকে বাইরে আনা হয়েছিল। বলা যায় না, হয়তো দুটো সাপই বাইরে এসেছিল, একটার ওই অবস্থা দেখে অন্যটা জালার মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে।

কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে ওপরে চলে এলাম। সারাটা রাত ঘুম এল না। বিছানায় এপাশ ওপাশ করলাম। অনেক দিনের বাস্তুসাপ। আমাদের বাস্তু-ভিটার মঙ্গলের প্রতীক বলেই মনে করতাম। কি জানি, এবার কি সর্বনাশ হবে!

পরের দিন সকালে উঠে শুনলাম সাপটাকে পোড়ানো হয়ে গেছে। তাই অবশ্য বিধি। যারা সাপ চেনে তারা বলল, সাপিনীটা মারা পড়েছে বন্দুকের গুলিতে।

ভদ্রলোককে সাত দিনের মধ্যে বাড়ি ছাড়তে বলে দিয়েছিলাম। ভদ্রলোক বাড়ি একটা ঠিকও করেছিল।

যদিও আর সাপের উপদ্রব ছিল না, কারণ বাকি সাপটাকে আর ধারে কাছে দেখা যায়নি, তবুও ভদ্রলোক এ বাড়িতে আর থাকতে রাজী ছিল না। আমিও তাকে থাকতে দিতে চাইনি।

ব্যাপারটা ঘটল ঠিক দুদিন পরে। সকালবেলা সবে ঠাকুরঘরে ঢুকছি, এমন সময় নারীকণ্ঠের আর্ত চীৎকার কানে এল। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলাম। সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্যন্ত আর নামতে হল না। মাঝ বরাবর নামতেই জানলা দিয়ে সবকিছু চোখে পড়ল।

বৌটি বঁটি পেতে কুটনো কাটতে বসেছিল, রোজকার মতন। ভদ্রলোক বাইরের রোয়াকে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। বৌটির চীৎকারে মুখ ফিরাতেই আতঙ্কে শিউরে উঠল।

রাজগোখরো বৌটির শরীর শক্ত পাকে জড়িয়ে ধরেছে, একেবারে মোক্ষম বাঁধনে, তারপর মুখে, চোখে, গালে ছোবলের পর ছোবল দিয়ে চলেছে।

NOT FOR SALE

ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে ঢুকে বন্দুকটি হাতে তুলে নিল। বুঝতে পারলাম, সে ঘটনার পর বন্দুকটা তখনও ফেরত দেয়নি।

কিন্তু বন্দুক হাতে করে অসহায়ের মতন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রইল। নিজের স্ত্রীকে আহত না করে সাপটাকে গুলি করা প্রায় অসম্ভব।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল। মরণ-ছোবল দিয়ে রাজগোখরো বিদ্যুৎগতিতে নালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

বিষে নীল দেহ বৌটি মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। সেই সময় ভদ্রলোক পরপর দুটি গুলি ছুঁড়েছিল, কিন্তু সে দুটি গুলি শুধু দেওয়ালের চুন বালি খসানো ছাড়া সাপটাকে স্পর্শও করতে পারেনি।

তারপর ওঝা এল, ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র অনেক কিছু চলল, কিন্তু কিছু হল না। বৌটিকে বাঁচানো গেল না। নিজের সঙ্গিনীকে হত্যা করার এরকম চরম প্রতিশোধ রাজগোখরো যে নেবে হত্যাকারীর জীবনসঙ্গিনীকে নিঃশেষ করে তা কল্পনাও করতে পারিনি। অন্য কেউ বললে হয়তো বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু আগেই তো বলেছি, আমার নিজের চোখে দেখা ঘটনা। আরও আশ্চর্যের কথা, এই ঘটনার পর রাজগোখরোটাকে আর এ তল্লাটে দেখা যায় নি।

বেলাদির পাশেই রেণুর মেয়ে মিলি বসেছিল। বিজ্ঞানের ছাত্রী।

সে বলল, প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা ও সব কিছু নয়। সাপটা যাকে সামনে পেয়েছে তাকেই ছোবল দিয়েছে। ভদ্রলোক সামনে থাকলে তিনিও শেষ হয়ে যেতেন, তুমি যদি থাকতে পিসি, তোমারও তাই হত।

বেলাদির বোন খুকু, তার মেয়ে সীমা, মনোবিজ্ঞান পড়ে। সে বলল, উহুঁ, তা নয়, সাপেদেরও মন আছে, কাজেই প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিও আছে। অনেক ঘটনা জানি। যেখানে সাপ দু'মাইল গিয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য কোন লোককে ছোবল মেরেছে।

সাপেদের মন! মিলি ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল।

আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই, সে মন আমাদের মতো এত উন্নত ধরনের, এত জটিল না হতে পারে, কিন্তু তাদের যে মন আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সীমা দাঁড়িয়ে উঠল গাছ-কোমর বেঁধে।

এতক্ষণ পর আমি বললাম, বেশ ভাল লাগল আপনার কাহিনী। আরও দু'একটা এরকম ঘটনা বলুন।

বেলাদি বললেন, আজ আর নয়, আর একদিন বলব। এখন আগে দুই সাপিনীকে ছাড়াই, দাঁড়ান।

মিলি আর সীমা দুজনেই ফণা তুলেছে। পরস্পর ছোবল দেবার আগেই বেলাদি তাদের আলাদা করে দিলেন। পিঠে হাত বুলিয়ে।

—সমাপ্ত—

NOT FOR SALE

অমানুষিক

যাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়া অভ্যাস তারা নিশ্চয় ঘটনা পড়েছো। আজ থেকে প্রায় বছর দশেক আগের কথা। হত্যা কাহিনীটা ফলাও করে সংবাদপত্র ছাপিয়েছিল, কিন্তু হৈমন্তী ঘোষালের কৃতিত্বটার কথায় বিশেষ জোর দেয়নি।

সমস্ত ঘটনাটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমার জানা, কারণ সেই সময়ে হৈমন্তী ঘোষালের সহকারী হিসাবে আমি কাজ করেছিলাম।

এদেশে হৈমন্তীর আগে নারী গোয়েন্দা কেউ ছিল বলে জানি না, পরে আর কেউ হয়েছে কিনা তাও বলতে পারব না। এম. এস.সি. পাশ করে ফোরেনসিক মেডিসিন নিয়ে পড়াশুনা করছি এক অভিজ্ঞ বিজ্ঞানের অধ্যাপকের কাছে, হঠাৎ হৈমন্তীর চোখে পড়ে গেলাম।

কি একটা ব্যাপারে হৈমন্তী অধ্যাপকের কাছে আনাগোনা করছিল, সেই সূত্রেই আলাপ হয়ে গেল। হৈমন্তী আমাকে সোজাসুজি আহ্বান জানালে, তার সহকারী হিসাবে কাজ করবার জন্য।

হৈমন্তী ঘোষাল যে শখের গোয়েন্দা সে পরিচয় তখনই পেলাম।

যাক্, আসল ঘটনাটা বলি, শোন।

রায়বাহাদুর তেজেশ সরকার। অভ্র ব্যবসার একচ্ছত্র মালিক। থাকেন গিরিডিতে। বিপত্নীক। একটি ছেলে পড়ার ব্যাপারে গ্লাসগোয়, একমাত্র মেয়ে শ্বশুরবাড়ি মীরাটে।

তেজেশ সরকার থাকতেন ভৃত্যদের হেফাজতে। বিশেষ করে বৃদ্ধ ভৃত্য রামকমলই দেখাশোনা করত। খুব পুরনো লোক। ছেলেবেলায় তেজেশবাবুর খেলার সাথী ছিল।

এক শনিবারের ভোরে, বিছানায় শুয়ে আধ-ঘুম আধ-জাগরণের অবস্থা, ফোন বেজে উঠল।

কে, নিরুপম? আমি হৈমন্তী। এখনই চলে এস।

কি ব্যাপার? বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

আজই আমরা গিরিডি রওনা হব। তুমি তৈরি হয়ে এস।

তখনও সকালের কাগজটা পড়া হয়নি। তাড়াতাড়ি গোছগাছ করে রওনা হয়ে পড়লাম।

NOT FOR SALE

হৈমন্তীও তৈরি হয়ে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিল।

আবার উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করলাম, কি হল কি?

ট্রেনে বলব, হৈমন্তীর সংক্ষিপ্ত উত্তর।

ট্রেনে উঠে হৈমন্তী হাতের কাগজটা আমার সামনে প্রসারিত করে দিল। বড় বড় অক্ষরে লেখা। রায়বাহাদুর তেজেশচন্দ্র সরকার নিহত। তারপর ছোট ছোট অক্ষরে বিবরণ ঃ কে বা কাহারা রায়বাহাদুরকে হত্যা করিয়া গিয়াছে। প্রতি রাতের মতন এক কাপ দুধ পান করিয়া শয়ন করেন, পরদিন অনেক দরজা ঠেলাঠেলির পর তাঁহার ঘুম না ভাঙাইতে পারিয়া বৃদ্ধ ভৃত্য লোক ডাকিয়া দরজা ভাঙিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রভুকে মৃত অবস্থায় দেখিতে পায়। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা, সমস্ত জানলা ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ ছিল। কাজেই দুর্বত্তরা কিভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহা কিছুই জানা যাইতেছে না। লাশ ময়না তদন্তের জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

তারপর তেজেশবাবুর জনহিতকর কার্যের তালিকা, তাঁহার বিশাল হৃদয়ের পরিচয় প্রভৃতির ফিরিস্তি।

তোমার কি মনে হয় নিরুপম?

আত্মহত্যা নয় তো?

সেরকম কোন স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়নি। তাছাড়া এই ঊনসত্তর বছর বয়সে লোকে চট করে আত্মহত্যা করে না।

তবে আপনার কি মনে হয়?

হৈমন্তী হাসল, আমার কিছুই মনে হয় না। সরেজমিনে তদারক না করলে কিছুই বলতে পারব না। আমি ফোনে পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আমাদের সব রকম সুযোগ দেবেন। দেখা যাক।

হোটেলে জিনিসপত্র রেখেই দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। তেজেশবাবুর দরজায় পুলিশ মোতায়েন ছিল। আমাদের দেখে সেলাম করে পথ ছেড়ে দিল। সম্ভবত পুলিশ সুপার আমাদের কথা তাকে বলে থাকবেন।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। তেজেশবাবুর শয়নকক্ষ। দুতলায়। এক কোণে আধুনিক ডিজাইনের একটা খাট। মাথার কাছে টিপয়ের ওপর টেলিফোন। পাশে একটা ছোট টেবিল। নিচের তাকে কতকগুলো বই। ওপরে সম্ভবত দুধের কাপ রাখা ছিল। ঘরে আর কোন আসবাব নেই। দেয়ালে মাত্র একটি ছবি। বুদ্ধের। তিব্বতী ঢংয়ে আঁকা। সেই ছবির সামনে মেঝের ওপর একটা কার্পেটের আসন পাতা।

রামকমলকে ডেকে পাঠানো হল। চোখ মুছতে মুছতে বেচারী এসে হাজির।

রাত্রে তেজেশবাবু দুধ ছাড়া কিছু খান না। শুধু এক কাপ ঠাণ্ডা দুধ। খুব

NOT FOR SALE

ঠাণ্ডা। প্রত্যেক রাতেই দুধ চাপা দিয়ে রামকমল চলে যায়। দুধ ঠাণ্ডা হলে তেজেশবাবু পান করেন।

এখানে আসন কেন? হৈমন্তী প্রশ্ন করল।

বাবু প্রত্যেক দিন বসে জপ করেন। প্রায় দু ঘণ্টা ধরে।

এ ছবিটা কোথা থেকে এল?

অনেক আগে বাবু গ্যাংটক থেকে কিনে এনেছিলেন।

হৈমন্তী আর কিছু বলল না। ঘুরে ঘুরে সমস্ত জানলা দরজা মেঝে তন্নতন্ন করে দেখতে লাগল। কোথাও কোন চিহ্ন নেই। হাতের অথবা পায়ের।

এমনও তো হতে পারে, কেউ আগে থেকে খাটের তলায় লুকিয়েছিল। দরজার গোড়ায় দাঁড়ানো পুলিশটা আলোকপাত করার চেষ্টা করল।

হৈমন্তী হাসল, কাজ শেষ করে লোকটা তাহলে পালাল কোথা দিয়ে? দরজা ভেঙে এ ঘরে ঢুকতে হয়েছিল, শুনলাম। দরজাটা এখনও ভাঙাই রয়েছে।

অপ্রস্তুত পুলিশটি সরে গেল সেখান থেকে।

একটু পরেই অনেকগুলো বুটের শব্দ শোনা গেল। দারোগা আর এক সহকর্মী এসে হাজির হল।

এই যে হৈমন্তী দেবী, কিছু পেলেন খুঁজে?

হৈমন্তী কোন উত্তর দিল না। একটা আতস কাঁচ হাতে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে কি দেখতে লাগল।

দারোগা বলতে লাগল, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এসেছে, পটাসিয়াম সায়ানাইডে মৃত্যু। দুধে মেশানো ছিল। বুঝতেই পারছেন এ রামকমলের কীর্তি। তাকে গ্রেপ্তার করার অর্ডার দিয়েছি।

এবারেও হৈমন্তী কিছু বলল না। এদিক ওদিক চেয়ে একবার দেখল। রামকমল নেই। পুলিশ কখন তাকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে অ্যারেস্ট করেছে।

আর কি দেখবেন? দারোগা তাড়া দিল।

হৈমন্তী কয়েক পা পিছিয়ে এসে একটা ভেন্টিলেটারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওটা ছিল?

দারোগা টিটকিরি দিয়ে হেসে উঠল।

একেই বলে স্ত্রী-বুদ্ধি। ও ভেণ্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে বড়জোর একটা বেড়াল-বাচ্চা গলে আসতে পারে। মানুষের কথা বাদ দিন।

আমাকে একটা কাঠের মই যোগাড় করে দিতে পারেন? হৈমন্তী দারোগার কথায় কর্ণপাত না করে বলল।

NOT FOR SALE

কি করবেন? ভেণ্টিলেটার দিয়ে দিয়ে ঢোকা যায় কিনা পরখ করে দেখবেন? দারোগার হাসি আকর্ণ বিস্তৃত।

হৈমন্তী দৃঢ়কণ্ঠে আমার দিকে চেয়ে বলল, দেখ তো নিরুপম, কাঠের একটা মই যোগাড় করতে পার কিনা?

আমাকে আর যেতে হল না। বাইরে থেকে একটা পুলিশই মই নিয়ে এল। কিছুদিন আগে বাড়িতে রং দেওয়া হয়েছিল, মিস্ত্রীদের মই বাইরে পড়েছিল।

মই আনতেই হৈমন্তী তরতর করে মই বেয়ে উঠে পড়ল। ভেণ্টিলেটারের কাছে ঝুঁকে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে কি দেখল, তারপর সাবধানে নেমে এল।

কি, পেলেন কিছু খুঁজে? দারোগা জিজ্ঞাসা করল।

না, মিস্টার রয়, নতুন কিছু পেলাম না, হৈমন্তী ঘাড় নাড়ল; রামকমলই বোধহয় অপরাধী।

হোটেলে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে হৈমন্তী আবার বের হল। সঙ্গে যথারীতি আমি।

এবার লক্ষ্য তেজেশবাবুর অভ্রের কারখানা।

কারখানা বন্ধ ছিল। আমরা ম্যানেজারের কামরায় ঢুকলাম। সেই দুর্ঘটনার দিন সকাল থেকে তেজেশবাবুর সঙ্গে কারা দেখা করেছিল, তার একটা তালিকা যোগাড় হল। বেশির ভাগ লোকই অফিসের। কাগজপত্র সই করাতে এসেছিল। ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে তেজেশবাবুর সঙ্গে কারুর মনোমালিন্য আছে, এমন খবর পাওয়া গেল না।

আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। হৈমন্তী খুব চিন্তিত। সারা পথ আমার সঙ্গে একটি কথাও বলল না।

চল, একবার স্টেশনের এলাকাটা ঘুরে আসি।

হৈমন্তীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বিস্মিত হওয়া ছেড়ে দিয়েছি। কোন উত্তর না দিয়ে তার অনুসরণ করলাম।

স্টেশন ফাঁকা। এখন বোধহয় আর ডাউন কোন ট্রেনেরই আসার সম্ভাবনা নেই।

হৈমন্তী সোজা স্টেশনমাস্টারের ঘরে ঢুকে গেল। আমি পিছন পিছন।

স্টেশনমাস্টার টেবিলের উপর দুটি পা তুলে দিয়ে দিবানিদ্রার আয়োজন করছিল, হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটি তরুণীকে দেখে বিব্রত হয়ে পা নামিয়ে নিল।

নমস্কার, হৈমন্তী সামনের টুলটা টেনে নিয়ে বসল।

কি বলুন? স্টেশনমাস্টার গলাটা প্রসারিত করল।

আচ্ছা, এখানে দেখার কি আছে বলুন তো? আপনি এখানে কতদিন আছেন?

NOT FOR SALE

হৈমন্তীর কণ্ঠে কিশোরীর চাপল্য।

তা বছর পাঁচেক হয়ে গেল। এখানে তো লোকে উশ্রী জলপ্রপাত দেখতেই আসে। দেখেছেন সেটা?

কবে! হৈমন্তী ঠোঁট ওলটাল, তারপর একটু থেমে বলল, আচ্ছা, সেদিন পথের ধারে চমৎকার মেটে রংয়ের খরগোশ দেখলাম। কাউকে বললে খরগোশ ধরে দেয় না?

তা দেবে না কেন! সাঁওতালদের বলুন না, তারা ফাঁদ পেতে ধরে দেবে।

আর পাখি, পাখি কেউ বিক্রি করে না? আমি অনেকগুলো কিনতে চাই।

পাখি! ঠোঁট কামড়ে স্টেশনমাস্টার ভাবতে শুরু করল, তারপর হঠাৎ মনে পড়েছে এইভাবে বলল, আরে ভাল কথা, আপনি রূপচাঁদের দোকানে সোজা চলে যান না। পাখি, জানোয়ার যা দরকার তাই পাবেন।

রূপচাঁদের দোকান! হৈমন্তী উত্তেজনা দমন করে বলল, ঠিকানাটা দয়া করে বলে দেবেন?

ঠিকানা আর কি। সোজা রাস্তাটা ধরে চলে যান। ছোট্ট টিলা দেখেছেন একটা, ওরই কোলে একটা সাইনবোর্ড দেখবেন। রূপচাঁদ এণ্ড কোং। কিন্তু খুব সাবধান, বেটা একেবারে গলাকাটা। যা দাম বলবে ঠিক তার অর্ধেক বলবেন, বুঝলেন?

হৈমন্তী বুঝল।

দুজনে বেরিয়ে এসে প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়ালাম।

হৈমন্তীই বলল, নিরুপম, চল আগে এক কাপ চা খেয়ে নিই, তারপর রূপচাঁদ কোম্পানীতে যাব।

একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, কোথায় এসেছেন খুনের কিনারা করতে, আর তা না করে কোথায় রং-বেরং-এর পাখি পাওয়া যায়, তারই খোঁজে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন!

হৈমন্তী মুখ টিপে হাসল। বলল, আমাকে বিশ্বাস করতে শেখো নিরুপম। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।

আর কোন কথা বললাম না। হাঁটতে হাঁটতে রূপচাঁদের দোকানে গিয়ে পৌঁছলাম।

একতলা বাড়ি। পিছন দিকে বাগানের মধ্যে বিরাট টিনের চালা। তারই নিচে অজস্র খাঁচায় পাখি আর জন্তুর মেলা। পথে আসতে আসতেই পাখির কাকলি কানে আসছিল।

রূপচাঁদের দেখা মিলল। খর্বকায় কৃশতনু। মনে হয় মানুষটা যেন অনেক ঝড়ঝাপটা পার হয়ে এসেছে।

হৈমন্তী এগিয়ে গেল।

NOT FOR SALE

কলকাতা থেকে আসছি। পাখির খুব শখ। প্রতি সপ্তাহে নিউ মার্কেট ঘুরে ঘুরে পাখি কিনি। আপনার কাছে নতুন রকমের কিছু পাখি আছে?

_রূপচাঁদ অপাঙ্গে আমাদের দুজনের আপাদমস্তক একবার জরিপ করল। তারপর বলল আসুন।

খরগোশ, গিনিপিগ আর হরেক রকমের পাখি।

হৈমন্তী এধার থেকে ওধার দ্রুত চোখ বোলাতে লাগল। মনে হল সে যা আশা করছিল, তা যেন পায়নি। চোখের দৃষ্টিতে হতাশার আভা।

আমিই বললাম, এসব কাদের বিক্রী করেন?

দেশবিদেশ থেকে অর্ডার আসে। অনেক জায়গার চিড়িয়াখানাতেও চায়। তাছাড়া অনেক বিজ্ঞানের কলেজে গিনিপিগ, খরগোশ ওসবও দিতে হয়।

হৈমন্তী আরো এগিয়ে গেল। খাঁচার সারের মাঝখানের সরু পথ দিয়ে একেবারে কোণের দিকে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরাও তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

একটা বড় খাঁচায় একটা ছোট আকারের বানর। খাঁচার মাঝখানের রডটা ধরে ডিগবাজী খাচ্ছে।

বাঃ, ভারি চমৎকার তো! এটার দাম কত?

হৈমন্তী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

রূপচাঁদ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, না, ওটা বিক্রী করতে পারব না। ওটা একটা সার্কাস কোম্পানীকে দেবার কথা হয়ে গেছে। তারা অগ্রিম টাকাও পাঠিয়ে দিয়েছে। সেই জন্যই ওটাকে কিছু খেলা শিখিয়েছি।

হৈমন্তী একবার রূপচাঁদের দিকে চেয়ে দেখল, তারপর সরে এল খাঁচার কাছ থেকে।

একটা বাচ্চা হরিণ দর করে আগাম কিছু টাকা রূপচাঁদকে দিয়ে এল। বলে এল, পরের দিন সকালে লোক পাঠিয়ে হরিণটা নিয়ে যাবে।

রূপচাঁদ প্রাপ্তির একটা রসিদ লিখে দিল। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত হৈমন্তী খুব ব্যস্ত হয়ে রইল।

আমি হোটেলে শুয়ে রইলাম একটা মাসিক পত্রিকা নিয়ে। হৈমন্তীর সঙ্গে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে বারণ করল।

হেসে বলল, এখন নয়, পরে। এখন সঙ্গে থাকলে সাসপেন্সটা নষ্ট হয়ে যাবে। নিরুপায়। নারী-চরিত্রের হদিস দেবতারাও পাননা, তাও আবার নারী গোয়েন্দা চরিত্র!

রাত কাটল। পরের দিন সকালে হৈমন্তীকে হরিণটা আনার কথা মনে করিয়ে দলাম।

হৈমন্তী হেসে বলল, আনব কার কাছ থেকে? রূপচাঁদবাবু হাজতে।

NOT FOR SALE

চমকে উঠলাম, সেকি!

ধীরে রজনী, ধীরে। সময়ে সবই জানতে পারবে।

হৈমন্তী বেরিয়ে গেল, আমাকে সঙ্গে না নিয়েই।

সমস্ত দিন হৈমন্তী বাইরেই রইল। হোটেলে ফিরল না। আমি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে খাওয়া-দাওয়া সেরে শয্যায় গা এলিয়ে দিলাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না, ঘুম ভাঙল হৈমন্তীর চীৎকারে। ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

কি ব্যাপার?

চল সার্কাস দেখে আসি।

আমি হতভম্ব। বিছানা থেকে নামতে নামতে বললাম, কি ব্যাপার আপনার বলুন তো? খুনের কিনারা করতে এসেছেন, না ফুর্তি করতে এসেছেন? আসামী ধরা চুলোয় গেল, কেবল কোথায় হরিণ বিক্রী হচ্ছে, কোথায় সার্কাস হচ্ছে এই করে বেড়াচ্ছেন! হৈমন্তী হাসল।

শখের গোয়েন্দা হবার ওই এক মস্ত সুবিধা নিরুপম, কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। আসামী না ধরতে পারলে চাকরি যাবার ভয় নেই। নাও, যাবে তো চল।

অগত্যা উঠতে হল।

বাইরে একটা টাঙ্গা অপেক্ষা করছিল। তাতে উঠে বসলাম।

টাঙ্গা যে বাড়ির সামনে থামল, উঁকি দিয়ে দেখেই আমি অবাক। একি, এ যে রায়বাহাদুরের বাড়ি!

সার্কাসের তাঁবু এখানেই পড়েছে। আর একটি কথাও নয় নিরুপম। চুপচাপ বাড়ির পিছন দিকে চলে এস।

আস্তে আস্তে পা ফেলে বাড়ির পিছন দিকে গেলাম, তারপর খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকে বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম। সিঁড়ি দিয়ে একবারে দুতলায়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বাইরে কোথাও বাতি নেই। হৈমন্তী টর্চের আলোয় পথ দেখিয়ে চলল।

কিছুটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। টর্চের আলোতে দেখলাম, দারোগাবাবু আর তার একজন সহকর্মী দাঁড়িয়ে। দারোগাবাবু নিজের ঠোঁটে আঙুল দিয়ে কথা বলতে নিষেধ করল। নিঃশব্দ পায়ে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। দরজায় সার সার তিনটে ছিদ্র। হৈমন্তীর নির্দেশে এক একজন এক একটি ছিদ্রে চোখ রাখলাম।

রায়বাহাদুর তেজেশ সরকারের শয়নকক্ষ। অনুজ্জ্বল আলো, কিন্তু দেখতে কোন অসুবিধা হল না।

NOT FOR SALE

শয্যা প্রস্তুত। এদিকে টেবিলের ওপর ডিশ ঢাকা কাপ। অন্যদিকে আসনের ওপর ছবির দিকে মুখ করে কে একজন উপবিষ্ট। এ কোণ থেকে তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না।

বুঝতে পারলাম। ঠিক হত্যার রাতের দৃশ্য সাজানো হয়েছে। আসামীকে ধরার জন্য এ পদ্ধতিও অন্য দেশে একাধিকবার অনুসৃত হয়েছে।

এও বোধহয় তাই।

খুট করে একটা শব্দ হতেই চমকে উঠলাম, তারপর উত্তেজনায়, বিস্ময়ে যেন বাক্‌রোধ হয়ে গেল।

দেয়ালের পাইপ বেয়ে তরতর করে বানরের একটা বাচ্চা নেমে এল। আস্তে আস্তে এসে ডিশটা তুলে কাপে কি একটা ফেলে দিয়ে আবার পাইপ বেয়ে নক্ষত্র গতিতে ভেন্টিলেটারের মধ্যে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আশ্চর্য! কপালের ঘাম মুছতে মুছতে দারোগাবাবু প্রথম কথা বলল।

ভিতরের দরজা খুলে হৈমন্তী বাইরে এল। পিছন পিছন আসন থেকে উঠে একটি পুলিশ কর্মচারীও বাইরে এসে দাঁড়াল।

দারোগাবাবুর দিকে চেয়ে হৈমন্তী বলল, কি স্যার, বিশ্বাস হল?

দারোগাবাবু হাত জোড় করে বলল, ছিঃ ছিঃ, আর লজ্জা দেবেন না। এবার অবশ্য বিষ নয়, অ্যানাসিনের বড়ি বানরটির হাতে দিয়েছিলাম। একটি স্টিমুলাস, কাজেই তার রেসপন্স একই হয়েছিল।

কিন্তু রূপচাঁদকে এর সঙ্গে জড়ালেন কি করে?

রূপচাঁদের সই করা স্বীকারোক্তি আমার কাছে আছে। যাবার আগে আপনাকে দিয়ে যাব। আপনি অনুগ্রহ করে বৃদ্ধ রামকমলকে আজই ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। বেচারা বড় কান্নাকাটি করছে।

দারোগাবাবু মাথা নিচু করেই ঘাড় নাড়ল।

আসল কথা হল ফেরার সময়। ট্রেনে। তাহলে সার্কাসটা তোমার খারাপ লাগেনি তো নিরুপম?

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে হৈমন্তী জিজ্ঞাসা করল।

না, তা লাগেনি, কিন্তু গোড়া থেকে আমাকে একটু খুলে বলুন।

হৈমন্তী চায়ের কাপটা সরিয়ে রেখে বলতে আরম্ভ করল। প্রথমেই দুটো জিনিস আমার মনে হয়েছিল। এক, যে-ই রায়বাহাদুরকে হত্যা করে থাকুক, টাকাপয়সার জন্য যে করেনি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, কোন টাকাপয়সা চুরি যায়নি, যদিও বালিশের তলায় তাঁর মানিব্যাগ, আলমারির চাবি থাকত। রায়বাহাদুরের মৃত্যুতে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি অন্য কেউ পাবে, এমন সম্ভাবনাও ছিল না, কারণ তিনি নিঃসন্তান নন। তাঁর উইলে তাঁর পুত্র, কন্যার জন্য যথারীতি সংস্থান করা হয়েছে।

NOT FOR SALE

দুই, যেভাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, তাতে বোঝা যায় কোন মানুষের পক্ষে বন্ধ ঘরে বাইরে থেকে ঢোকা সম্ভব নয়। তোমার মনে থাকতে পারে, মই আনিয়ে আমি ভেন্টিলেটারের চারপাশ দেখেছিলাম।

আমি ঘাড় নাড়লাম।

একটা হাতের বা পায়ের দাগ ছিল। মানুষের নয়। জন্তুর। আমার প্রথম ধারণা হয়েছিল, কুকুরের। কেউ যেন ভেন্টিলেটার দিয়ে ঢুকেই নতুন দেওয়া রংয়ে পা পিছলে গিয়েছিল। সেই পায়ের ছাপ আমি মনে মনে তুলে নিই, তারপর হোটেলে ফিরে জন্তু-জানোয়ারদের হাত-পায়ের ছাপের যে বই আমার আছে, তা দেখে বুঝতে পারি ছাপটা কুকুরের পায়ের নয়, বানরের। বুঝতে পারলাম, বানরটি যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিত। তারপর কি করে রূপচাঁদের সন্ধান পাই তা তোমার অজানা নয়। সেখানে বানরের নখে তখনও রং লেগেছিল।

হৈমন্তী একটু থামল। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে আবার বলতে লাগল।

রূপচাঁদকে নিয়েই আমাকে একটু বেগ পেতে হয়েছিল। কিছুটা মিথ্যার আশ্রয়ও নিতে হয়েছে।

মিথ্যার আশ্রয়?

তাই বই কি। সোজাসুজি রূপচাঁদকে বললাম, ছিঃ, রূপচাঁদ, সবই বেশ কায়দামাফিক করে এসেছিলে, কিন্তু বিষটা আর একটু জোরাল দিতে হয়। দুধটা খাওয়ার পরও রায়বাহাদুর একটা কাগজ টেনে নিয়ে তোমার নামটা লেখবার যথেষ্ট সময় পেলেন কি করে? মানুষের মত কাজ কি আর বানরে পারে? তাকে যতই ট্রেনিং দাও?

রূপচাঁদ দুটো ঠোঁট টিপে রইল।

আমি বলতে লাগলাম। তোমার অনুতপ্ত হওয়া উচিত রূপচাঁদ। একজন নিরীহ, ধার্মিক ভদ্রলোককে তুমি এভাবে শেষ করলে! অমায়িক, দেশপূজ্য লোক জীবনে কখনও কোন অন্যায় করেননি—

আঃ, থামুন আপনি। জীবনে কখনও কোন অন্যায় করেনি! মহাধার্মিক লোক! আমার সর্বনাশ কে করেছে? কে আমাকে আহত করে যথাসর্বস্ব—

রূপচাঁদ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

তারপরের কথাগুলো জানতে আর অসুবিধা হয়নি নিরুপম। অনেক বছর আগে দুই বন্ধু তেজেশ আর রূপচাঁদ, তখন তার নাম ছিল সুবিনয়, গ্যাংটক বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে গুম্ফার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রার সন্ধান তাঁরা পেয়েছিলেন। দুজনে সে স্বর্ণমুদ্রা সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন। তারপর একটা পান্থনিবাসে পাশাপাশি দুজনে যখন শুয়ে, তখন তেজেশের মনে লোভের সাপটা ফণা মেলে দাঁড়িয়ে উঠেছিল।

NOT FOR SALE

অর্ধেকের থেকে সম্পূর্ণটা যে অনেক বেশি এমন একটা চিন্তা বারবার তাঁর মস্তিষ্ককোষ আলোড়িত করেছিল।

তাই রাতের অন্ধকারে আস্তে আস্তে উঠে লোহা বাঁধানো বাঁশের লাঠিটা দিয়ে সুবিনয়ের মাথায় সবেগে আঘাত করে তার বুকের মধ্যে লুকানো স্বর্ণমুদ্রাগুলো নিয়ে সেই রাতেই তেজেশ দার্জিলিং চলে এসেছিলেন। তার পরের দিন কলকাতা। সেখান থেকে পশ্চিমের নানা দেশ।

তারপর কোথাও কোন আলোড়ন না দেখে গিরিডিতে এসে অভ্রের ব্যবসা শুরু করেছিলেন। তেজেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন যে কোন ভয় নেই। মৃত ব্যক্তি তার অংশ চাইতে আসে না। তাছাড়া এ অর্থের মালিকানা প্রমাণ করাও সহজসাধ্য নয়।

কিন্তু বছর দুয়েক আগে বেড়াতে বেড়াতে রূপচাঁদের মুখোমুখী হয়েছিলেন। তেজেশবাবু চিনতে পারেননি, কিন্তু রূপচাঁদ পেরেছিল। রূপচাঁদ সত্যিই যে লোকটাকে চিনতে পেরেছিল, তাঁকে নিশ্চিহ্ন করে তার প্রমাণও সে দিয়েছে।

—সমাপ্ত—

NOT FOR SALE

মূর্তির কবলে

একেবারে আচমকা। তাও অন্য কোন বড় শহর হলে এক কথা। আপসোস করার বিশেষ কিছু থাকত না। কিন্তু বদলি করল কলিকাতা থেকে এলোর। অন্ধ্রপ্রদেশে। ইংরাজ আমলে ওই নাম ছিল, এখন স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে নাম হয়েছে এলুরু।

একটা আশার কথা, বিয়ে-থা করিনি। বৌ-ছেলেপুলের বালাই নেই। ঝাড়া হাত-পা। কাজেই তল্পিতল্পা বেঁধে ট্রেনে উঠলাম।

স্টেশনে রামকৃষ্ণ রাও ছিলেন। এঁর জায়গায় আমি যাচ্ছি। ইনি বদলি হচ্ছেন কোয়েম্বাটুর।

এঁকে থাকবার একটা আস্তানার সন্ধান করতে বলেছিলাম। বিদেশ-বিভুঁই, কিছুই জানা নেই। অন্তত মাথা গোঁজবার একটা জায়গা থাকা দরকার।

করমর্দন, পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসার পর প্রশ্ন করেছিলাম, আমার থাকার কি ব্যবস্থা হবে?

রামকৃষ্ণ প্রশান্ত হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি যেখানে ছিলাম, সেখানেই আপনি থাকতে পারবেন। বাড়িওয়ালা খুব সদাশয়, বাড়িটাও যথেষ্ট খোলামেলা।

যেতে যেতে রামকৃষ্ণ বললেন, এখানে একলাই থাকতাম। বদলির চাকরির জন্য স্ত্রী-পুত্রকে মামার বাড়ি মাদ্রাজে রেখে দিয়েছি।

তারপর হঠাৎ থেমে রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার নিজের রান্না করার অভ্যাস আছে?

বিশেষ নেই, তবে কলিকাতায় ঝি না এলে মাঝে মাঝে নিজেকেই চালিয়ে নিতে হত।

ওই এক মুস্কিল। এখানকার রান্না খেতে আপনাদের, মানে বাঙালিদের অসুবিধা হবে। সবই নারিকেল তেলে রান্না কিনা?

আর কিছু বললাম না। অদৃষ্টে দুর্ভোগ আছে জানি। বাড়িটা বেশ পছন্দসই। চারপাশে একটু বাগান আছে। নারিকেল আর কিছু আমগাছ।

রান্না করার লোক একটা জুটে গেল। শঙ্করণ।

সে শুধু ভাত রেঁধে দিয়ে যাবে। মাছ, মাংস, ডিম ছোঁবে না। ওগুলো আমাকেই করে নিতে হত।

NOT FOR SALE

রামকৃষ্ণ যাবার সময় একটি জিনিস দিয়ে গেলেন। টেরাকোটার মূর্তি। লাল রঙের। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম নটরাজের মূর্তি। কিন্তু ভাল করে দেখলাম না, নটরাজ নয়, সেই ধরনের ভঙ্গী। মুখ-চোখের চেহারা বীভৎস। চারিদিকে আগুনের লেলিহান শিখা।

রামকৃষ্ণ বললেন, কি মূর্তি জানি না। হরিদ্বারে এক সাধুর কাছ থেকে পেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, কালভৈরবীর মূর্তি। রোজ শুতে যাবার আগে এ-মূর্তিকে প্রণাম করে শুলে মঙ্গল হবে। অবহেলা করলে অশুভ।

এসব ব্যাপারে আমার ভক্তি-শ্রদ্ধা একটু কম, বরং বলা যায়, আমি কিছুটা নাস্তিক। নিজের পুরুষকার ছাড়া আর কিছু মানি না।

তবু রামকৃষ্ণের মুখের ওপর আমি কিছু বলিনি। বলতে পারিনি। মূর্তিটা নিয়ে আলনার ওপর রেখে দিয়েছিলাম।

এলুরুর চারপাশে তামাকের খেত। আমার কাজ এই সব তামাক পরিদর্শন করা, একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।

তামাকে যাতে পোকা না লাগে, লাগলে তার প্রতিষেধক কি, তারপর কি ভাবে তাকে গুদাম জাত করে রপ্তানীর উপযোগী করা যায়, সে বিষয়ে নির্দেশ।

অনেক দিন আমাকে গ্রাম অঞ্চলেই কাটাতে হত। তখন শঙ্করণ থাকত বাড়ির তদারকিতে। একেবারে নিস্তরঙ্গ জীবন। সংস্কৃতির ছিটেফোঁটা কোথাও নেই।

কি আর করা যাবে! কটা লোক আর জীবন আর জীবিকা মেলাতে পারে।

মাস খানেক পরে মুস্কিলে পড়লাম। শঙ্করণ এল না। এই সময় বর্ষার খুব প্রকোপ। চারিদিকে ম্যালেরিয়া। দিন পনের শয্যাগত করে রাখে।

নিরুপায়, নিজেকেই হাত পুড়িয়ে রান্নাবান্না করতে হয়।

কাজ বিশেষ নেই। রাত আটটার মধ্যে শুয়ে পড়ি। বাইরে বৃষ্টির নূপুর আর ব্যাঙের আলাপ জলসার আবহাওয়ার সৃষ্টি করছে।

শোওয়া মাত্র চোখে ঘুম নেমে এল। রাত কত খেয়াল নেই। হঠাৎ ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসলাম।

মশারিতে আগুন ধরে দাউ দাউ করে জ্বলছে।

কি আশ্চর্য, কি করে এটা হল?

বেড সুইচ নেই। ঘরের আলো বন্ধ করে তবে আমি শুয়েছি। কারণ আলো থাকলে আমি ঘুমোতে পারি না।

ভীষণ বিপদে পড়ে গেলাম।

মশারির চারিদিক জ্বলে উঠেছে। নাইলনের মশারি। নামবার কোন পথ নেই। আগুনের তাপ আমার শরীর ঝলসে দিচ্ছে।

NOT FOR SALE

চেঁচাবার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি। আর চেঁচিয়েও কোন লাভ নেই। সবচেয়ে কাছে যে বাড়ি সেটাও আধ মাইল দূরে। বিদেশে এভাবে কি পুড়ে মরতে হবে!

মরিয়া হয়ে নামবার চেষ্টা করলাম। এ ছাড়া উপায় নেই। একটু এগিয়ে থেমে গেলাম।

সেই অগ্নিশিখার পিছনে বিরাট এক মূর্তি। শুধু বিরাট নয়, বিকটও।

কালভৈরবীর মূর্তি। দুটি চোখে অগ্নিপিণ্ড। ঠোঁটের দুপাশে আগুনের ঝলক।

ভাবলাম, ভুল দেখেছি। চোখ দুটো ভাল করে রগড়ে নিলাম। কিন্তু না, এক দৃশ্য।

কালভৈরবীর মূর্তি যেন জীবন্ত হয়েছে। এদিকে আগুনের উত্তাপ বাড়ছে। বিছানার ওপর বসে থাকা আর সম্ভব নয়।

লাফিয়ে মেঝের ওপর পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে আগুন যেন মিলিয়ে গেল কালভৈরবীর মূর্তিও উধাও।

কিন্তু আর একটা আশ্চর্য কাণ্ড। একটা অদৃশ্য টানে কে যে আমাকে আলনার দিকে নিয়ে গেল!

আলনার কাছে গিয়েই অবাক হলাম। কালভৈরবীর মূর্তিটা নেই।

শঙ্করণ মূর্তিটা আলনার ওপর একটা তাকের মধ্যে রাখত। মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছি, সে মূর্তির সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ত। আমি নিজে না মানলেও এসব, কারো ধর্মবিশ্বাসে বাধা দিতে চাইনি।

পিছন ফিরে দেখলাম, মশারির অবস্থা স্বাভাবিক। আগুনের সামান্য চিহ্নও কোথাও নেই।

নিজের ওপর রাগ হল। নিশ্চয় বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।

স্বপ্ন দেখে এতটা ভয় পাওয়া নিঃসন্দেহে ছেলেমানুষি। কিছুক্ষণ পায়চারি করে শুতে গেলাম।

ভোরের দিকে একই কাণ্ড।

এবার কালভৈরবীর মূর্তির দুটি নাসারন্ধ্র দিয়ে আগুনের হলকা। মশারি পুড়ছে।

আগের বারের মতন লাফ দিয়ে নীচে নামতে সব স্বাভাবিক।

আর বিছানায় যাইনি। আলো ফোটা পর্যন্ত বেতের চেয়ারে চুপচাপ বসে রইলাম। শেষ রাতের দিকে বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল।

আকাশ প্রায় পরিষ্কার, ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের আভাস।

শঙ্করণ এসে হাজির।

জ্বর নেই, তবে চেহারা বেশ কাহিল। একবার ভাবলাম, শঙ্করণকে কিছু

NOT FOR SALE

বলব না। আমার সম্বন্ধে তার ধারণা খারাপ হবে। ভাববে, আমি অহেতুক ভয় পেয়েছি।

কিন্তু তাকে অন্যভাবে জিজ্ঞাসা করলাম।

আচ্ছা শঙ্করণ, সেই কালভৈরবীর মূর্তিটা কোথায় জান?

কালভৈরবীর মূর্তি! কেন, তাকের ওপর নেই?

শঙ্করণ ছুটে এল ঘরের মধ্যে।

তাক খালি। মূর্তি নেই।

লক্ষ্য করলাম, শঙ্করণের মুখ পাংশু, নীরক্ত হয়ে গেল। এদিক ওদিক খুঁজতে লাগল।

তাই তো, কোথায় গেল? আপনি ফেলে দেন নি তো?

আমার ঈশ্বর বিশ্বাসের উপর শঙ্করণের মোটেই শ্রদ্ধা ছিল না। সে আমার হালচাল দেখে হয়তো কিছুটা মালুম করেছে।

আমি বললাম, মূর্তি সম্বন্ধে আমি কোনই খোঁজ রাখি না। তুমিই তো দেখাশোনা করতে!

শঙ্করণের আমার কথার উত্তর দেবার অবকাশ নেই।

সে তন্নতন্ন করে মূর্তিটা খুঁজছে। আলনাটা সরিয়েই চেঁচিয়ে উঠল। এই তো, এখানে পড়ে রয়েছে।

দেখলাম, দুজোড়া জুতোর ফাঁকে মূর্তিটা পড়ে আছে। শঙ্করণ সন্তর্পণে মূর্তিটা তুলে নিল।

রুক্ষকণ্ঠে বলল, এটা এখানে কে ফেলল?

উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করলাম না। চুপ করে রইলাম। শঙ্করণ মূর্তিটা কাপড় দিয়ে ভাল করে মুছে তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করল।

নতজানু হয়ে মূর্তির সামনে বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করল।

মাসখানেক এইভাবে গেল। কোন উপদ্রব নেই।

কলিকাতা থেকে একটা চিঠি এল। বন্ধু অসিতের লেখা। অসিত শুধু আমার মামুলি বন্ধুই নয়, কলেজে আমরা অভিন্ন ছিলাম। অসিত বম্বেতে এক কাপড়ের টেক্সটাইল ইঞ্জিনীয়ার।

সে লিখেছে, দু'মাসের ছুটিতে কলিকাতা এসেছে। এসে ভাল লাগছে না, কারণ কলিকাতায় তার কেউ নেই। তার খুব ইচ্ছা আমার কাছে মাস খানেক কাটিয়ে যায়।

প্রস্তাবটা খুব ভাল লাগল। পাণ্ডববর্জিত দেশে অসিতের মতন বন্ধু পাশে থাকলে সময়টা ভালই কাটবে। পত্রপাঠ তাকে আসতে লিখে দিলাম। চিঠি লেখার সাত দিনের মধ্যে এসে হাজির। এলুরু স্টেশন থেকে তাকে ট্যাক্সি করে নিয়ে এলাম।

NOT FOR SALE

বাড়ি দেখে অসিত বেজায় খুশী। সব কিছুতেই তার দারুণ উৎসাহ।

বিন্দুতে সিন্ধুর স্পর্শ পেল।

বাঃ, এ যে একেবারে বাগানবাড়ি রে, শহর অথচ শহরের গোলমাল নেই। বেশ আছিস।

চা খেতে খেতে হঠাৎ তার দৃষ্টি মূর্তির দিকে গেল। জিজ্ঞাসা করল, ওটা কিসের মূর্তি রে?

কালভৈরবীর।

সেটা আবার কি?

চা শেষ করে অসিত মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখে বলল, বাড়ির মধ্যে এই কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিটা রেখেছিস কেন? ফেলে দে।

শঙ্করণ ওই মূর্তিটা রোজ পূজা করে, তাই আর সরাইনি। না হলে ও মোটেই আমার পছন্দসই নয়।

শঙ্করণ পছন্দ করে তো এটা সে তার বাড়িতে নিয়ে যাক। কিংবা রান্নাঘরে, তার কাজের জায়গায় রাখুক। তোকে তো নাস্তিক বলেই জানতাম। অন্তত মূর্তিপূজার বিরোধী।

কিছু বললাম না। কি-ই বা বলব!

অসিত আমার মনের কথাই বলেছে। আমার ঠিক পাশের ঘরটা তার শোবার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল।দুটো দরজার মাঝখানে একটা দরজা ছিল। বেশ কিছুটা রাত গল্পগুজব করার পর অসিত শুতে গিয়েছিল।

আমার ঘুম আসেনি। টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে টোবাকো কিওরিং সম্বন্ধে একটা বই পড়লাম। তারপর শুতে গেলাম।

বোধহয় মাঝরাত, ঠিক খেয়াল নেই। পাশের ঘরে দুপদাপ শব্দ। অনেকগুলো লোক যেন দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে।

একবার মনে হল ডাকাত পড়েছে। তারপর ভাবলাম, ডাকাতদের তো এই ঘরের মধ্যে দিয়েই যেতে হবে।

পাশের ঘরে ঢোকবার আলাদা কোন রাস্তা নেই। সারা ঘর জুড়ে তাণ্ডব নৃত্য চলেছে। অসিতের কোন শব্দ নেই।

তবে কি তার কোন বিপদ ঘটল! উঠে পড়লাম।

দরজার পাশে গিয়ে দেখলাম, অসিত পাশের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছে।

হাত রাখতেই দরজাটা খুলে গেল। শব্দ চলছে, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। শুধু অসিতের মশারিটা প্রবল বাতাসে উড়ছে।

অথচ আজ গুমোট। বাতাস একেবারেই নেই।

অসিত, অসিত।

NOT FOR SALE

বার কয়েক চেঁচালাম। কোন উত্তর নেই।

বাইরে ম্লান চাঁদের আলো। জানলা দিয়ে সেই আলো অসিতের বিছানার ওপর এসে পড়েছে। অস্পষ্ট অসিতের কাঠামো দেখা গেল। সে শুয়ে রয়েছে।

সন্দেহ হল, ভুতুড়ে বাড়ি নয় তো? শব্দ আসছে কোথা থেকে?

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিজের বিছানায় ফিরে এলাম। তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়েছি।

অসিতের সঙ্গে দেখা হল, পরের দিন চায়ের টেবিলে।

আমি কিছু বলবার আগেই অসিত বলল, না ভাই, দুবেলা মাংস আমার সহ্য হচ্ছে না। পেট গরম হয়। রাত্রে যা সব স্বপ্ন দেখি।

কি স্বপ্ন দেখলি?

আর বলিস কেন? কাল মাঝরাতে দুপদাপ শব্দ। একপাল লোক, হাতে ত্রিশূল, আমার বিছানা ঘিরে প্রলয় নাচ নেচে চলেছে, যেখানে পা ফেলছে সেখানেই আগুন জ্বলে উঠছে। আর এমন মজা, সেই আগুনের আঁচ লাগছে আমার সারা দেহে। ওঠবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না।

অসিতের দিকে দেখলাম, তার চেহারা খুব ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত মনে হল। কালভৈরবীর মূর্তির কথাটা বলতে গিয়েও বললাম না।

চা পান শেষ করে আমি আমার শোবার ঘরের তাকের কাছে গিয়েই চমকে উঠলাম। তাক খালি। মূর্তি নেই।

সর্বনাশ, মূর্তিটা আবার গেল কোথায়! আলনা, সুটকেস, জিনিসপত্র সরিয়ে খুঁজতে আরম্ভ করলাম। মূর্তি কোথাও নেই।

সেই সময় শঙ্করণ ঘরে ঢুকল। উসকোখুসকো চুল, মলিন মুখ, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। হাতে কালভৈরবীর মূর্তি।

স্যার, আপনার এখানে কাজ করে আমার পোষাবে না। আমাকে ছুটি দিয়ে দিন।

কি হল?

শঙ্করণ কালভৈরবীর মূর্তিটা তুলে ধরে দেখিয়ে বলল, এই মূর্তিটাকে রান্নাঘরের কোণে ময়লা ফেলার ঝুড়ির মধ্যে রেখে দিয়েছিল। আপনারা আমিষভোজী-বিধর্মী। ঠাকুর-দেবতা হয়তো মানেন না। কিন্তু কালভৈরবী একেবারে কাঁচাখেকো দেবতা। কাউকে রেহাই দেবেন না।

শঙ্করণ চলে গেলে, আমি খুবই মুশকিলে পড়ব। তাই বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, এ মূর্তি এখান থেকে সরাল কে?

কে সরাল শঙ্করণ ভাল করেই জানত। যে সরিয়েছে সে কোন লুকোচুরি করেনি। তাই অসিতের ঘরের দিকে চোখের ইঙ্গিত করে শঙ্করণ বলল।

NOT FOR SALE

আর, কে সরাবে, আপনার বন্ধু। ঠাকুর-দেবতা নিয়ে খেলা করতে বারণ করে দেবেন। সর্বনাশ হয়ে যাবে।

অসিত তখন আমার পিছনেই ছিল।

ঠিক আছে, তুমি কাজ কর তো, যাও। অসিতকে আমি বলে দেবো।

শঙ্করণ চলে গেল।

সেদিন বিকালে অসিতের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে কথাটা বললাম।

চিন্তাধারার দিক দিয়ে আমার সঙ্গে অসিতের কোন অমিল ছিল না। দুজনের একই ধরনের বিশ্বাস। সেই কলেজের দিন থেকে একটা রাতের অভিজ্ঞতাকে আমি মোটেই আমল দিই না। সে রাতের স্বপ্নের সঙ্গে ওই কালভৈরবী মূর্তির কোন যোগাযোগ আছে, আমি মনে করি না।

কিন্তু শঙ্করণের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানলে সে হয়তো এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। এ বিদেশ বিভুঁয়ে আমি বিপদে পড়ব। তাই অসিতকে বললাম, অসিত, আমার একটা কথা শুনবি?

বল।

তুই তো আর দিন দুয়েক আছিস, এর মধ্যে কালভৈরবীর মূর্তি নিয়ে আর গোলমাল করিস না।

অসিত কোন উত্তর না দিয়ে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক জরিপ করল।

এদেশের লোকেরা খুবই ধর্মভীরু হয়। অনেকটা আমাদের দেশের লোকেদের মতন। পাথর, নুড়ি, গাছপালা সব কিছুতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করে আনন্দ পায়। ওই কালভৈরবীর মূর্তিটাকে তুই অবহেলা আর তাচ্ছিল্য করলে শঙ্করণ আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। তারপর কোন লোক আর আমার কাছে কাজ করতে আসবে না। আমার কি অসুবিধা হবে বুঝতে পারছিস?

একটু চুপ করে থেকে অসিত উত্তর দিল, তোর এমন অধঃপতন হবে ভাবতে পারিনি। দরকার হলে কলকাতা থেকে লোক নিয়ে আয়। নিজের চিন্তার স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিত্ব এভাবে বিসর্জন দিস না।

তুই পাগল হয়েছিস অসিত। কলিকাতা থেকে কে আসবে এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায়? বেশী টাকার লোভ দেখিয়ে নিয়ে এলেও কিছুদিন পর পালাবে। তাছাড়া এদেশের লোক আমাকে বয়কট করবে। শঙ্করণের মারফত কথাই চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়বে।

ঠিক আছে, তোর কথাটা শুনে রাখলাম।

অসিত চাপা সুরে কথাগুলো বলল।

কিন্তু তার মুখ-চোখের চেহারা আমার ভাল লাগল না। কঠিন একটা

NOT FOR SALE

পড়েছিল। অসিতও গোয়ালঘরে ঢুকেছিল। বোধহয় তার উদ্দেশ্য ছিল, মূর্তিটা ভেঙে চুরমার করে দেবে।

তারপর হতভম্ব শঙ্করণ অসিতের আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল। চোখের সামনে বীভৎস দৃশ্য দেখেছিল।

কি আশ্চর্য, দারোগা সব কথাই বিশ্বাস করেছিল! লিখে নিতে কোন দ্বিধা করেনি। দেবতার বিদ্বেষে এমন ঘটনা যেন খুব স্বাভাবিক।

অসিতের শেষ কাজ করে বাড়ি ফিরতে ভোর হয়ে গেল। ক্লান্ত দেহ, বিষণ্ণ মন, চিন্তা করার ক্ষমতাও যেন লোপ পেয়েছে। তালা খুলে ঘরের মধ্যে পা দিয়েই চমকে উঠলাম।

তাকের ওপর সেই কালভৈরবীর মূর্তি।

বদ্ধ ঘরে কি করে এল মূর্তিটা! কে রাখল!

অসিতের দেহের অভ্যন্তর থেকে এই মূর্তি বাইরে এল কি করে!

—সমাপ্ত—

NOT FOR SALE

এ যুগের রূপকথা

এক রাজা ছিল। তার দুই রানী। বড় রানী ও ছোট রানী। রাজার মনে কিন্তু খুব দুঃখ, কারণ বড় রানী কানা ও ছোট রানী খোঁড়া।

বিয়ের সময় কিন্তু কানা-খোঁড়া ছিল না। বড় রানীর একটা খোঁড়া কাকাতুয়া ছিল। বড় রানী তাকে নিজের হাতে পেয়ারা আর লঙ্কা খাওয়াত। একদিন খাঁচায় মুখ রেখে বড় রানী কাকাতুয়াকে কথা বলতে শেখাচ্ছিল। তখন বদমায়েশ পাখিটা কাঁটা ধারালো ঠোঁট দিয়ে তার চোখটা ঠুকরে দিয়েছিল।

ঝরঝর করে রক্ত। বড় রানী দুই হাতে চোখ চেপে হাউমাউ চিৎকার করে। ছোট রানী সব শুনে রাজাকে খবর দিয়েছিল।

রাজা তখন বসে বসে সিংহাসনে পেরেক ঠুকছিল। কদিন ধরে পেরেকটা ভারি কষ্ট দিচ্ছিল। বসতে গেলেই লাগছিল।

সব শুনে রাজা হাতুড়ি নিয়ে ছুটে এসেছিল। হাতুড়ির একঘায়ে পাখিটাকে খতম করে দেবে।

কিন্তু তা আর হল না। খাঁচার কাছে গিয়ে দেখেছিল, খাঁচা খালি। কাকাতুয়া নেই। ঠোঁট দিয়ে খাঁচার দরজা খুলে কাকাতুয়া পালিয়েছে। ওদিকে বড় রানী বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে।

তখন রাজবৈদ্য ভূপাল কবিরাজ এসেছিল। নিজের হাতে ঔষধ তৈরী করে রানীর চোখে লাগিয়ে দিয়ে বলেছিল, ঠিক আছে।

আগে বড় রানী ঝাপসা দেখছিল। বার দুয়েক ঔষধ লাগাবার পর বাঁ চোখে আর দেখতে পায়নি, একেবারে কানা।

ভূপাল কবিরাজকে আর পাওয়া যায়নি। সে এখানকার বাস উঠিয়ে মেয়ের বাড়ি গিয়ে উঠেছিল। তার আর পাত্তা পাওয়া যায়নি।

ছোট রাণীর ব্যাপারটা আলাদা— চুলের ফিতে কিনবার জন্য তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে ছোট রাণী সিঁড়িতে পা পিছলে একেবারে একতলায়। আর উঠে দাঁড়াতে পারে না। ডান পা-টা ভেঙেছে।

খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, ঝি দামিনী সিঁড়ি ধুয়েছিল। কিন্তু ভাল করে মোছেনি, তাতেই ছোট রাণীর পা পিছলে গিয়েছিল।

রাজা বিচারে বসল। দামিনীর শাস্তি হল, রোজ সকালে সে সিঁড়িতে জল

NOT FOR SALE

ঢালবে আর তার উপর দিয়ে তাকে ছুটে ওঠানামা করতে হবে। টানা এক ঘণ্টা ধরে।

কি আশ্চর্য কাণ্ড! তিন বছর ধরে দামিনী ওঠানামা করছে। রীতিমত জোরে। কিন্তু পড়া তো দূরের কথা, একটুও টলছে না।

ছোট রাণীকে ধরাধরি করে ওপরের ঘরে শোয়ানো হয়েছিল। মহা মুশকিল, রাজ্যে রাজবৈদ্য তো আর নেই। সে পালিয়েছে। তার সহকারীকে ধরে আনা হল।

সে অনেক দেখেশুনে বলেছিল, হাঁটুর হাড় ঘুরে গেছে।

রাজা গম্ভীর গলায় বলেছিল, হাড় ঘুরিয়ে ঠিক করে দাও।

সহকারী অনেক চেষ্টা করল। হাড় ঘুরল না। তখন রাজবৈদ্য বলেছিল, একটা লাঠি দিন তো।

রাজা তো অবাক। লাঠি কি হবে? ছোট রাণীকে কি ভূতে পেয়েছে যে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ভূত ছাড়াবে? বড় রাণী একটা ছাতির বাঁট তুলে দিয়েছিল। সহকারী হাঁটুতে ছাতির বাঁট বেঁধে দিয়েছিল, বলে গিয়েছিল সাত দিন এভাবে থাকবে।

ছোট রাণী দারুণ ছটফটে। তিন দিনের দিনই ছাতির বাঁট খুলে ফেলেছিল। ব্যস, সেই থেকে ছোট রাণী খোঁড়া।

কানা বড় রাণী আর খোঁড়া ছোট রাণীকে নিয়ে রাজার দুঃখের শেষ নেই।

রাজসভায় রাজা বিশেষ যেতে পারে না। অবশ্য এমন কিছু দূর রাজসভা নয়। একেবারে বাহিরের ঘরে।

সিংহাসনে পেরেক উঠেছে বলে একটা মোড়া রাখা হয়েছে। তার উপর খড়ের গদি পাতা। দুপাশে ছোট দুটো বেঞ্চ।

একদিকে বসে মন্ত্রী আর একদিকে সেনাপতি। আগে দুজন লোক ছিল। এখন একজন।

গত বছর সেনাপতি মাঠে কুচকাওয়াজ করার সময় এক খেঁকশিয়াল তাকে কামড়ায়। খেঁকশিয়ালটা পাগল ছিল। সেনাপতি জলাতঙ্ক রোগে মারা গিয়েছিল।

সেই থেকে মন্ত্রী ভাস্কর রায় সেনাপতির কাজটাও চালিয়ে যাচ্ছে। যখন মন্ত্রী হয়ে রাজাকে পরামর্শ দেয়, তখন ধুতি পাঞ্জাবি পরে।

আবার যখন সেনাপতির কাজ করে, তখন পাঞ্জাবি থাকে না। কেবল গেঞ্জি আর ধুতিটা মালকোঁচা দিয়ে নেয়।

আর একটি বেঞ্চে বসে গগন আচার্য। একাধারে সভাপণ্ডিত আর ভাঁড়। আগে এ রাজ্যে ভাঁড় ছিল না। প্রজারা সব ধরল, রাজসভায় ভাঁড় থাকবে না, সে কি হতে পারে?

NOT FOR SALE

ভাঁড়ের কাজ হাসানো। অনেক ভেবে রাজাই বলেছিল, গগন, ও কাজটা তুমি চালিয়ে যাও। মাঝে মাঝে তুমি যা শ্লোক আওড়াও আমার হাসিই পায়। আর তোমার চেহারা দেখলে হাসবে না, এ রাজ্যে এমন কে আর আছে?

গগন আচার্যের পিঠে একটা মানানসই কুঁজ।

রজ্যের সৈন্যসংখ্যা পাঁচ। যখন তাদের কাজ থাকে না, তখন কেউ চাষ করে, কেউ খড় কাটে, কেউ বা হাঁড়ি কলসি তৈরী করে। কাজ বলতে গেলে তাদের থাকেই না, কারণ যুদ্ধের কোন ব্যাপারই নেই। আশেপাশে যে সব রাজা আর জমিদার আছে, তাদের এই আড়াই মাইল লম্বা আর এক মাইল চওড়া রাজ্যের উপর কোন লোভই নেই।

তবু সাবধানের মার নেই। সপ্তাহে একদিন সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করতে হয়। সৈন্যরা সব রাস্তা ঘুরে রাজপ্রাসাদের কাছে এসে থামে। অস্ত্রশস্ত্র বলতে যার যা হাতিয়ার সম্বল। কারও লাঙ্গল, কারও রামদা, কারও বা কাস্তে।

সবাই সার দিয়ে দাঁড়িয়ে কপালে হাত ঠেকায় আর রাজা-প্রাসাদের বাঁশের বেড়ায় হেলান দিয়ে অভিবাদন গ্রহণ করে।

মুশকিল হচ্ছে, রাজা নিয়মিত রাজসভায় যেতে পারে না। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রাজাকে বড় রাণীর উকুন বাছতে হয়।

এ এক নতুন উপদ্রব। কোথা থেকে আমদানি হল কে জানে! মাথা চুলকে চুলকে বড় রাণীর পাগল হবার দাখিল।

দামিনীর সময় নেই। তার রান্নাবান্না বাজার-হাট করা আছে। ঘরদোর ঝাড়ামোছা। তার উপর আবার সিঁড়িতে জল ঢেলে ওঠানামা।

ছোট রাণী ভয়ে বড় রাণীর কাছে ঘেঁষে না। একে তার ঘাড় পর্যন্ত চুল, তাতে উকুন লাগলেই সর্বনাশ।

কাজেই রাজাকেই উকুন বাছবার কাজটা করতে হয়। তার অবশ্য মাথায় উকুন লাগার কোনো ভয় নেই। কারণ তার মাথা ডিমের মতো পরিষ্কার। চুলের একটি ডগাও কোথাও নেই।

খুব জরুরী রাজকার্য পড়ে গেলে মন্ত্রীকে অন্দরে আসতে হয়।

রাণীরা পর্দানসীন, কাজেই কোন পুরুষের হুট করে ভেতরে আসার রেওয়াজ নেই।

তাই মন্ত্রী চৌকাঠের ওপর থেকে হাঁক পাড়ে।

রাজামশাই, মন্ত্রী ভাস্কর রায় দর্শনপ্রার্থী।

রাজা তটস্থ হয়ে পড়ে। চিৎকার করে, ক্ষণকাল তিষ্ঠ। সঙ্গে সঙ্গে বড় রাণী টিনের বেড়ার ওপারে নিজের খাসমহলে যায়। পাশাপাশি দুই রাণীর খাসমহল, মাঝখানে দর্মার আড়াল।

বড় রাণী চলে যেতে রাজা ঝাঁটা দিয়ে মরা আধমরা উকুনগুলো একপাশে

NOT FOR SALE

সরিয়ে রেখে, পরনের ছেঁড়া লুঙ্গিটা বদলে একটা আধময়লা ধুতি জড়িয়ে নেয়। তারপর প্যাকিং কেসে হেলান দিয়ে বলে, মন্ত্রী ভাস্কর রায়কে রাজসমীপে আসতে আজ্ঞা দেওয়া হল।

দু হাত বুকের ওপর জোড় করে মন্ত্রী ঢুকল।

কি সংবাদ?

আজ্ঞে রাজামশাই, রাধাগোবিন্দের মন্দিরের সংস্কারের প্রয়োজন।

সংস্কার?

রাজা একটু দম নিলেন। সংস্কার মানেই তো টাকার ব্যাপার। এমনিতেই টানাটানি চলছে। প্রজারা যা কর দেয় রাজা-রাণীর দুবেলা খাওয়া চলে না। রাতে প্রায়ই মুড়ি খেয়ে কাটাতে হয়।

আজ্ঞে, মন্দিরের সব টিন ফুটো হয়ে গেছে। মন্ত্রী নিবেদন করল, কাল সারারাত বৃষ্টি হয়েছে, রাধাগোবিন্দ একেবারে ফুলে ঢোল। জাগ্রত দেবতা, তাই হুজুর ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছে। সকাল থেকে অনবরত হাঁচছে।

রাজা চমকে উঠলেন। সর্বনাশ, এতে যে রাজ্যের অমঙ্গল হবে।

হবে বই কি আজ্ঞে?

রাজা চিন্তিত হয়ে পড়ল। টাক মাথায় বার কয়েক হাত বোলাতেই বুদ্ধি খুলে গেল।

মন্ত্রী, রাজা টান হয়ে বসল। একটা কাজ কর।

আজ্ঞা করুন।

রাজ্যের পশ্চিম দিকে গগন আচার্যের গোলপাতার একটা বন আছে। গগনকে হুকুম দাও, মন্দিরের চালের জন্য যতগুলো দরকার গোলপাতা কেটে দিয়ে যাবে।

সৈন্যদের বল, দু ঘণ্টার মধ্যে মন্দিরে গোলপাতার ছাউনি করে দেবে।

রাজার উপস্থিত বুদ্ধি দেখে মন্ত্রী অবাক। প্রণাম করে সে বেরিয়ে গেল।

আর একবার আর এক ঝামেলা।

সেবারেও এই মন্ত্রী এসে হাজির। বাহির থেকে বলল, রাজামশাই কি ব্যস্ত আছেন?

রাজা সত্যিই একটু ব্যস্ত ছিল।

বড় রাণীর কদিন জ্বর, ম্যালেরিয়া বলেই মনে হচ্ছে। দামিনী হাটে গেছে। ছোট রাণী বসে বসে চাল বাচছে। চাল মাটির ঢেলায় ভর্তি।

রাজা উনুন ধরাচ্ছে। এটা বড় রাণীই করে। কাঠের টুকরো, কাগজের কুচি আর গুল দিয়ে যতবার ধরাতে যায় ততবার আগুন নিভে যায়।

রাজা নীচু হয়ে উনুনে ফুঁ দিতে লাগল। তার দু চোখ লাল। মুখে, গালে কয়লার দাগ। কিছুতেই রাজা উনুনটা বাগে আনতে পারছে না।

NOT FOR SALE

এমন সময় মন্ত্রীর ডাক।

রাজকার্য উপেক্ষা করা যায় না। তাছাড়া খুব প্রয়োজন না হলে মন্ত্রী বাড়িতে আসে না।

কি ব্যাপার?

রাজা উনুন থেকে মুখ সরিয়ে দাঁড়াল।

একটু যদি অনুগ্রহ করে প্রাসাদদ্বারে এসে দাঁড়ান—

রাজা উঠে এগিয়ে গেল।

মন্ত্রী আভূমি নত হয়ে নমস্কার করে মুখ তুলেই অবাক।

রাজামশাইয়ের প্রসাধন পর্ব কি এখন শেষ হয়নি?

প্রসাধন?

রাজা বুঝতে পারল না, তাড়াতাড়ি গেঞ্জিতে গালের কালি মুছে ফেলে জিজ্ঞাসা করল, সংবাদ কি বল?

আমাদের রাজ্যে অশ্বানন পণ্ডিত এসেছেন।

তিনি কে?

আজ্ঞে কুসরির রাজ্যের সভাপণ্ডিত। উদ্ভট বিশারদ।

এখানে আসার হেতু?

পথে অচীননগর নয়নপুর হয়ে এসেছেন। উদ্ভট কাব্যে সেখানকার সভাপণ্ডিতদের পরাজিত করে। আমার মনে হয় এ রাজ্যে আসারও সেই এক উদ্দেশ্য।

সংবাদ পেয়ে গগন আচার্য কি পলায়ন করেছে?

না, এখানেই আছেন। তবে বাতে প্রায় ধরাশায়ী।

তাকে সংবাদ দাও। দুদিনের মধ্যে সেরে উঠতে হবে।

পরশু রাজসভায় প্রতিযোগিতা হবে।

তুমি রাজ্যে এই মর্মে ঢোল পিটিয়ে দাও।

যথা আজ্ঞা।

মন্ত্রী অভিবাদন করে বিদায় নিল।

বেশ কিছুক্ষণ পর দামিনী হাট থেকে ফিরল, হাঁপাতে হাঁপাতে।

রাণীমারা, সর্বনাশ হয়েছে। লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

বড় রাণী জ্বর গায়ে তক্তপোশ থেকে লাফিয়ে পড়ল। কোথায় লড়াই শুরু হয়ে গেছে রে? কার সঙ্গে লড়াই?

ছোট রাণী বসে বসে বাটনা বাটছিল। সে উঠল না।

বড় রাণী ছোট রাণীর কাছে এসে বলল, হ্যাঁরে ছোট, লড়াই লেগেছে, আর তুই বসে বসে বাটনা বাটছিস!

লড়াই লেগেছে বলে তো আর খাওয়া-দাওয়া বন্ধ থাকবে না।

NOT FOR SALE

বড় রাণী সিঁড়ির চাতালে বসল। যুদ্ধটা কার সঙ্গে শুনেছিস কিছু?

কি জানি দিদি? মন্ত্রী রাজামশাইকে কি একটা খবর দিল।

রাজামশাই কোথায়? এই সময়ে রাজা উঠানে একটু পায়চারি করে।

প্রাসাদের পিছনে, উদ্যানে।

গোটা চারেক লঙ্কা, দুটো কচু, দুটো বেগুন আর একটা লাউগাছ নিয়ে উদ্যান। রাজা রোজ সকালে বিকালে এখানে বেড়ায়। বেড়ানোও হয়, তদারকিও হয়।

বড় রাণী দামিনীকে দিয়ে রাজাকে ডেকে পাঠাল।

রাণীরা পর্দানসীন। অন্ধকার না হলে তারা উদ্যানে নামে না।

দামিনীর ডাকে রাজা দ্রুতপায়ে প্রাসাদে ফিরে এল। এসে দেখল, বড় রাণী সিঁড়িতে বসে আর ছোট রাণী রান্না চাপিয়েছে।

রাজা চটে গেল। জ্বর গায়ে তুমি উঠে বসেছ যে? জান না নড়াচড়া করলে জ্বর বাড়ে?

রাজার কথায় বড় রাণী বিশেষ আমল দিল না।

রাজাকে জিজ্ঞাসা করল, প্রভু কিসের লড়াই? কার সঙ্গে লড়াই?

লড়াই কে বলল?

ওই যে দামিনী বলল, হাটে ঢোল পিটিয়ে লড়াই-এর কথা বলছে।

প্রথমে রাজা বুঝতে পারল না। তারপর বুঝতে পেরে হো হো করে হেসে উঠল। আরে অস্ত্রের লড়াই নয়, রাজ্যের লড়াই।

রাজ্যের লড়াই?

এবারে ছোট রাণীও ঘুরে বসল। উত্তেজনায় ভুল করে ডালে দুবার নুন দিয়ে ফেলল।

বাইরে থেকে এক সভাপণ্ডিত এসেছে। তার সঙ্গে আমাদের গগন আচার্যের কাব্যের লড়াই। পরশু। আমাদের রাজসভায়।

কাব্যের লড়াই দুপুরবেলায়, কিন্তু ভোর থেকে রাজ্যের ছেলেমেয়ে কাতারে কাতারে রাজসভার দিকে আসতে আরম্ভ করল। ব্যাপার দেখে মনে হয়, রাজ্যে বুঝি স্নান খাওয়া বন্ধ।

রাজসভা আর কতটুকু জায়গা। বাহিরের উঠান ভরে গেল। রাজসভা এই উদ্দেশ্যে বিশেষ করে সাজানো হয়েছে। জানলা দরজায় দেবদারুর মালা। পেরেক ঠুকে সিংহাসন ঠিক করে সভার মাঝখানে বসানো হয়েছে। দুপাশে দুটো বেঞ্চ, পুরানো লাল কাপড় ঢাকা দেওয়া। রামশিঙা হাতে একজন প্রজা দরজায় দাঁড়িয়ে। সভা শুরু হবার সময় শিঙা ফুঁকবে।

রাজার একটু মুশকিল হয়েছে। ভাতে কিছু মাটির ঢেলা ছিল। ভাল করে

NOT FOR SALE

বাছা হয়নি। তার উপর ডাল একেবারে নুনে পোড়া। কোনরকমে কচুর শাক মেখে খাওয়া শেষ করেছিল।

পোশাক ঝাড়তে গিয়ে আর এক বিপত্তি।

একটা জরির গোলাপ ছিল, সেটা ইঁদুরে কেটে একেবারে শেষ করেছে। নাগরা জুতোটা কবে কুকুরে মুখে করে নিয়ে গেছে। বাকী আছে শুধু জরির কোমরবন্ধ। এর সঙ্গে খাপে ঢাল তরোয়াল ছিল।

তরোয়াল শান দেবার জন্য যাকে দেওয়া হয়েছিল, সে সেটা ভেঙে দু টুকরো করে ফেলেছিল, এখন শুধু খাপটা আছে।

কিন্তু কোমরবন্ধটা কিছুতেই আঁটা যাচ্ছে না। ভুঁড়ি বড় হয়ে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করে হতাশ হয়ে রাজা ছোট রাণীকে ডাকল।

ছোট রাণী কোমরবন্ধের সঙ্গে একটা দড়ি বেঁধে দিল। দড়িটা রইল পিছন দিকে। কারও চোখে পড়বার কথা নয়।

রাজা বের হবার মুখে ছোট রাণী থামিয়ে দিল।

প্রভু, একটা নিবেদন।

বিরক্ত মুখে রাজা বলল, কি বল? আমার এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।

এভাবে খোলা মাথায় আপনার সভায় যাওয়া অনুচিত।

পাগড়ি পাব কোথায়? সবই তো জান। বছর ছয়েক আগে তোমার ভাই বেড়াতে এল। যাবার সময় চুপিচুপি পাগড়িটা নিয়ে সরে পড়ল।

ছোট রাণী কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, আপনার পাগড়ির ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।

নিজের পুরানো একটা জংলা শাড়ি দিয়ে রাজার পাগড়ি বেঁধে দিল। রাজা সভায় পা দিতেই রামশিঙা বেজে উঠল।

প্রজারা হাত তুলে বলল, জয়তু রাজাধিরাজ।

রাজার আরও অনেক বিশেষণ প্রজাদের মন্ত্রী শিখিয়েছিল, কিন্তু অনভ্যাসের জন্য প্রজারা সব ভুলে গেছে। রাজার জয়ধ্বনি দেবার সুযোগ তাদের হয়ই না।

এদিককার বেঞ্চে নিজের জায়গায় গগন আচার্য বসে। তার বিচিত্র সাজ। পরনে ভাল গরদের ধুতি আর চাদর। পিঠের কুঁজটা মখমলের কাপড়ে ঢাকা। কপালে চন্দনের তিলক, টিকিতে চাঁপাফুল বাঁধা।

এ রাজ্যে গগন আচার্য বোধহয় সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। অনেক চাষের জমি। বাঁশ আর হোগলার বন।

মাঝে মাঝে দরকার হলে রাজাও তার কাছে টাকা ধার করে।

তার উল্টো দিকের বেঞ্চে মন্ত্রীর পাশে অশ্বানন পণ্ডিত। কদাকার চেহারা। মুখের দিকে চোখ তুলে দেখা যায় না। লাল চেলিতে দেহ আবৃত।

NOT FOR SALE

রাজা ঢুকতেই মন্ত্রী দাঁড়িয়ে উঠে বলল, আদেশ করুন, তর্কযুদ্ধ শুরু হোক।

রাজা একবার সভার দিকে চোখ ফেরাল। সভায় টুঁ শব্দ নেই। সবাই উদ্‌গ্রীব। রাজা জানে, পর্দার ওপারে একটা প্যাকিং বাক্সের উপর পাশাপাশি বড় রাণী আর ছোট রাণী। জ্বর গায়েও বড় রাণী উঠে এসেছে। এমনই উৎসাহ।

রাজা নিজের ডান হাতটা ওপরে তুলল।

মন্ত্রী অশ্বাননের দিকে ফিরে বলল, হে মহাপণ্ডিত, আপনিই আরম্ভ করুন।

অশ্বানন পৈতা বের করে গায়ত্রী করল। তারপর গগনকে সম্বোধন করে বলল, আমি একটা মাত্র প্রশ্ন আপনাকে করব, তার যথাযথ উত্তর যদি আপনি দিতে পারেন, তা হলে আমি পরাজয় স্বীকার করে চলে যাব।

গগন আচার্য কোনো উত্তর দিল না। শুধু ট্যাঁক থেকে নস্যির কৌটা বার করে দু নাকের ফুটোয় দু মুঠো নস্যি ঢুকিয়ে দিল।

অশ্বানন চারদিকে চেয়ে দেখল। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বলল ঃ আচ্ছা বলুন, এ শ্লোকের অর্থ কি?

'লোকের মুখে মুখে ধরাধামে কষ্টং
হেথায় বসতি করে মনুষ্য উষ্ট্রং।'

সভা একেবারে চুপ। এ যে উদ্ভট শ্লোক রে বাবা। গগন আচার্য আর একবার নস্যি নিল। সকলের দৃষ্টি তার দিকে।

উঠে দাঁড়িয়ে রাজা আর মন্ত্রীকে নমস্কার জানিয়ে গগন অশ্বাননের দিকে ফিরে বলল, আপনি শ্লোকে প্রশ্ন করছেন, আমি শ্লোকেই তার উত্তর দিচ্ছি। শুনুন—

'মনুষ্য উষ্ট্রং বিবর্জিত মুখে
তুরঙ্গ মুখ নয়ন সম্মুখে।'

উত্তর শুনে অশ্বাননের মাথা হেঁট। উঠে পড়ে দ্রুত পলায়ন করল। পালাবার পর দেখা গেল তার খড়মজোড়া পড়ে আছে। গগন আচার্য সেই জোড়া খড়মের দখল নিল।

অশ্বানন পালাতেই সবাই বুঝে নিল তার হার হয়েছে। একসঙ্গে রামশিঙা ঢাক ঢোল কাঁসর বেজে উঠল। শব্দে কান পাতা দায়।

রাজা হাত তুলে বলল, সাধু। সাধু।

এগিয়ে গিয়ে নিজের গলা থেকে শামুকের মালা খুলে গগনের গলায় পরিয়ে দিয়ে বলল, তোমার ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না গগন।

গগন আঁতকে উঠে বলল, এমন কথা বলবেন না রাজামশাই, মারা যাব। এখনও ছাব্বিশ টাকা তিন আনা বাকী।

NOT FOR SALE

সবাই চলে গেলে রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, কি হল বল তো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না।

রাজার বিদ্যা পাঠশালার গণ্ডী পার হয়নি। লেখাপড়ার ব্যাপার চট করে তার মাথায় আসে না।

মন্ত্রী বলল, বুঝলেন না, আমাদের গগনকে অশ্বানন মানুষ উট বলে ঠাট্টা করল। উটের পিঠের মতন গগনের পিঠেও কুঁজ। গগন আবার উল্টে অশ্বাননকে ঘোড়ামুখো বলে পরিহাস করল। অশ্বানন মানেই তাই।

মানেটা বুঝে রাজার হাসি আর থামে না। হো-হো, হা-হা, হি-হি, উঃ।

উঃ শুনে মন্ত্রী বলল, কি হল?

আঃ, সিংহাসনের পেরেকটা আবার উঠেছে। রক্ত বের করে দিয়েছে।

তারপর কিছুদিন এভাবে চলল। রাজা উকুন বাছে। দামিনী হাটে গেলে উনুন ধরায়। রাণীরা অসুস্থ হয়ে পড়লে রান্নাও করে।

হঠাৎ আবার এক উপদ্রব।

রাজা ঘরে খেয়েদেয়ে দুপুরে একটু ঘুমাবার আয়োজন করছে। ছোট রাণী এসে ডাকল, সেনাপতি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

বার কয়েক ডাকাডাকির পর বিরক্ত মুখে রাজা উঠে বসল। সব শুনে বলল, সেনাপতি এসেছে ঠিক দেখেছ তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ। পরনে গেঞ্জি আর মালকোঁচা দেওয়া ধুতি।

সর্বনাশ। আবার কি ঘটল?

রাজা সিঁড়ি দিয়ে নেমে দেখল। সেনাপতি দাঁড়িয়ে আছে।

রাজাকে দেখে সেনাপতি নমস্কার করে বলল, প্রভু, গুপ্তচর।

সে কি! গুপ্তচর এল কোথা থেকে? তাকে আটক করা হয়েছে? সব ভুলে রাজা সিঁড়ির উপরই বসে পড়ল।

সেনাপতি বলল, সবিস্তারে বলছি। শুনুন হুজুর। আমার মাছ ধরার নেশা আছে, জানেন তো? ভোরবেলায় পদ্মদীঘিতে জাল ফেলে এসেছিলাম। দুপুর বেলায় ছিপ নিয়ে বসেছি। হঠাৎ দেখি দীঘির ওপারে একটা লোক। পরনে শুধু লেংটি। বসে বসে আমাকে নিরীক্ষণ করছিল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই কচুবনের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল।

লোকটা যে গুপ্তচর কি করে বুঝলে?

তাছাড়া আর কে? এ রাজ্যের প্রত্যেকটি প্রজাকে আমি চিনি। এ লোকটা এ রাজ্যের কেউ নয়। গোপন খবরও পেয়েছিলাম। নয়নপুরের রাজার এ রাজ্যের উপর লোভ। লোকটা নিশ্চয়ই নয়নপুরের গুপ্তচর।

লোকটাকে গ্রেপ্তার করেছ? রাজা হুঙ্কার ছাড়ল।

NOT FOR SALE

কি করে গ্রেপ্তার করি হুজুর? লোকটার কাছে কি অস্ত্রশস্ত্র আছে কিছুই জানা নেই। আমার সম্বল শুধু একটা পেনসিল কাটার ছুরি। আমার কিছু হয়ে গেলে, রাজ্যের এই বিপুল বাহিনী কে চালনা করবে হুজুর?

রাজা স্বীকার করল, যথার্থ কথা। কিন্তু কি করা যায়?

এক কাজ করি। কিছু সৈন্য নিয়ে ওকে গ্রেপ্তার করি আমি।

লোকটা কি এখনও তোমার জন্য অপেক্ষা করছে?

সেনাপতি আর কিছু না বলে ছুটে চলে গেল। বিকাল নাগাদ হইচই চিৎকারে রাজা প্রাসাদের দ্বারে এসে দাঁড়াল।

পিছনের দরজাটা খোলা রাখল। যদি নয়নপুরের সৈন্যদের আক্রমণের ব্যাপার হয়, তাহলে রাণীদের নিয়ে পালাবার চেষ্টা করবে।

দূর থেকে সেনাপতিকে দেখা গেল।

তার পিছনে গোটা চার সৈন্য নেংটি-পরা কানা একটি লোককে কাঁধে করে নিয়ে আসছে। সাহস পেয়ে রাজা এগিয়ে গেল।

কি ব্যাপার?

মন্ত্রী বলল। গুপ্তচরকে পাকড়াও করা হয়েছে হুজুর। আমাদের সৈন্যদের হুঙ্কারে লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে।

রাজা বলল, লোকটার চোখে মুখে জল ছিটিয়ে আগে জ্ঞান ফিরিয়ে আন। তারপর নিয়ে এস রাজসভায়। আনবার আগে ভাল করে দেখে নিও সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র আছে কিনা?

রাজা যখন রাজসভায় গেল তখন লোকটার জ্ঞান ফিরে এসেছে। সে দাঁড়িয়ে, আর সৈন্যরা তাকে ঘিরে রয়েছে।

গুপ্তচর ধরা পড়েছে শুনে রাজ্যের লোকেরা ছুটে এসেছিল। কিন্তু এসে যখন দেখল, গুপ্তচর দু-হাত দু-পাওলা একজন সাধারণ মানুষ। তখন হতাশ হয়ে ফিরে গেছে।

রাজা সিংহাসনে বসে জিজ্ঞাসা করল, এর সঙ্গে কিছু ছিল না?

মন্ত্রী উত্তর দিল, শুধু একটা ঝুড়ি পাওয়া গেছে। এই সেই ঝুড়ি।

রাজা দেখল, সাধারণ একটা বেতের ঝুড়ি।

তুমি কি গুপ্তচর?

লোকটা দুটো হাত বুকের উপর জোড় করে বলল, আজ্ঞে হুজুর, আমার নাম কেনারাম।

তুমি তো নয়নপুরের প্রজা। এ রাজ্যে এসেছিলে কেন?

আজ্ঞে কলমি শাকের জন্য।

কলমি শাক? তার মানে?

NOT FOR SALE

আমাদের রাণীর মাথা গরম। কবিরাজ বলেছে কেবল কলমি শাকের ঝোল খেতে। তাই সবাই বেরিয়ে পড়েছে কলমি শাকের খোঁজে। নয়নপুরে আর কলমি শাক নেই। তাই হুজুর এ রাজ্যে এসেছিলাম কলমি শাক তুলতে।

রাজা একটু ভাবল। ফিসফিস করে মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করল। তারপর বলল, তোমার শাস্তি হচ্ছে যতদিন বাঁচবে এ রাজ্যে থাকতে হবে। আমার কাছে কাজ করতে হবে। বাটনা বাটা, উনান ধরানো, রান্নাবান্না করা, প্রাসাদ ঝাড়ামোছা, উদ্যানের দেখাশুনা। দামিনীর বয়স হচ্ছে। সে আর পারছে না। শুধু সে হাট-বাজার করবে। এটা সে ছাড়বে না। মাইনে পাবে না। শুধু খাওয়া-পরা। রাজী?

লোকটা রাজার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে বলল, খুব রাজী হুজুর। আজ থেকেই ভর্তি করে নিন।

আর একটা কথা। রাজার মনে পড়ে গেল।

বলুন হুজুর!

উকুন বাছতে পার?

ওটাই সবচেয়ে ভাল পারি। আজ্ঞে দিনরাত্রি করালীর উকুন বাছতাম।

করালী কে?

লোকটা লজ্জায় জিভ কেটে উত্তর দিল, আজ্ঞে আমার বউ।

—সমাপ্ত—

NOT FOR SALE

বাঘ-বাঘিনী

মাথায় শোলার হ্যাট। চোখে কালো চশমা। সরু মুখের তুলনায় বিরাট পাকানো গোঁফ। মনে হয় একসময়ে শরীর খুব পরিপুষ্ট ছিল, ইদানীং শীর্ণ, তাই কোট প্যান্ট একটু বেঢপ। পিছনে কুলির মাথায় বাক্স। বাক্সের উপর বন্দুক।

দুই মামার সঙ্গে স্টেশনে আমি গিয়েছিলাম। না গিয়ে পারিনি। দিন পনের ধরে বাড়িতে হাবু সান্যালের নাম শুনছি। শুধু কি নাম, তার প্রায় অলৌকিক সব শিকার-কাহিনী।

মাস ছয়েকের উপর এ তল্লাটে জোড়া বাঘের উপদ্রব শুরু হয়েছে। ঠিক বলতে, একটা বাঘ আর একটা বাঘিনী।

এদিকে সাত জন্মে বাঘের ঝামেলা ছিল না। জঙ্গল অবশ্য ছিল, বেশ নিবিড় জঙ্গল। সেখানে হরিণ ছিল, ময়ূর ছিল আর সাপখোপ তো ছিলই—কিন্তু বাঘের কথা কোনোদিন শোনা যায়নি।

এখান থেকে মাইল সাতেক দূরে চকদিঘির জঙ্গল। সেই জঙ্গল পরিষ্কার করে উদ্বাস্তু কলোনী হল। উদ্বাস্তুরা এসে বাঘকে উদ্বাস্তু করল।

মধ্যপ্রদেশের বাঘ আকৃতিতে ছোট, কিন্তু প্রকৃতিতে দুর্দান্ত।

বাছাকে তেল মাখিয়ে উঠানে রোদে দিয়েছে। পাঁচিল ডিঙিয়ে বাঘ লাফিয়ে পড়ে বাছাকে মুখে নিয়ে উধাও।

একটু পরে লছমনের বউ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখে, বাছা নেই। তার জায়গায় রক্তের ফোঁটা।

তার চিৎকারে চারধার থেকে লোক এসে জুটল। খোঁজ। খোঁজ। খোঁজ। অনেক খোঁজাখুঁজির পর আড়াই মাইল দূরে এক ডোবার ধারে কিছু হাড়গোড় পাওয়া গেল।

লোকেরা বলল, বাঘ নয়। এ বাঘিনীর কাজ। বাঘের চেয়েও বাঘিনী দুঃসাহসিক হয় বেশী।

কিছুদিন পর আবার এক ঘটনা।

সূর্যগ্রহণ। এখানে বড় নদী নেই কাছাকাছি। ছোট পাহাড়ী নদী। লোকেরা স্নান করার জন্য সেখানেই ভিড় করল। দলে দলে জলে নামল। গোটা দুয়েক

NOT FOR SALE

পুরোহিতও ছুটে গেল। টিকিতে ফুল, মুখে সংস্কৃত। গ্রহণের পর স্নান করলে বুঝি পুনর্জন্ম হয় না। পৃথিবীর মায়ামোহ থেকে মুক্তি। বুড়ো পুরোহিত রঘুবীর তাই বোঝাচ্ছেন। পূর্ণ গ্রাস। চারদিকে বেশ অন্ধকার। রঘুবীর চোখ বন্ধ করে দুনিয়ার অনিত্যতা সম্বন্ধে শ্লোক আওড়াচ্ছিল। হঠাৎ পাশের ঝোপ থেকে হলুদ বিদ্যুতের শিখা। অত লোকের মাঝখান থেকে রঘুবীরকে মুখে তুলে জঙ্গলের মধ্যে মিশে গেল।

চারদিকে ছোটাছুটি চেঁচামেচি। যে যেভাবে ছিল সেভাবে দৌড়তে শুরু করল।

এবারেও সবাই বলল, বাঘিনীর কাজ। এত সাহস বাঘের হবে না। সকলেরই ধারণা ছিল, একটা বাঘিনী এইসব অত্যাচার করে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু মুলকিরাম অন্য কথা বলল।

মুলকিরাম জঙ্গলে গাছের ডালপালা ভেঙে আনতে যায়। রোজকার মতন সেদিনও গিয়েছিল। হঠাৎ বন কাঁপিয়ে ঝড় উঠল। একটু পরেই বৃষ্টি। তুমুল বৃষ্টি। একহাত দূরের জিনিস দেখার উপায় নেই। বেগতিক দেখে কাঠের বাণ্ডিল রেখে মুলকিরাম একটা গাছের ওপর চড়ে বসেছিল।

সেখানেই কি নিস্তার আছে! ঝড়ের বেগে মনে হল গাছটাই উপড়ে পড়বে। ধুতির কিছুটা খুলে একটা ডালের সঙ্গে মুলকিরাম নিজেকে বাঁধল।

ঝড়-জল যখন থামল, তখন রাত অনেক। মেঘ কেটে গেল। আকাশে জ্যোৎস্না ফুটল। নেমে আসা যুক্তিযুক্ত নয়। মুলকিরাম ঠিক করল ভোর না হওয়া পর্যন্ত গাছের ওপরই বসে থাকবে।

সেই সময় চোখে পড়ল একটা বাঘ আর একটা বাঘিনী। পাশাপাশি। এমনভাবে বেড়াচ্ছে যেন জঙ্গলের জমিদারি দেখতে বেরিয়েছে। ঝড়-জলে কতটা ক্ষতি হয়েছে তার তদারক।

মুলকিরাম ফিরে এসে প্রচার করেছিল, শুধু বাঘিনী নয়, বাঘও আছে।

সবাই শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল। সর্বনাশ। একটা নয়। একজোড়া। বাঘ আর বাঘিনী যখন আছে, তখন পুরো একটা সংসার গড়ে উঠতে আর কতক্ষণ। সে সময় এখানে বাস করাই দায় হবে।

তাই সবাই মিলে একজোট হয়ে মামাদের কাছে এসেছিল।

দুই মামা জঙ্গলের ঠিকাদার। ইজারা দিয়ে কাঠ কেটে ট্রেনে লরিতে বাইরে চালান দেয়।

সবাই বলল, বাঙালীবাবু, বিপদ থেকে বাঁচান। না হলে এতদিনের বাস উঠিয়ে নিয়ে পালাতে হবে।

বড়মামার একটা বন্দুক ছিল, কিন্তু সেটা মামারা কখনও ব্যবহার করে না। দুই মামাই বৈষ্ণব। মাছ, মাংস, ডিম বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢোকে না। পেঁয়াজ

NOT FOR SALE

রসুনের গন্ধ নাকে গেলে, সেদিন খাওয়া বন্ধ। কজেই প্রাণীহত্যার প্রশ্নই আসে না।

ডি এফ ও সায়েব অনেক বুঝিয়ে বন্দুকের লাইসেন্স করিয়ে দিয়েছিল। বন্দুকও কিনিয়েছিল। কিন্তু ওই পর্যন্ত। বন্দুকে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে মামারা সেটাকে শ্রীকৃষ্ণের ছবির তলায় রেখে দিয়েছিল। উদ্দেশ্য বোধহয় শোধন করা। বন্দুকের আগের মালিক যদি এটা দিয়ে প্রাণীবধ করে থাকে তাহলে সেই পাপক্ষয়। সন্ধ্যার দিকে বড়মামী ধূপধুনো দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বন্দুকেরও আরতি করে।

ভয় পেয়ে এই লোকগুলো সত্যি সত্যি যদি পালায়, তাহলে মামাদের মুস্কিল। এরাই কুলির কাজ করে। লোকগুলো চলে যেতে সভা বসল। ঘরোয়া সভা। দুই মামা, বড়মামী ও আমি। ছোটমামার বিয়ে হয়নি। আর আমি কলকাতা শহরে সব অফিসের দরজায় মাথা ঠুকে ঠুকে হতাশ হয়ে মামাদের কাছে চলে এসেছি। ঠিকাদারি কাজ শেখবার আশায়।

বড়মামা বলল, দুটো বাঘ মারা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। আমিই পারতাম। তবে এক মুস্কিল হয়েছে, আমরা বৈষ্ণব বংশ। প্রাণীহত্যা নিষেধ। তাছাড়া মন্ত্র নেবার সময় গুরুদেব কানে কানে বলেও দিয়েছিলেন। বাঘ তো বড় ব্যাপার। ছারপোকাও যেন না মারি। বড়মামী খিঁচিয়ে উঠল, বড় কর্মই কর্ম। খাটে শুয়ে আমার প্রাণ যায়। সারারাত ছারপোকার কামড়ে ঘুমাতে পারি না।

ছোটমামা বলল, মারবার কি দরকার। আমি তো আমার খাট ঠুকে ঠুকে সব ছারপোকাগুলো ধরে বাগানে গর্ত খুঁড়ে মাটি চাপা দিয়ে দিই।

বড়মামা কথাটা শুনে চমকে উঠল। বলল, সে কিরে, প্রাণীহত্যা?

হত্যা কেন হবে? সমাধি। বৈষ্ণব মতে।

মামী বলল, ছারপোকার কথা থাক। বাঘের কথা বল।

বড়মামা বলল, রবার্ট সায়েব যে বিলেত চলে গেছে, নইলে এসব পুঁচকে বাঘ মারার আবার চিন্তা। রবার্ট সায়েব শুয়ে শুয়ে বাঘ মারত।

আমি এতক্ষণ কোনো কথা বলিনি। চুপচাপ বসে বসে শুনছিলাম। বাঘ মারবার এমন পদ্ধতির কথা শুনে রীতিমত চমকে উঠলাম।

শুয়ে শুয়ে বাঘ মারা!

হ্যাঁ—বড়মামা বলল—ডুয়ার্সের জঙ্গলে বসে বসে ক্লান্ত হয়ে রবার্ট সায়েব শুয়ে পড়েছিল। হঠাৎ মাঝরাতে বাঘের ডাক। পকেট থেকে আয়না বের করে রবার্ট সায়েব বাঘের অবস্থান দেখে নিল; তারপর পা দিয়ে ট্রিগার টিপল। গুলি একেবারে বাঘের টাগরায়। বেচারী যাবার সময়ে ভগবানের নাম করার সময় পেল না। নৃশংসভাবে হত্যা, সন্দেহ নেই। রবার্ট সায়েবের

NOT FOR SALE

কাছে ঘটনাটা শুনে আমি অহোরাত্র কীর্তন করে কাটিয়েছিলাম। কানে শুনলেও পাপ হয়।

কথাটা ছোটমামার হঠাৎ মনে পড়ে গেল— আচ্ছা দাদা, হাবু সান্যাল কোথায়?

বড়মামা প্রথমে ঠিক চিনতে পারেনি। জিজাসা করল— কে হাবু সান্যাল?

রবার্ট সায়েবের সঙ্গে ঘুরত বনে-বাদাড়ে। বিলাত যাবার সময় রবার্ট সায়েব তার রাইফেলটা হাবু সান্যালকে দিয়ে গিয়েছিল।

ও, মনে পড়েছে। চরকি বাগানের হাবুদা। কিন্তু তার ঠিকানা পাবি কোথায়?

দিন কয়েক আগে বাংলা খবরের কাগজে দেখছিলাম, এক শিকারী পরিষদ হয়েছে। হাবুদা তার সভাপতি। মনে হয় সেই ঠিকানায় চিঠি লিখলেই হবে।

বেশ, দে লিখে।

ছোটমামা খুঁজে খুঁজে খবরের কাগজ বের করেছিল। সেখান থেকে চিঠি হাবু সান্যালকে।

যখন সকলে ভেবে নিয়েছিল হাবু সান্যাল আর আসবে না, তখন তার টেলিগ্রাম এল।

সামনের বুধবার পৌঁছাচ্ছি। স্টেশনে থেকো।

বড়মামা আর ছোটমামা দুজনের স্টেশনে যাবার কথা হয়েছিল। তাই আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, এটি কে?

বড়মামা বললে, ভাগ্নে। বি.কম. পাশ করে বসেছিল, আমরা নিয়ে এসেছি।

চারজনে টাঙায় উঠলাম। কিছুটা ফাঁকা রাস্তার পর টাঙা জঙ্গলে ঢুকল। সরু পথ। আমি সামনে বসেছিলাম। চালকের পাশে। সেখান থেকেই কথাবার্তা কানে গেল।

হাবু সান্যাল চুরুট ধরাতে ধরাতে বলল—সাতকড়ি লিখেছিল জোড়া বাঘের কথা। জোড়া বাঘ মানে কি যমজ বাঘ? একসময়ে হয়েছে?

বড়মামা মাথা নাড়ল, যমজ কিনা জানি না, কারণ জন্মাবার সময় আমরা কেউ ছিলাম না। বাঘেরা বোধহয় ঠিকুজি রাখে না। জোড়া বাঘ মানে—বাঘ আর বাঘিনী। তাই না সাতকড়ি?

সাতকড়ি অর্থাৎ ছোটমামা মাথা নাড়ল। ঠিক তাই।

রয়েল বেঙ্গল?

হাবু সান্যালের প্রশ্নের উত্তরে বড়মামা বলল, রয়েল বেঙ্গল এখানে আসবে কোথা থেকে? রয়েল মধ্যপ্রদেশ?

হাবু সান্যাল হাসল। তাচ্ছিল্যের হাসি। রয়েল বেঙ্গল আসতে পারে না মানে? বাঘের অগম্য স্থান নেই, অসাধ্য কাজ নেই। আমি তখন নাগপুরে। আকোলার জঙ্গলে বুনো হাতি শিকার করে ফিরছি। কলকাতা থেকে বাঁধাকপির

NOT FOR SALE

বস্তা আসছে। নামিয়েই স্টেশন মাস্টার হতভম্ব। নীচে বাঁধাকপি, ওপরে বাঁধাকপি, মাঝখানে রয়েল বেঙ্গল।

সেকি! বড়মামা আর ছোটমামা দুজনেই একসঙ্গে চমকে উঠল।

কি করে যে এল ঈশ্বর জানেন। থলি খুলতেই দুলকি চালে হেঁটে হেঁটে সাইকেল রিকশায় গিয়ে বসল। উদ্দেশ্য, বোধহয় কাছাকাছি কোন হোটেলে গিয়ে উঠবে। দু সেকেণ্ডের মধ্যে অতবড় নাগপুর স্টেশন ফাঁকা। কেউ কোথায়ও নেই। রয়েল বেঙ্গল কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বিরক্ত হয়ে রিকশা থেকে নেমে পড়ল। ততক্ষণে আমি রাইফেল নিয়ে তৈরি। রাস্তা পার হবার আগেই গুড়ুম। চোয়াল দিয়ে ঢুকে বুলেট ব্রেনে গিয়ে আটকাল। ব্রেন ড্যামেজড্ হলে মানুষই আবোল-তাবোল কাণ্ড করে, আর এ তো বাঘ। সটান আমার পা দুটো জনিয়ে ধরল। তারপর ব্রাহ্মণের পায়ে মাথা রেখে অন্তিম নিঃশ্বাস।

ঘটনাটা বর্ণনার ভঙ্গীতে আমার হাসি পেয়ে গিয়েছিল। হাসিটা উচিত না ভেবে কষ্টে আমি নিজেকে সংযত করলাম।

বাড়ি এসে পৌঁছলাম।

উঁকি দিয়ে একবার হাবু সান্যাল বলল, বাঃ বেশ বাংলো তো। নিজের, না ভাড়া?

বড়মামা বলল, না, নিজের নয়, ভাড়া। নিজেদের সুবিধামত একটু অদল-বদল করে নিয়েছি।

সবাই নামলাম। বাক্স বন্দুক নামানো হল।

বাইরের ঘরে চেয়ারে বসে হাবু সান্যাল হুকুম দিল, আমাকে এক কাপ কফি, কফি ছাড়া ট্রেন জার্নির ক্লান্তি যাবে না।

মামী একটু পরেই কফি আর একগাদা বিস্কুট নিয়ে এল।

মামারা পোশাক ছাড়তে ভিতরে গিয়েছিল। আমি বসেছিলাম।

হাবু সান্যাল দূরের জঙ্গলের দিকে দেখছিল। চোখ ফিরিয়ে বলল, কে, তুমি কে?

মামী লজ্জায় আর কথা বলতে পারল না। আমি বললাম, আমার বড়মামী।

ও, পাঁচকড়ির বৌ। তোমার বিয়েতে আমি গিয়েছিলাম। তোমার বাপের বাড়ি সোদপুর, তাই না?

মামী মাথা নাড়ল। সম্মতিসূচক।

তোমাকে খুব রোগা দেখেছি। একেবারে প্যাঁকাটির মতন। এখন, বলতে নেই, বেশ শাঁসে-জলে হয়েছ। বোঝা যাচ্ছে জায়গাটার জলহাওয়া ভাল।

মামী লজ্জায় মাথা নিচু করে পালাল।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে হাবু সান্যাল বলল, ওহে, কি নাম তোমার? তুমি জোড়া বাঘ দেখেছ?

NOT FOR SALE

আমি বললাম, না। সে সৌভাগ্য আমার হয়নি।

সৌভাগ্য? সাহিত্যের ভাষায় কথা বলছ যে? লেখ-টেখ নাকি?

সবিনয়ে বললাম, যা লিখি তা সাহিত্য নয়, মামাদের হিসাবের খাতা।

হু, আজ বিকালে একবার জঙ্গলটা দেখে আসতে হবে। বাঘ দুটো কোথায় ঘোরাফেরা করতে পারে সেটা জানা দরকার।

আমি মুখ তুলেই গম্ভীর হয়ে গেলাম। পাকানো গোঁফের মাঝে মাঝে বিস্কুটের গুঁড়ো। দুই-এক জায়গায় কফির ফোঁটা। পাছে হেসে ফেলি সেই ভয়ে বললাম, আমি একটু আসছি।

এরপর যখন হাবু সান্যালের সঙ্গে দেখা হল, তখন সে হাঁটুর ওপর ছোট গামছা ঝুলিয়ে কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে তেল মাখছে। জীর্ণ চেহারা। পাঁজরের হাড় গোনা যায়। পৈতাটা মালার আকারে গলায়।

চাকর-বাকরের কল্যাণে তল্লাটে রটে গিয়েছিল, কলকাতা থেকে জাঁদরেল শিকারী এসেছে।

চেহারা রোগা হলে হবে কি! দুপুরে খাওয়ার বহর দেখে আমার চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল। মামারা বৈষ্ণব। তাই একটু দূরে উঠানে গর্ত খুঁড়ে মাছ মাংস রান্নার আয়োজন করা হয়েছিল। স্তূপাকার ভাত। বেড়াল তো তুচ্ছ, মাঝারি আকারের কুকুরও ডিঙোতে পারবে না। আধখানা পাঁঠার ঝোল। মুরগীর কাটলেট গোটা ছয়েক। বড় বড় মাছের টুকরো। এছাড়া মামী নিজের হাতে পায়েস আর সন্দেশ তৈরি করেছিল। একাধারে শাক্ত আর বৈষ্ণবের এমন সমাবেশ। অন্তত আহার্যের দিক দিয়ে, এর আগে আর আমি দেখিনি।

বিকালে হাবু সান্যালের সঙ্গে ছোটমামা আর আমি বের হলাম।

হাবু সান্যালের হাতে রাইফেল। সতর্ক পদক্ষেপ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। একটা গাছের পাতা পড়লেই চমকে উঠতে লাগল। একবার তো একটা কাঠবিড়ালি তরতর করে নেমে পড়তেই দুই হাত লাফিয়ে উঠল।

বোধহয় নিজের আচরণের কৈফিয়ত দেবার জন্যই বলল, শিকারীকে সব সময় চোখ কান খাড়া রেখে চলাফেরা করতে হয়। একটু অসতর্ক হলেই সর্বনাশ। আমি তো উড়িষ্যার জঙ্গলে একটুর জন্য বেঁচে গিয়েছিলাম।

তখনই হাবু সান্যাল কিছু বলল না। পাছে জঙ্গলের শিকার কাহিনী বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

বাড়িতে ফিরে বলল। ময়ূরভঞ্জের ছোট তরফের আমন্ত্রণে গিয়েছি। একটা চিতা নাকি ভীষণ জ্বালাতন করছে। প্রাসাদের চৌহদ্দির মধ্যে হানা দিয়েছে।

NOT FOR SALE

একটা গাছে মাচা বেঁধে অপেক্ষা করছি। হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কায় মাথার শোলার টুপিটা ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। চমকে ফিরে দেখি পাতার আড়ালে দুটো নীলচে চোখ ধকধক করে জ্বলছে। তার মানে চিতাটা আমার আগেই গাছে উঠে বসে আছে। গাছে উঠবার সময় একটু অন্যমনস্ক ছিলাম, তাই এই বিপত্তি। ভাগ্যে টুপিটা মাথায় ছিল, না হলে চিতার থাবায় আমার খুলিটাই উড়ে যেত। তখনই বন্দুক ঘুরিয়ে গুলি করলাম। অব্যর্থ লক্ষ্য। গাছের ডাল আঁচড়াতে আঁচড়াতে চিতা মাটিতে পড়ে গেল।

অবাক হয়ে শুনলাম।

বড়মামা বলল, আপনি জোড়া বাঘের একটা ব্যবস্থা করে দিন। এখানকার লোকেরা তাহলে দুহাত তুলে আপনার জয়গান করবে। প্রধান আজ আসবে, আপনার সঙ্গে কথা বলবে।

সন্ধ্যা নাগাদ প্রধান এল। সঙ্গে দুইজন অনুচর।

হাবু সান্যাল বলল, একটা পরিপুষ্ট পাঁঠা দরকার। 'কিল' হিসাবে। আর গাছের ওপর শক্ত একটা মাচা।

প্রধান বলল, ঠিক আছে, করে দেব। কোন গাছে আসন করবেন, সেটা জানিয়ে দিন।

ঝরণার ধারে যে ঝাঁকড়া ঘোড়ানিমগাছ আছে তার উঁচু ডালে মাচা বেঁধো। তলায় একটা খুঁটিতে পাঁঠাটাকে।

সব ঠিক হল।

হাবু সান্যাল বলল, আমার সঙ্গে মাচায় কে থাকবে? একজন সঙ্গে থাকা দরকার।

দুই মামাই হাতজোড় করল, আমাদের মাপ করতে হবে। জানেন তো নামকরা বৈষ্ণব বংশের সন্তান। এইসব রক্তারক্তি ব্যাপার চোখে দেখতে পারব না।

তাহলে?

আমি বললাম, আমি যাব। অবশ্য আমি কোনদিন শিকারীর সঙ্গে মাচায় বসিনি।

কিন্তু তুমিও তো বৈষ্ণবের ভাগ্নে।

ছোটমামা বলল, ও বৈষ্ণব নয়, শাক্তও না। স্টেশনের কাছে যে হোটেল আছে, সেখানে সপ্তাহে দুই দিন নিষিদ্ধ মাংস খেয়ে আসে। ভাগ্নে একেবারে ম্লেচ্ছ।

ঠিক আছে। ওই তাহলে আমার সঙ্গে যাবে। আর কিছু নয়, আমার ঘুম একটু বেয়াড়া। বাঘ কিংবা বাঘিনী যদি গাছের তলায় আসে, তাহলে আমাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দেবে। ব্যস্, আর কিছু করতে হবে না।

NOT FOR SALE

ব্যবস্থা সব ঠিক হল।

এক গুলিতে দুটো বাঘ জখম করে দেবে। সবাই ভিড় করে দেখতে এসে হতাশ হল। এই চেহারা! এ বাঘ মারবে কি? তবে একটা সুবিধা আছে, বাঘ এই রোগা চেহারার দিকে ফিরেও দেখবে না। ছিটেফোঁটা মাংস নেই। শুধু হাড়ে বাঘের মেহনত পোষাবে না।

দুপুরবেলা আমার ঘুম ভেঙে গেল।

বাড়ির পিছনে মামাদেরই একটা কাঠ চেরাইয়ের কারখানা আছে। জঙ্গলের কাঠ এনে এখানে চেরাই হয়। কিন্তু দিন তিনেক তো মেশিন বন্ধ আছে। কারণ চেরাই করার মতো কোনো কাঠ জমেনি। তবে?

বিছানা ছেড়ে উঠেই ভুল ভাঙ্গল। শব্দ আসছে পাশের ঘর থেকে। উঁকি দিয়ে দেখেই অবাক হলাম।

ক্রু-উ-উ ফো। ক্রু-উ-উফো। হাবু সান্যাল চিত হয়ে শুয়ে। দুটো হাত বুকের উপর। নিশ্বাসের তালে তালে গোঁফজোড়া কাঁপছে আর ওই রকম শব্দ হচ্ছে।

শিকারের দিন হাবু সান্যাল আহারের পরিমাণ ডবল করে দিল। আমাকে বলল, বুঝল ভাগ্নে, পেটভরে না খেতে পারলে কিছু করার উপায় নেই। পেটে খালি জায়গা থাকলেই সেখানে ভয় এসে ঢোকে। শরীর দুর্বল হলে বন্দুক তুলতেই পারবে না। রবার্ট সায়েব এ কথা বলত। এরকম শিকারী আর জন্মায়নি।

আমি মূর্খের মতো বলে ফেললাম, জিম করবেট? হাবু সান্যালের গোঁফ কেঁপে উঠল। একটা চোখ বন্ধ করে বলল, দূর, কার সঙ্গে কার তুলনা। করবেট রবার্ট সায়েবকে চিঠি লিখে বাঘ মারার কায়দাকানুন সব জেনে নিত। বাঘ মেরে কত চামড়া যে রবার্ট সায়েবকে উপহার দিয়েছে তার ঠিকানা নেই।

বিকালেই রওনা হয়ে গেলাম। সঙ্গে হাওয়াই, তোশক ও বালিশ। ফুঁ দিয়ে ফোলানো যায়। ফ্ল্যাস্কে কফি, প্যাকেট বিস্কুট। একটা হাতপাখা।

মামী জিজ্ঞাসা করেছিল, হাতপাখা কি করবেন?

হাবু সান্যাল মামীর অজ্ঞতায় হেসে বলেছিল, মাঝে মাঝে জঙ্গলেও গুমোট গরম পড়ে। একতিল বাতাস থাকে না। সে সময় কাজে লাগবে। ঘেমে অস্থির হলে আর নিশানা করব কি করে?

আমাদের সঙ্গে গোটাকয়েক আদিবাসী গিয়েছিল। তারা থাকবে না, জায়গা দেখিয়ে দিয়েই চলে আসবে।

গাছের তলায় গিয়েই হাবু সান্যাল ক্ষেপে লাল— এত ওপরে মাচা বেঁধেছিস কেন? একেবারে মগডালে?

NOT FOR SALE

একজন আদিবাসী ভয়ে ভয়ে বলল, আজ্ঞে, বাঘ খুব লাফায়। লাফিয়ে আপনাদের নাগাল যেন না পায়, সেজন্য উঁচুতে মাচা বেঁধেছি।

হুঁ, নাক দিয়ে হাবু সান্যাল অবজ্ঞাসূচক এক শব্দ করে বলল, অমনি লাফালেই হল? এ কি অলিম্পিক খেলা নাকি? হাতে বন্দুক রয়েছে কি করতে?

আমি ডাল ধরে কোনোরকমে ওপরে উঠে পড়লাম। সমস্যা হল হাবু সান্যালকে নিয়ে। অনেক চেষ্টা করেও উঠতে পারল না। শেষকালে তার কোমরে দড়ি বেঁধে কপিকলের মতো উপরে তোলা হল। মালপত্রও সেইভাবে।

মাচায় বসেই হাবু সান্যাল ফ্লাস্ক খুলে কফি খেল। বিস্কুট দিয়ে। কিছু না খেলে প্রাণ বাঁচবে না।

আমি গাছে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। অনেক দূরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। পশ্চিম আকাশে মুঠো মুঠো আবির ছড়িয়ে।

একটু একটু করে অন্ধকার নামল। পাখিরা কুলায় ফিরে এল। ঝোপে ঝোপে জোনাকির চুমকি। হঠাৎ হাবু সান্যাল প্রশ্ন করল, তোমরা যে বললে একজোড়া বাঘ। অতগুলো চোখ জ্বলছে কেন?

আমি বললাম, ওগুলো বাঘের চোখ হবে কেন, ও তো জোনাকি।

বিরক্ত কণ্ঠে হাবু সান্যাল বলল, যেমন দেশ। তেমনি সে দেশের অভদ্র জোনাকি। জোনাকির এমন সাইজ কোথাও দেখিনি।

বিকালে দুইজনে ভরপেট খেয়ে এসেছি, কাজেই খাওয়ার প্রশ্ন নেই।

কিছুক্ষণ পরে হাবু সান্যাল বলল, তুমি জেগে আছ তো? বাঘ দেখতে পেলে আমাকে ডেকে দিও। আমি একটু গড়িয়ে নিই।

হাবু সান্যাল শোবার সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকতে শুরু করল। প্রচণ্ড আওয়াজ। আওয়াজে গাছের ডালে বসা পাখিগুলো কলরব করে অন্য গাছে উড়ে গেল।

আমি অস্বস্তি বোধ করলাম। অবশ্য অন্য কারণে। নলটা ঠিক আমার দিকে। কিছু বলা যায় না। শিকারী মানুষ। ঘুমিয়েও হয়তো শিকারেরই স্বপ্ন দেখে। হঠাৎ যদি ট্রিগার টিপে দেয় তাহলে বাঘের বদলে আমিই খতম।

সরে বসব, মাচায় সে জায়গা নেই। বন্দুকটা হাতে সরাতেও ভরসা হল না। বসে বসে ভগবানের নাম জপ করতে লাগলাম।

ওরই মধ্যে কখন তন্দ্রা এসেছে। পাঁঠার কান ফাটানো চিৎকারে চমকে চোখ খুললাম। সারা জঙ্গল জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে। দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। কোথাও কোনো অস্পষ্টতা নেই।

মাঝারি সাইজের দুটো বাঘ। একটা বোধহয় বাঘিনী হবে। পাঁঠাটাকে দুইজনে মিলে শেষ করল। তারপর দুইজনে ঘাসের উপর গড়াগড়ি খেয়ে উঠে বসল।

NOT FOR SALE

হাবু সান্যাল অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে। এত শব্দেও ঘুম ভাঙেনি। আমার ভয় হল, নাকের ডাকে আকৃষ্ট হয়ে ওরা না এদিকে নজর দেয়। দু-একবার হাবু সান্যালকে ঠেলা দিলাম। ঘুম আরো গাঢ় হল। নাকের শব্দ প্রচণ্ডতর।

আন্দাজ করলাম। অপেক্ষাকৃত ছোট সাইজ বোধহয় বাঘিনী।

বাঘিনী এক জায়গায় বসে নিজের থাবা চাটতে লাগল। বাঘ বাতাসে মুখ তুলে কি যে শুঁকল। তারপর হেলতে দুলতে গাছের তলায় এসে দাঁড়াল। আমরা যে গাছে বসেছি, সে গাছের তলায়।

এই সময়। এমন মহেন্দ্রক্ষণ উপেক্ষা করলে হাবু সান্যাল আমাকে ক্ষমা করবেন না।

খুব জোরে হাবু সান্যালকে ঠেলা দিলাম। কাজ হল। আঁ আঁ করে উঠে বসল।

বলল, আমি কোথায়?

মাচায়। চেঁচাবেন না। নিচে বাঘ।

অ্যাঁ! সেকি!

পাঁঠার অর্ধেকটা খেয়ে বাঘের বোধহয় পেট ভরে গিয়েছিল। ভরপেটে ঘুমের আমেজ আসাও স্বাভাবিক। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দুটো থাবার উপর মুখ রেখে চুপচাপ বসে।

ফিসফিস করে বললাম, এই সুযোগ, গুলি করুন।

আমার বন্দুক কোথায়?

বন্দুক পাশেই ছিল। তুলে হাতে দিলাম।

বাঘ না বাঘিনী?

বোধহয় বাঘ।

বন্দুক নিয়ে হাবু সান্যাল আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। মাচার শেষ প্রান্তে। শুয়ে পড়ে কয়েকক্ষণ তাক করল।

একেবারে আচমকা মড়মড় করে শব্দ। অর্ধেক মাচা ভেঙে হাবু সান্যাল বন্দুকসমেত বাঘের পিঠের উপর।

আওয়াজ হতেই বাঘটা লাফিয়ে উঠেছিল, তারপর হাবু সান্যাল পিঠে পড়তেই হুঙ্কার ছেড়ে তীরবেগে দৌড়েছে।

আমার যখন খেয়াল হল, দেখলাম, গাছের একটা ডাল ধরে ঝুলছি। আর তলা দিয়ে বাজি-জেতা রেসের ঘোড়ার মতো পিঠে জকি নিয়ে বাঘ ছুটে বেরিয়ে গেল।

ঘণ্টা দুয়েক বাদে ভোরের আলো ফুটতে বহু কষ্টে নীচে নামলাম।

একটু পরে আদিবাসীর দল এসে হাজির। হাতে বল্লম, সড়কি, লাঠি। তারা রাত্রিতে বন্দুকের গুলির শব্দ শুনেছিল।

NOT FOR SALE

তাদের আসল কথা কিছু বললাম না। মনে মনে স্থির জানতাম, হাবু সান্যালের হাড়গোড় বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

প্রায় আধমাইল যাবার পর সন্ধান মিলল। বিরাট কালো কালো পাহাড়ের স্তূপ প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে।— ঠিক তার নীচে বাঘটা পড়ে আছে। মাথাটা গুঁড়িয়ে গেছে।

একটু দূরে বন্দুকটা পড়ে আছে।

হাবু সান্যাল কোথায় গেল? খেয়ে ফেললেও তার হাড়গোড় নিশ্চয়ই পড়ে থাকবে। তাহলে বাঘিনী কি হাবু সান্যালকে মুখে করে নিয়ে গেল।

আদিবাসীরাও খোঁজ করল।

বন্দুকবাবু কোথায়?

দুটো হাত মুখের ওপর দিয়ে চীৎকার করলাম, হাবুবাবু, হাবুবাবু, আপনি কোথায়?

বার তিনেক চীৎকারের পর ক্ষীণ শব্দ কানে এল।

এই যে আমি।

এদিক ওদিক দেখতে দেখতে নজরে পড়ল।একটা শিরীষ গাছের দুটো ডালের ফাঁকে হাবু সান্যাল আটকে আছে। প্যান্ট ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। কোটরগত চোখ।

বাঘের দেহ বেঁধে নিয়ে যাবার জন্য আদিবাসীরা যে দড়ি এনেছিল সেই দড়ির ফাঁসে হাবু সান্যালকে বেঁধে আস্তে আস্তে নামানো হল।

প্রায় অচেতন অবস্থা। একজন আদিবাসী ছুটে গিয়ে গরম দুধ নিয়ে এল। দুধ খেয়ে হাবু সান্যাল উঠে বসল।

আমি ইচ্ছা করেই চেঁচিয়ে বললাম, ধন্য সাহস আপনার। বাঘটাকে এভাবে কেউ মারতে পারত না।

হাবু সান্যাল কোনো উত্তর দিল না। একদৃষ্টে নিঝুম বাঘটার দিকে চেয়ে রইল।

ব্যাপারটা বোঝা গেল। বন্দুকের গুলি বাঘের একটা চোখে লেগেছিল। আর একটা চোখে বন্দুকের নল ঢুকে গিয়েছিল। ফলে বাঘটি অন্ধ। সেই অবস্থায় পিঠের উপর হাবু সান্যাল। একটানা ছুটতে ছুটতে পাথরের উপর পড়াতে ঘিলু ফেটে চৌচির।

তার আগে হাবু সান্যাল শিরীষ গাছের নীচু ডালে আটকে গিয়েছিল। না হলে বাঘের ঘিলু আর তার ঘিলু আলাদা করে চেনা যেত না।

মহোল্লাসে আদিবাসীরা বাঘটা বয়ে নিয়ে এল।

জঙ্গল যখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে, তখন হাবু সান্যাল আস্তে ডাকল,— ভাগ্নে, শুনে যাও।

NOT FOR SALE

আমি কাছেই ছিলাম।

বাঘের চামড়াটা তোমাকে দেব আর নগদ পঞ্চাশ টাকা। আসল কথাটা যেন পাঁচ কান না হয়।

আমি বললাম, নিশ্চিন্ত থাকুন, কেউ জানবে না।

তারপর হাবু সান্যালকে নিয়ে হৈচৈ কাণ্ড। জীপে করে খোদ ডি.এফ.ও সায়েব এসে হাজির। বাঘের চামড়া তিনিই নিয়ে গেলেন।

যাবার সময় বলে গেলেন আরো দুই একদিন থেকে যান সান্যাল সায়েব। বাঘিনীটাকে খতম করে দিয়ে যান।

তার আর দরকার হল না। বিকালে এক কাঠুরে খবর আনল, ঝরনার ধারে বাঘিনীর দেহ ভাসছে।

আদিবাসীর দল বাঘিনীর দেহটাকে বাঁশে বেঁধে উঠোনে এনে ফেলল। প্রচুর জল খেয়ে পেটটা ঢাকের মতো ফুলে উঠেছে। লেজটা শক্ত দড়ির মতো সোজা হয়ে রয়েছে।

মামী সিঁদুরকৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে বাঘিনীর চারপায়ে মাখিয়ে বলল, একেই বলে সতীলক্ষ্মী। স্বামীর বিচ্ছেদ চব্বিশ ঘণ্টা সহ্য করতে পারল না।

গুনে গুনে মামী তিনবার প্রণাম করল।

হাবু সান্যাল বসে ঘন দুধের সঙ্গে গোটা কুড়ি লুচির সদ্ব্যবহার করছিল। হেসে বলল, সতীলক্ষ্মী কিনা জানি না, তবে দার্শনিক বাঘিনী, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই দর্শনের কোনো অধ্যাপককে চিবিয়ে খেয়েছিল তার নোট সমেত।

তার মানে? আবার প্রশ্ন।

নিশ্চয়। চোখের সামনে বাঘের অবস্থা দেখে সারা জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। বুঝতে পেরেছিল বাঘের পরমায়ু পদ্মপত্রে বৃষ্টির মতো। আজ আছে, কাল নেই। তাই আত্মহত্যা করে নিজেকে শেষ করে দিয়েছিল।

কথা শেষ করে হাবু সান্যাল দুটো হাত জোড় করে প্রণাম করল। বাঘিনীর আত্মার উদ্দেশ্যে, না নিজের রক্ষাকর্তাকে লক্ষ্য করে, ঈশ্বর জানে।

—সমাপ্ত—

NOT FOR SALE

মার্জার কাহিনী

একটু আগে থানার পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বেজে গেছে। কিছুতেই ঘুম আসছে না। পাশবালিশ জড়িয়ে কেবল এপাশ ওপাশ করছি।

বেশ গরম পড়ে গিয়েছে। আমি আবার গরম একটুও সহ্য করতে পারি না। মাথার ওপর বনবন করে পাখা ঘুরছে, তাও কপালে, গলায় বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটা।

পাশে ত্রিলোচন অকাতরে ঘুমাচ্ছে। নাক নয়, যেন সানাই। বিচিত্র সব শব্দ বের হচ্ছে।

হঠাৎ ত্রিলোচন ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসল। বলল, ওই আবার।

আমি লজ্জা পেলাম। বললাম, না ভাই ত্রিলোচন সে সব কিছু নয়। আমি পাশ ফিরলাম, তাই খাটটা দুলে উঠল।

ত্রিলোচন সপ্তাহ তিনেক গৌহাটি থেকে ফিরেছে। দারুণ ভূমিকম্পের পর। একরাত্রে ষোলবার গৌহাটির মাটি কেঁপে উঠেছিল। লোকজন বাড়ির মধ্য থেকে সবাই মাঠে আর রাস্তায় এসে জড় হয়েছিল।

তারপর থেকে ত্রিলোচনের কেবল ভয়, এই বুঝি বাড়িঘর দুলছে। কথা বলতে বলতে চমকে ওঠে। ঘুমাতে ঘুমাতে বিছানায় উঠে বসে।

বলে, ওই আবার।

এবার কিন্তু ত্রিলোচন অন্য কথা বলল।

না, না ভূমিকম্পের কথা বলছি না।

তবে?

বেড়াল, বেড়াল, রান্নাঘরে খুটখাট শব্দ শুনছ না?

আমি অবশ্য শুনিনি। তবে বাড়িতে বেড়াল আছে, তা জানি। একটা দুটো নয়, গোটা পাঁচেক। রেশন কার্ড নেই, তাও তাগড়া চেহারা। তাড়া করলে পালায় না, ল্যাজ শক্ত করে গোঁফ ফুলিয়ে ফিরে দাঁড়ায়। মুখে বলে ম্যাঁও। আমাদের বাড়ি থাকে বটে, কিন্তু একটা বেড়ালও আমাদের নয়। সব আমদানী হয়েছে পাশের খাটাল থেকে। দুধ খেয়ে খেয়ে বোধহয় মেজাজ বিগড়ে গিয়েছে, তাই মুখ বদলাতে এ বাড়িতে ঢুকেছে। মাছ মাংস তো খায়ই, কিন্তু বেড়ালে কাঁচা আনাজপত্র খায় জানা ছিল না।

NOT FOR SALE

ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে আলু কামড়ায়, কপি চিবোয়, শাকসবজি বাকী রাখে না।

শুধু কি তাই। ভোরবেলা খবরের কাগজ দিয়ে যায়। বারান্দায় পড়ে থাকে। নিচে নেমে পড়তে গিয়ে দেখি একটা বেড়াল সম্পাদকীয় চিবিয়ে শেষ করেছে, আর একটা সিনেমার পাতার ওপর আয়েস করে শুয়ে আছে।

একদিন ত্রিলোচন বলল, দাদা বেড়াল বিদেয় কর, নয়তো আমাকে অনুমতি দাও আমি আসামে ফিরে যাই।

এর চেয়ে আমার ভূমিকম্পে মরাও ভাল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন, কি হল কি?

কি হল না, তাই বল?

ত্রিলোচন তার নতুন কেনা টেরিলিন শার্টটা তুলে দেখাল।

একটা হাতা নেই। একদিকের কলারের অর্ধেকটা চিবানো। বিস্মিত হলাম, সে কি, বেড়ালে এই করেছে?

তোমার কি ধারণা আমি ভাতের সঙ্গে খেয়েছি।

আর কিছু বললাম না। মনে মনে ঠিক করলাম, আর নয়। এবার যেরকম করে হোক বেড়ালগুলো তাড়াতেই হবে। এর আগে যে চেষ্টা করিনি, এমন নয়। বহু কষ্টে মাছের লোভ দেখিয়ে পালের গোদা বেড়ালটাকে ধামাচাপা দিয়েছিলাম, তারপর ধামা থেকে থলিতে বদলি। মোড়ের পার্কে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলাম।

তারপর বাড়ি ফিরে দেখলাম বেড়ালটা আমার আগেই ফিরে এসেছে। ঠিক সিঁড়ির মুখে বসে জিভ দিয়ে গোঁফ চাটছে। আমাকে দেখে একটা চোখ বন্ধ করে বিশ্রীভাবে বলল, ম্যাঁও।

স্বরটা শুনে আমার যেন মনে হল, কেমন জব্দ।

মুশকিলে পড়ে গেলাম।

ইঁদুর তাড়াবার জন্য ভিটেয় বেড়াল পোষা যায়। কিন্তু বেড়াল তাড়াবে কোন জন্তু?

ত্রিলোচন বলল।

এক কাজ করতে পার। ভাল একটা কুকুর পোষ। বেশ বদরাগী কুকুর।

কথাটা মনে লাগল। এধারে ওধারে কুকুরের খোঁজ করতে লাগলাম।

ত্রিলোচন আর একটা কথাও বলে দিয়েছিল। দেশী কুকুর এনো না, ওদের বিশ্বাস নেই। বেড়ালের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হয়তো সহ অবস্থান করবে। তোমার বিপদ কমবে না, অথচ খরচ বাড়বে। একেবারে খাস বিলিতী কুকুর খোঁজ।

পার্কসার্কাসের ওদিকে কুকুরের দোকানের একজন খবর আনল। ত্রিলোচনকে সঙ্গে নিয়ে একদিন গিয়ে হাজির হলাম।

NOT FOR SALE

দরদস্তুর করতে করতে মাথায় হাত চাপড়ালাম। যত ছোট কুকুর তার দাম তত বেশী। একেবারে বড় সাইজের দাম যদি হয় দুশো টাকা, ছোট্ট তুলোর একটু পুঁটুলি, হাতের চেটোর সাইজ, দর হাঁকল ছশো টাকা।

ত্রিলোচন জামার আস্তিন ধরে টান দিল। চলে এস দাদা, ব্যাপার মোটেই সুবিধার নয়, কিছু না কিনলেও হয়তো পয়সা দিতে হবে।

দুজনে পালিয়ে বাঁচলাম।

যাক, দিন তিনেকের মধ্যে একটা ব্যবস্থা হল। খবরের কাগজে দেখলাম, এক সাহেব বিলাত চলে যাচ্ছেন, তাঁর একটা বুলডগ কুকুর কোন কুকুরপ্রেমীকে দান করে দিয়ে যেতে চান।

এমন সুযোগ আর আসবে না।

খিদিরপুরের ঠিকানা ছিল।

খুঁজে খুঁজে ফটকে গিয়ে দাঁড়ালাম।

আসবার কারণ শুনে দারোয়ান সাবধান করে দিল।

সাহেবের বিলাত যাওয়ার কথা সব বাজে। দেশ মাদ্রাজে, বিলাত যাবে কি করতে। ওটা কুকুর নয় বাবু, শয়তান। একমাস হল সাহেবের এক বন্ধু চা বাগানের ম্যানেজার কুকুরটা দিয়েছে, এর মধ্যে সাহেবের ছেলেকে কামড়েছে, মেমসাহেবকে, আর্দালীকে, ড্রাইভারকে। কাল মালীকে এমন তাড়া করেছিল বেচারী বারান্দা থেকে প্রাণের ভয়ে লাফিয়ে পড়ে, গোটা চারেক দাঁত ভেঙ্গেছে। কুকুরের নয়, নিজের। আমি ছুটির দরখাস্ত করেছি, কুকুর না গেলে আমি ফিরব না।

আমি একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম, তবে?

ত্রিলোচন কিন্তু পূর্ণমাত্রায় উল্লসিত।

বলল, এই রকম কুকুরই তো আমাদের দরকার। আমাদের বউও নেই, ছেলেপুলেও নেই। শুধু আমরা দুজন। শোবার ঘরে দুজনে খিল দিয়ে থাকব আর কুকুরটা খোলা থাকবে নিচেয়। ব্যস, আর দেখতে হবে না। এক একটা বেড়ালের টুটি টিপে ধরবে আর আছড়ে মারবে।

ত্রিলোচন মুখ চোখের এমন ভাব করল, যেন এই আছড়ানোর দৃশ্য সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে এবং উপভোগ করছে। কুকুরটা দেখলাম। মোটা চেন দিয়ে থামের সঙ্গে বাঁধা ছিল। রক্তাক্ত দু'টি চোখ, থ্যাবড়া মুখ, নাকের বালাই নেই। দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভটা ঝুলে পড়েছে।

আমাদের দেখে এমন একটা বিকট চিৎকার করল যে ত্রিলোচন তীরবেগে সাহেবের পিছনে আশ্রয় নিল।

আমি কদিন টনসিলে কষ্ট পাচ্ছিলাম। আওয়াজে শিউরে উঠতেই মনে হল টনসিল দুটো স্থানচ্যুত হয়ে গলা দিয়ে পেটের মধ্যে পড়ে গেল।

NOT FOR SALE

সাহেব মহানুভব। কুকুর দিলেন, চেন দিলেন, নিয়ে যাবার জন্য নিজের মোটর দিলেন। কুকুরটাকে সীটে বসালাম না, তাহলে আমাদের আর পাশে বসে যেতে হত না। সাহেবই বলল, কুকুরটাকে পিছনের লাগেজ কেরিয়ারে ঢুকিয়ে নিতে।

তাই হল। কুকুরটাকে তো বাড়ি নিয়ে আসা হল। এখন সমস্যা হল, তাকে নামানো। যে কাছে যায়, তার দিকে রক্তাভ চোখ মেলে যেভাবে চাপা গর্জন করে তার আর এগোবার সাহস হয় না। আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যায়।

ঠাকুর, দুই জোয়ান চাকর, জাঁদরেল ঝি সবাই পিছিয়ে গেল। মতলব বাতলাল সাহেবের ড্রাইভার।

বলল, আপনাদের বাড়িতে ঘুমের বড়ি আছে? আমাদের খিদিরপুরে মেমসাহেবের কাছে ছিল। মেমসাহেবের কাছ থেকে একবার পাঁচশো টাকা ধার নিয়েছিল। সাহেব বলে হয়রান। ফেরত দেবার আর নাম নেই। রাত্রে শুতে এসে সাহেব তাগাদা করত বলে মেমসাহেব বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ত। সাহেবের কোন কথা কানে যেত না। দুধের সঙ্গে সেই বড়ি খাইয়ে দিলেই টাইগার ঘুমিয়ে পড়বে। তখন পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাওয়া যাবে।

মনে পড়ে গেল। সহজে ঘুম হয় না বলে এক শিশি বড়ি কিনেছিলাম। কিন্তু সাহস করে খেতে আর পারনি। কি জানি যদি মাত্রা বেশি হয়ে যায়। তাহলেই আর ইহলোকে চোখ খোলার অবকাশ পাব না।

শিশি নিয়ে এসে বললাম, দুধের মধ্যে একটি বড়ি দিই?

ড্রাইভার হাসল, খাস বিলিতী কুকুর বাবু, একটা বড়িতে কখনও ওদের চোখ বোজানো যায়? গোটা তিনেক দিন। তাই দিলাম। চুকচুক করে টাইগার দুধটা খেল, তারপর থাবার ওপর মুখ রেখে নিঝুম হয়ে পড়ল।

নিন বাবু, এইবার তুলে নিযে যান।

কুকুরটার অবস্থা দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে সে ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু ওই বাঘা কুকুরকে কোলে তুলে নিতে সাহস হল না। কি জানি কপট নিদ্রার কৌশল তো শুধু শ্রীকৃষ্ণের একচেটিয়া নয়।

তাই ড্রাইভারকে বললাম, তোমাকে চেনে, তুমিই তুলে বাড়ির মধ্যে দিয়ে যাও না।

ড্রাইভার হাসল, এখন আর চেনাচেনি কি বাবু! ওর কি আর সে শক্তি আছে। জ্ঞানই নেই তো আত্মীয় পর চিনবে কি করে? আমার এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। এখনই আবার মেমসাহেবকে নিয়ে বের হতে হবে।

ড্রাইভার উঠে নিজের আসনে বসে পড়ল চালনচক্রে হাত রেখে। অগত্যা নিরুপায় হয়ে আমি আর ত্রিলোচন কুকুরটাকে বয়ে দু তলার বারান্দায়

NOT FOR SALE

রাখলাম। ঈশ্বর জানেন ঘুমের বড়িগুলো ভেজাল কিনা। বারান্দায় শোওয়াতেই মিট মিট করে চেয়ে দেখল।

তাড়াতাড়ি চেনটা বেঁধে লাফিয়ে সরে এলাম দুজনে।

ত্রিলোচন বলল, ব্যস দাদা, বেড়ালের অত্যাচারের হাত থেকে নিশ্চিন্ত। দিন তিনেক বেড়ালগুলো ধারে কাছে ঘেঁষল না।

চৌকাঠের ওপারে বসে জটলা করতে লাগল। কিন্তু তিন দিনে আমাদের অবস্থা কাহিল।

রেশনের চাল, আটা খতম। মাংস, মাছ চেটেপুটে নিঃশেষ করল। পাত খালি হলেই বিকট গর্জন।

ত্রিলোচনকে বললাম ভাই, বেড়ালকে তাড়াতে গিয়ে আমাদের যে পথে বসতে হবে। সারাটা সপ্তাহ খাব কি?

ত্রিলোচন অভয় দিল, একটা সপ্তাহ না হয় উপোসই দিলাম দাদা, তবু তো বেড়ালগুলো শায়েস্তা হবে। চতুর্থ দিন আমি আর ত্রিলোচন বারান্দায় বসেছিলাম। পেটে ভাত নেই, বিকালের ফুরফুরে হাওয়া, তাই সেবন করেই পেট ভরাচ্ছি।

হঠাৎ একটা আর্তকণ্ঠ।

দুজনেই দাঁড়িয়ে উঠলাম, তারপর যা দেখলাম তাতে আমার মাথার সমস্ত চুল খাড়া হয়ে উঠল। ত্রিলোচনের মাথায় চুলের বালাই নেই। মসৃণ টাক। সে বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল।

টাইগার তীরবেগে রাস্তা দিয়ে ছুটছে। গলায় ভাঙা চেন, আর তাকে তাড়া করে নিয়ে চলেছে গোটা আটেক বেড়াল। বাড়িতে পাঁচটা ছিল, তাই জানতাম, কিন্তু বাড়তি তিনটে বোধহয় কোথা থেকে ভাড়া করে এনেছে। কুকুর তাড়াবার জন্য।

এমন দৃশ্য মানুষের জীবনে একবারই দেখবার সুযোগ হয়। চেয়ারে বসে পড়ে দুজনে দেখলাম, একটু পরেই বীর বিক্রমে আটটি বেড়াল ফিরে আসছে। টাইগার ধারে কাছে কোথাও নেই। যথারীতি আবার বেড়ালের উপদ্রব শুরু হল। তরিতরকারি, কাগজপত্র, কাচের জিনিসপত্র সব গেল।

এই সময় পাড়ার এক অধ্যাপকের কাছে দুঃখের কথা জানাতে, তিনি সদুপদেশ দিলেন। ভদ্রলোক মনস্তাত্ত্বিক। প্রাণীদের আচার আচরণ সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞ।

তিনি বললেন, কিছু নয়, ওদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করতে হবে।

ত্রিলোচন সভয়ে বলল, কারা করবে?

কেন আপনারা, নিজেদের ঐতিহ্য ভুলে যান কেন? একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়, আমরা তো সেই বংশেরই সন্তান।

NOT FOR SALE

আমি ঢোঁক গিললাম, আটটা বেড়াল, লঙ্কা জয়ের চেয়ে খুব সোজা ব্যাপার মনে করছেন?

শুনুন কোন রকমে পালের গোদাটাকে বস্তাবন্দী করুন।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, সে চেষ্টা একবার হয়ে গেছে। মোড়ের পার্কে ছেড়ে দিয়েছিলাম—

অধ্যাপক অধৈর্য হয়ে হাত নাড়লেন, না, না, ওভাবে হবে না! ওদের মগজের মধ্যে ওলোটপালোট করে দিতে হবে। স্মৃতিশক্তি যাতে নষ্ট হয় তাই করতে হবে আগে।

কি রকম।

বস্তাবন্দী করে প্রথমে নাগর দোলায় চড়ান, খুব ঘুরপাক খাক, তারপর ট্যাক্সিতে উঠিয়ে এলোমেলোভাবে ঘুরিয়ে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিন। পালের গোদার অভাব বাকী বেড়াল কটা টের পেলেই দেখবেন ওরা ভয় পেয়ে যাবে। ওদের মনোবল যাবে ভেঙে। আহারে রুচি কমে যাবে। সংসার ভাল লাগবে না। একটা দুটো করে কাছাকাছি জঙ্গলে চলে যাবে।

ত্রিলোচন বলল, বেশ, কাজটা করা এমন কি শক্ত! তাই করা যাক।

আমি তবু সন্দেহ প্রকাশ করলাম, কিন্তু গোদাটাকে ধরা কি সোজা কথা?

দেখাই যাক না।

দিন সাতেকের মধ্যে ত্রিলোচন অসাধ্য সাধন করল। বাগবাজার থেকে বাদামপেস্তা দেওয়া ক্ষীর এনে রান্নাঘরে রাখল। একটা ঝুড়ি পাশে কাত করে তাতে দড়ি বাঁধা। বেড়াল ক্ষীর খেতে এলেই দড়ি ধরে টান, আর ঝুড়ির তলায় বেড়াল চাপা পড়বে।

ঠিক তাই হল। তবে একসঙ্গে দুটো বেড়াল চাপা পড়ল। গোদাটা আর একটা বাচ্চা। বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিয়ে গোদাটাকে থলিতে বন্ধ করা হল। অবশ্য ত্রিলোচন দু হাতে বক্সিং গ্লাভস পরে নিয়েছিল। পাছে আঁচড় লাগে। আমাদের ভাগ্য ভাল। সেই সময় রাসের মেলাও আরম্ভ হয়েছিল। ঘণ্টাখানেক তাকে নাগরদোলায় ঘোরানো হল। বেড়ালের মগজের কি হল জানি না, তবে ত্রিলোচন বার তিনেক হড়হড় করে বমি করল।

তারপর ট্যাক্সি ডেকে দু ভাই দু পাশে, মাঝখানে থলে, আমাদের যাত্রা শুরু হল।

ঠিক করে নিয়েছিলাম যে বেড়ালটাকে ময়দানে ছেড়ে দেব, যাতে আর লোকালয়ে প্রবেশ করতে না পারে। তাই প্রথমে গেলাম টালা, সেখান থেকে দক্ষিণেশ্বর, ট্যাক্সি ঘুরিয়ে বেহালা হয়ে চলে এলাম শিবানীপুর, আমতা, ফলতার গঙ্গা ধার, তারপর আবার টালিগঞ্জ, সেখান থেকে গড়ের মাঠ।

NOT FOR SALE

মাঝপথে ত্রিলোচনের কি মনে হল, সে বলল, দাদা এক কাজ করলে হয়।

কি?

হাজার হোক কৃষ্ণের জীব, এভাবে মাঠে ময়দানে ছেড়ে দিলে কিছু হয়ে গেলে আমাদের পাপ স্পর্শ করবে।

কিন্তু লোকের বাড়ির দরজায় ছাড়াটা কি সমীচীন হবে?

না, না তা বলছি না। ময়দানেই ছাড়ব তবে কোন হোটেলের উল্টো দিকে। যাতে পরে হেঁটে হেঁটে হোটেলে গিয়ে উঠতে পারে তা হলে আর অনাহারে মরবে না।

বেশ তোমার যা ইচ্ছা।

তাই ঠিক হল। গ্র্যাণ্ড হোটেলের উল্টো দিকে ময়দানের পাশে ট্যাক্সি থামল।

আসল ব্যাপারটা ড্রাইভাররে জানা ছিল না। উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরাতে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

সব শুনে চেঁচিয়ে উঠল, এর জন্য এত ঝামেলা। সোজা গঙ্গামায়ীর কোলে বিসর্জন দিয়ে দিন। আপনারাও বাঁচবেন, বেড়ালের আত্মারও সদ্গতি হয়ে যাবে।

ত্রিলোচন কানে আঙুল দিল, ছি, ছি, সর্দারজী, ওতে পাপ হবে। ময়দানে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। ফাঁকা হাওয়া খাবে, বিনা পয়সায় ফুটবল খেলা দেখবে, ক্রিকেটে শখ থাকে তাও দেখতে পারে।

ড্রাইভার কোন কথা বলল না। নেমে এসে গাড়ির দরজা খুলে ধরল।

আমি বস্তাটা ধরে নামালাম। ত্রিলোচন পিছনে।

এক জায়গায় গাছের নীচে এক সন্ন্যাসী বসেছিলেন। নিমীলিত নেত্র। বিচিত্র রঙের আলখাল্লা। পাশে একটা গোপীযন্ত্র। ভাবলাম এই সন্ন্যাসীর কাছাকাছি বেড়ালটাকে ছেড়ে দিই। পরের জিনিস খেয়ে, পরের জামাকাপড় নষ্ট করে জীবনে অনেক পাপ করেছে, তবু সাধুর সান্নিধ্যে তাঁর অমিয় বচনের কিছুটা কানে গেলে ও উদ্ধার হয়ে যাবে।

সবে থলির মুখ খুলতে গিয়েছি, পিছনে বজ্রকণ্ঠ। হিন্দীতে।

কি ওতে?

চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম সন্ন্যাসী কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে দেখছেন।

ত্রিলোচন বলল, প্রভু, মার্জার।

কেয়া? এবার বজ্রকণ্ঠ আরও জোর।

আমি বললাম, আজ্ঞে বিল্লী।

আমার কথার সমর্থন করেই থলির মধ্য থেকে শব্দ হল, ম্যাঁও।

সন্ন্যাসী ভ্রূকুঞ্চিত করলেন।

NOT FOR SALE

বিপদ। আমি আর ত্রিলোচন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম। বেড়ালের অত্যাচারের কাহিনী। আমাদের দুরবস্থা।

গোপীযন্ত্র দেখেছিলাম, ত্রিশূলটা লক্ষ্য করিনি। সেই নিয়ে সন্ন্যাসী তেড়ে উঠলেন।

ভাগো হিঁয়াসে। এখানে বিল্লী ছাড়তে এসেছ? আফিংয়ের জন্য একটু দুধ নিই, ঈশ্বরের উপাসনা করব না দুধ সামলাব? যাও, যাও, অন্য কোথাও যাও।

সন্ন্যাসীর চেহারা দেখে থলি বগলে করে দুজনে ছুটে ট্যাক্সিতে উঠে পড়লাম। ট্যাক্সি আরো খানিকটা এগিয়ে গেল।

ত্রিলোচন বলল, বেড়ালটারই বরাত দাদা। কোথায় গ্র্যাণ্ড হোটেলের আওতায় থাকত, ভালমন্দ খেত, তা আর হল না। আমরা আর কি করব।

একটা বিরাট নালা, তার পাশে ঢালু জমি। কি একটা ক্লাবের তাঁবু। থলির ভেতর বেড়ালটা তর্জন গর্জন করছে, তাই আর সাহস করে তাকে আমাদের পাশে রাখিনি লাগেজ কেরিয়ারে পুরেছিলাম।

ট্যাক্সি থামিয়ে থলেটা বের করলাম। তারপর দুজনে এগিয়ে গেলাম নালার পাশে।

ও, আপনারাই রোজ এ কাজ করেন?

চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম ঢালু জমিতে একটা দারোয়ান শুয়েছিল। সে আস্তে আস্তে উঠে বসল।

আমরা? রোজ?

হ্যাঁ, আজ ধরে ফেলেছি বলে বোকা সাজছেন। রোজ রোজ এখানে আবর্জনা ফেলে যান। গন্ধে ক্লাবের বাবুরা টিকতে পারে না।

আবর্জনা কেন হবে, ত্রিলোচন চেঁচিয়ে বলল, বেড়াল, বেড়াল ছাড়ছি আমরা।

বেড়াল ছাড়ছেন? লোকটা দুটো চোখ প্রায় কপালে তুলল, তার মানে ক্লাবে বেড়াল ছাড়ছেন কি? বছরে চাঁদা কত জানেন? একশ কুড়ি টাকা। ঢোকবার ফি পঞ্চাশ।

আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম, বেড়ালটা ক্লাবের সদস্য হতে চায় না দারোয়ানজী, শুধু এইখানে থাকবে, ঘোরাঘুরি করবে।

বা, বেশ চমৎকার কথা বলছেন তো! ক্লাবের তাঁবুতে থাকবে, লনে বেড়াবে, দরকার হলে মেম্বারদের চেয়ারে বসবে, সব বিনা চাঁদায়? ফিস্টের সময়ও এসে ভাগ বসাবে, একেবারে বিনামূল্যে?

ত্রিলোচন ক্ষেপে গেল। বস্তা কাঁধে ফেলে বলল, এত কথার দরকার কি দাদা। ময়দানে কি জায়গার অভাব! অঢেল মাঠ পড়ে রয়েছে। কোন ক্লাবের কাছে আমাদের যাবার দরকার কি! চল অন্য কোথাও ছেড়ে দিই।

NOT FOR SALE

বেড়াল নিয়ে আবার ফিরে এলাম। আমরা সীটে, বেড়াল লাগেজ-কেরিয়ারে। ট্যাক্সি এগিয়ে চলল।

এবার এমন জায়গায় থামলাম যেখানে কাছাকাছি কোন তাঁবু নেই। কেবল ঘাসে ঢাকা মাঠ।

ত্রিলোচন বলল, দাদা, বেড়াল ছাড়ার আদর্শ জায়গা। কেউ কোন আপত্তি করবে না।

এবার নির্বিবাদে থলির মুখ খুলে বেড়ালটা ছেড়ে দিলাম। ভেবেছিলাম মুক্ত হয়ে বেড়ালটা ছুটে পালিয়ে যাবে, কিন্তু তা করল না। গুঁড়ি মেরে চুপ করে বসে রইল।

বা, এ তো বেশ ভাল জাতের মশাই। চমৎকার গড়ন। এক মারোয়াড়ী ভদ্রলোক পদচারণা করছিলেন। ব্যাপার দেখে তিনি কাছে এসে দাঁড়ালেন।

বেড়ালটার গড়ন নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য; কিন্তু এই দিব্য গড়নের মূলে আমাদের সর্বনাশের মাত্রা কতখানি সেটা আর ভদ্রলোককে বোঝাবার চেষ্টা করলাম না। তিনি নিচু হয়ে বেড়ালটাকে কোলে তুলে নিলেন, আর অবাক কাণ্ড, বেড়ালটা মড়ার মতন চোখ বুজে পড়ে রইল। হাত দিয়ে গলায় সুড়সুড়ি দিলেন। বেড়ালটা ঘড় ঘড় শব্দ তুলে সেবা উপভোগ করতে লাগল। এমন বড়িয়া চিজ বিশেষ দেখা যায় না। পারসিয়ার বিল্লীই হবে বোধহয়। একে কি ময়দানে হাওয়া খাওয়াতে এনেছেন?

সত্যি কথাটাই বললাম।

আপদ বিদেয় করতে এসেছি। ময়দানে ছেড়ে দিয়ে যাব।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না, তারপর অতি কষ্টে একসময়ে উচ্চারণ করলেন, মানুষ বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, আপনারা সেই মানুষ?

কথাটা যথেষ্ট অপমানজনক। আমাদের দুজনকে দেখে শিম্পাঞ্জী ভাবার কোন সম্ভাবনা নেই। বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের উদাহরণ হয়তো আমরা নয়, কিন্তু দেখলে মানুষ বলে বোঝা যায়।

তাই রেগে বললাম, কি বলতে চান আপনি? আমরা মানুষ নই তো কি?

ভদ্রলোক দুটি চোখ নিমীলিত করে মধুর ভঙ্গীতে হাসলেন। দুটো হাত, দুটো পা আর এদিকে ওদিকে নাক-মুখ ছড়ানো থাকলেই কি আর মানুষ হয়? মানুষের হৃদয় কোথায় আপনাদের? দিল?

ত্রিলোচন বুকে হাত দিয়ে বলল, কেন? এই তো ধুকধুক করছে। আপনার হাড়-জ্বালানো কথা শুনে তার গতি বেড়ে গেছে।

মারোয়াড়ী হাত নাড়লেন, না, না ও শব্দ তো জানোয়ারের বুকে হাত রাখলেও পাওয়া যায়। মানুষের দয়া, মায়া, মমতা এসব আছে আপনাদের?

NOT FOR SALE

থাকলে এই অবলা জীবকে এভাবে নির্বাসন দিতে পারতেন না। মা জানকীকে নির্বাসন দিয়ে রামজীর কি হাল হয়েছিল, রামায়ণে পড়েছেন নিশ্চয়।

আমরা এমন পৌরাণিক উপমায় বিস্মিত হলাম।

মা জানকী বোধহয় উপমাটার তারিফ করল। একটা চোখ খুলে মৃদুকণ্ঠে বলল, মিঁয়াউ।

আপনাদের সঙ্গে গাড়ি আছে?

গাড়ি মানে ট্যাক্সি।

ঠিক আছে, চলুন। ভদ্রলোক বেড়ালটাকে আদর করতে করতে আমাদের সঙ্গে চললেন। মুখে অনর্গল বাণী।

পৃথিবীর সব সুযোগ-সুবিধাটুকু আপনারা নিয়ে যাচ্ছেন, জায়গা নিয়ে মোকাম বানাচ্ছেন। গাছপালা জন্তুজানোয়ার সব আপনাদের খাদ্য করে তুলেছেন। এমন কি বিল্লীর খাদ্য মছলি, তাও ছাড়েন নি। ওদের খাদ্য কেড়ে নিয়েছেন, আবার ওদের মাথার আচ্ছাদনটুকুও কেড়ে নিতে চাইছেন? ছি, ছি।

শেষদিকে ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে গেল। দু' এক ফোঁটা অশ্রুও হয়তো গোঁফের ওপর ঝরে পড়ল।

এর দিকে চোখ ফেরালেও কি আপনাদের কষ্ট হয় না? দেখুন, চেয়ে দেখুন।

আমরা চেয়ে দেখলাম। বেড়ালের দিকে নয়, ভদ্রলোকের দিকে। ততক্ষণে তিনি মোটরের পিছনের ডালাটা খুলে বেড়ালটাকে রেখে দিয়ে ডালাটা বন্ধ করে দিয়েছেন।

যান, নিয়ে যান বাড়িতে। আপনারাই তো ওকে দেওতা বলেন। ষষ্ঠী ঠাকরুণ। দেওতাকে বাড়িছাড়া করতে আছে?

আমরা দুভাই ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম। ট্যাক্সি ছুটল।

উঁকি দিয়ে দেখলাম, ভদ্রলোক হাততালি দিয়ে ভজন গাইছেন। হয়তো আমাদের মঙ্গলের জন্যই।

ত্রিলোচন বলল, দাদা, এবার আর মানুষের ধারে কাছে নয়। একেবারে জনমানবহীন মাঠে ছেড়ে দেওয়া যাক।

চল, ঘোড়দৌড়ের মাঠের দিকে যাই।

সেখানে কেউ থাকবে না? সন্দেহ প্রকাশ করলাম।

আজ বুধবার, রেস তো সেই শনিবার। আজ আর কে থাকবে? সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এখন কি আর ঘোড়াদের ট্রেনিং-এর জন্য নিয়ে আসবে?

ট্যাক্সি ঘোড়দৌড়ের মাঠের পাশে থামল। জনহীন মাঠ। কেউ কোথাও নেই।

NOT FOR SALE

ট্যাক্সি ড্রাইভারও সাফ কথা বলে দিয়েছে। এই শেষ। আর সে ঘুরতে পারবে না। বিল্লীকে এখানেই ছাড়তে হবে, নয়তো বাবুরা সঙ্গে করে নিয়ে যাক।

থলিটা হাতে নিয়ে মাঠের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম। ছাড়তে যাব এমন সময় ত্রিলোচন বাধা দিল—

এক মিনিট দাদা।

আবার কি হল?

ছটা ছাব্বিশ পর্যন্ত সময়টা খারাপ। যাত্রা নাস্তি।

বেড়ালের একরকম যাত্রাই তো। নতুন ধরনের জীবনযাত্রাও বলা যেতে পারে।

ঠিক আছে। ছটা সাতাশ হতেই থলির মুখ খুলে দিলাম। ভেবেছিলাম, অচেনা জায়গায় বেড়ালটা থলি থেকে বের হতে চাইবে না, কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড, থলির মুখটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তীরবেগে বেরিয়ে পড়ল। এত দ্রুত যে একটা হলদে চলন্ত আভা ছাড়া আর কিছু আমাদের চোখে পড়ল না।

ত্রিলোচন বলল, মাঠের গুণ দেখ দাদা। বেড়াল ঘোড়া হয়ে গেল। এভাবে রেসের দিন ছুটতে পারলে ট্রেনাররা ওকে লুফে নেবে। ওর বরাত খুলে যাবে।

আমি বললাম, আমরা একটা কাজ করি ত্রিলোচন, সোজা ট্যাক্সিতে না গিয়ে এখানে কিছুক্ষণ ঘুরপাক খাই। তাহলে বেড়ালটা আর আমাদের অনুসরণ করতে পারবে না।

তুমি পাগল হয়েছ দাদা। ও এখন মুক্ত জীবনের সন্ধান পেয়েছে, আর কি সংসারে ফিরবে?

তবু আমরা দুজনে ঘুরতে শুরু করলাম। ঘোড়াগুলো যে পথে পাক দেয়, সেই পথে। দুজনে যখন বেশ ঘর্মাক্ত, তখন ট্যাক্সিতে এসে উঠলাম।

পিছনের ডালাটা খোলা ছিল, সেটা বন্ধ করে ত্রিলোচন আমার পাশে এসে বসল।

এতক্ষণ পরে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

বেলা সাড়ে এগারোটায় ট্যাক্সি চেপেছি, এখন সাতটা বাজে। তা হোক, পালের গোদাটাকে সরিয়ে দিতে পেরেছি, এ আনন্দ আমাদের রাখবার ঠাঁই নেই।

ট্যাক্সি ছাড়তে ত্রিলোচন গান শুরু করল।

নাই, নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার।

আমি বললাম, কিসের দ্বার ত্রিলোচন?

NOT FOR SALE

ত্রিলোচন গান থামিয়ে বলল, বেড়াল তাড়াবার দ্বার দাদা। এইবার দেখুন না বাকী কটার কি হাল হয়! যুদ্ধে জেনারেল পালালে সৈন্যদের যেমন ছত্রভঙ্গ অবস্থা হয়, ঠিক তেমনই।

বাড়ি পৌঁছলাম পৌনে নটায়।

বাড়ির সামনে থামতেই এক কাণ্ড। বাকী বেড়াল কটা ট্যাক্সি ঘিরে ফেলল। ম্যাঁও, ম্যাঁও শব্দে পাড়া মুখরিত।

ত্রিলোচন বলল, দেখলে দাদা, ওষুধ কাজ করতে আরম্ভ করেছে। ওদের মুখচোখের কি রকম অসহায় ভাব লক্ষ্য করেছ?

নিচু হয়ে দেখলাম, কিছু বুঝতে পারলাম না। বেড়ালদের মুখচোখের ভাব সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুব নেই। শুধু দেখলাম, একগাদা চোখের তারা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

ড্রাইভার কিন্তু অন্য কথা বলল, না বাবু, আসল ব্যাপার কি জানেন, যে থলিতে বিল্লীটা পুরে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা লাগেজ-কেরিয়ারে রয়েছে, তাতে এরা মছলির গন্ধ পাচ্ছে। দেখছেন না সবাই মোটরের পিছন দিকে ঘোরাফেরা করছে।

তাও সত্যি। ওটাই আমাদের বাজারের থলি। এতেই মাছ-মাংস আনা হয়।

যাক, ডালাটা খুললাম থলেটা বের করার জন্য, কিন্তু থলে বের করা আর হল না। লাফিয়ে পিছিয়ে এলাম। শুধু আমি নয়, ত্রিলোচনও।

থলেটা পাতা রয়েছে। তার ওপর গোদা বেড়ালটা ঘুমাচ্ছে। তার পাশে হৃষ্টপুষ্ট কুচকুচে কালো আর একটি। গোদা বোধহয় ঘোড়দৌড়ের মাঠ থেকে এটিকে সংগ্রহ করে এনেছে।

ডালাটা খুলতেই বিকট শব্দে ম্যাঁও করে গোদা লাফিয়ে পড়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। তার পিছনে গোদাতর কালো বেড়াল। তাদের পিছন পিছন বাকী সাতটা।

ত্রিলোচনের দিকে ফিরে দেখি সে রাস্তার ওপর ছিটকে পড়েছে। দাঁতে দাঁতে ঠকঠক করে শব্দ হচ্ছে আর বলছে, দাদা, ভূমিকম্প, মাটি দুলছে, জল দুলছে, পৃথিবী দুলছে।

—সমাপ্ত—

NOT FOR SALE

সিংহ জাতক

সব রকম জন্তুজানোয়ারদের মধ্যে সিংহ শিকার সবচেয়ে সোজা। হাতে বন্দুক থাকলে আর বন্দুকে গুলি থাকলে সিংহ শিকার একটা বাচ্চা ছেলেও করতে পারে।

কথাগুলো আমার নয়, বিখ্যাত শিকারী সঞ্জয় ঘোষালের। ভরতপুরের সঞ্জয় ঘোষাল, বন্দুক যাঁর চিরসঙ্গী। এমন কি শোবার সময় পর্যন্ত পাশ-বালিশ ব্যবহার করেন না। তার বদলে বন্দুক।

তাঁর বাড়ির দেওয়াল দেখার উপায় নেই। কেবল জন্তুজানোয়ারের মাথা টাঙানো। নীলগাই, হরিণ, বাইসন থেকে শুরু করে জিরাফ, সিংহ, বাঘ, এমন কি কুমির পর্যন্ত।

জানলা দরজায় কাপড়ের পর্দা নেই, তার বদলে ময়াল সাপের চামড়া ঝোলানো, গোটা চারেক আলমারি বোঝাই কেবল শিকারের বই।

প্রথম যখন রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশিত হল তখন সঞ্জয় ঘোষাল বিশ্বভারতীকে চিঠি লিখে প্রশ্ন করেছিলেন, এর মধ্যে শিকার সম্বন্ধে কোন বই আছে কিনা।... নেই শুনে উৎসাহ প্রকাশ করেননি।

এ- হেন শিকারীর কথা উড়িয়ে দেবার নয়। আমার পক্ষে তো নয়ই, কারণ সঞ্জয় ঘোষাল কী এক সম্পর্কে আমার মামা হন। সেই সূত্রে আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসা যাওয়া করেন। কলেজেও "Hunting" সম্বন্ধে আলাদা কোন বিষয় নেই দেখে চটে লাল। উপদেশ দিলেন, লেখাপড়া ছেড়ে দে। অসম্পূর্ণ শিক্ষা অশিক্ষার চেয়েও মারাত্মক।

শিকার ছাড়া শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি মামার এই যে বিদ্বেষ, এতে মামাকে আমার কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছিল।

সিংহ শিকার সবচেয়ে সোজা? আমি মামাকে প্রশ্নের খোঁচা দিলাম। সেই চাকে খোঁচা দিয়ে মধু ঝরানোর আশায়।

মামা ঘাড় নাড়লেন। তার কারণ আছে। আমরা পলিটিশিয়ান তো নই যে ফালতু কথা বলব। আমরা শিকারি, আমাদের একটা বাজে কথায় একটা প্রাণ চলে যেতে পারে।

কোলের ওপর হাত দুটো রেখে চুপচাপ বসলাম। মামা শুরু করলেন।

NOT FOR SALE

সিংহ হচ্ছে মেজাজী জানোয়ার। যাত্রার দলের রাজার পরচুলার মতন কেশরের গোছা দেখেছিস? অন্য কোন জানোয়ারের চুলের এ-বাহার আছে? অবশ্য মানুষকে যদি জানোয়ারদের মধ্যে ধর, তাহলে চুলের কায়দায় সিংহ সেকেণ্ড। তারপর তার চলনই আলাদা। বনের মধ্যে বেড়ায় যেন ট্যাঁকখালির জমিদার বিকালে নিজের বাগানে পায়চারি করছেন। পচা, বাসি মাংস ছোঁন না। পেট ভরা থাকলে মুখের সামনে খাদ্য ফেলে রাখলেও মুখ ফিরিয়ে নেন। সবচেয়ে বড় কথা, শিকারিকে তো মানুষ বলেই গণ্য করেন না। অন্য জন্তুদের মতন তাদের আক্রমণ করেন না। দারুণ অবহেলায় মুখ ফিরিয়ে চলে যান।

এই মেজাজই সিংহের সর্বনাশ ডেকে আনে। শিকারী বন্দুক তুললেও সিংহ পালায় না। চোখে নীল বাতি জ্বালিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। তার সুযোগে শিকারী খতম করে দেয়।

প্রায় নিশ্বাস রোধ করে মামার গল্প শুনতাম। শুনতে শুনতে অনুভব করতাম, পিঠের মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা একটা হিমেল প্রবাহ নেমে যাচ্ছে। রাত্রে আধো-তন্দ্রার ঘোরে দেখতাম গোটা সুন্দরবন আমার বিছানার চারপাশে।

মামা অনেকদিন বলেছেন, এসব গল্প শুনে কি হবে? চল একবার আমার সঙ্গে শিকারে। এবার গেলে আর ভুলতে পারবি না। অরণ্য বার বার আকর্ষণ করবে।

অবশেষে একদিন সুযোগ জুটে গেল।

পরীক্ষার পর অফুরন্ত অবসর। কি করে সময় কাটাব ভেবে পাচ্ছি না, এমন সময় মামার কাছ থেকে ডাক এল।

কিরে যাবি সুন্দরবনে?

সুন্দরবন?

হ্যাঁ। বিলেত থেকে বুথ সাহেব এসেছে শিকার করতে। আগে এদেশেই ছিল। আমার বিশেষ বন্ধু। যাবি তো চল।

আমি তো তখনই রাজী। তবে আনন্দটা যে একেবারে অবিমিশ্র এমন কথা বলতে পারি না। বেশ একটু উত্তেজনার ভাবও ছিল তার সঙ্গে।

কিন্তু দুজন জাঁদরেল শিকারী যখন সঙ্গে যাচ্ছে, তখন আর ভয়ের কি আছে!

পথে একবার মামাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মামা, সেই সাহেব এলেন না?

মামা একটু অন্যমনস্ক ছিলেন। প্রশ্নটা আর একবার শুনে বললেন, বুথ ক্যানিংয়ে থাকবে। সেখান থেকে আমরা তিনজন একসঙ্গে নদী পার হব।

ক্যানিংয়ে বুথ সাহেবের সাক্ষাৎ মিলল। সাহেব ইলিশ মাছের দর করছিলেন জেলেদের সঙ্গে।

NOT FOR SALE

নাতিদীর্ঘ, স্বল্প প্রস্থ, জলপাই রঙের সাহেব। উজ্জ্বল দুটি চোখ। পিঠে বন্দুক। গলায় টোটার মালা। মামা বললেন, জন্তুজানোয়ারের যম। অব্যর্থ লক্ষ্য। দুশো গজ দূরে দাঁড়ানো বাঘিনীর ডান দিকের গালের তিলে গুলি লাগাতে পারেন। বাঘ, সিংহ ছাড়া অন্য জানোয়ার মারতে গুলি খরচ করেন না। বন্দুকের বাঁট ব্যবহার করেন। একবার আফ্রিকায় দারুণ দুর্যোগের মধ্যে পড়েছিলেন, জোর বৃষ্টি। একটা নদী পার হবার দরকার, কিন্তু একটিও নৌকা নেই। অবশেষে বুথ এক দুঃসাহসিক কাজ করলেন। ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে। গোটা তিনেক কুমির তৈরি ছিল। একেবারে হাঁ করে তেড়ে এল। বুথ একলাফে তারই একটার পিঠে উঠে পড়লেন। একটা হাতে শক্ত করে নাকের গর্ত টেনে ধরলেন, আর এক হাতে বন্দুকের বাঁট দিয়ে দাঁড়ের মতন জল কেটে দিব্যি ওপারে গিয়ে পৌঁছলেন।

কাহিনী শুনে আমি প্রকাণ্ড হাঁ করে ফেললাম। ভাবতেও রোমাঞ্চ হল যে সঙ্গী হিসাবে এমন দুর্ধর্ষ শিকারীকে পেয়েছি।

অথচ মুখ দেখে বোঝবার কিন্তু উপায় নেই। হাঁটুর ওপর প্যান্ট গুটিয়ে মাছের ওজন নিয়ে তর্কাতর্কি করছেন। ভদ্রলোক বোধহয় ভারত ছেড়েছিলেন কিলোযুগের আগে, তাই কিলোটা এখনও রপ্ত করে উঠতে পারেননি।

মামা আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

বুথ একগাল হেসে আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আপনার দর্শনে চিট্টি পরম শান্টি লাভ করিলো। আশা করি আপনার শিকারের কৃটিট্টেও অনুরূপ শান্টি পাইবো।

বাংলা বুথ ভালই বলেন, তবে ওই সাধু ভাষায়।

প্রত্যুত্তরে আমি হাসলাম।

আমরা চারজনে মাতলা নদী পার হলাম। চারজন অর্থে বুথ, মামা, আমি আর একটি ইলিশ। তারপর পদব্রজে। কিছুটা যেতেই গ্রামের সীমানা দেখা গেল, কিন্তু গ্রামবাসীদের দেখা পাওয়া গেল তার অনেক আগে।

প্রায় জন বিশেক আমাদের ঘিরে ধরল। হরেক রকমের আর্তনাদ করতে করতে।

মামা তাদের অনেক কষ্টে থামিয়ে বললেন, কি হয়েছে, একজন বলো। সবাই কথা বললে বুঝবো কী করে?

বুথ বললেন, সমবেট সঙ্গীট শুনিটে অভ্যস্ট নহি।

সবাইকে থামিয়ে একজন এগিয়ে এল। প্রৌঢ় কিন্তু সবল চেহারা। খালি গা। মালকোছা দেওয়া ধুতি, হাতে পাকা বাঁশের লাঠি।

ইলিশকে বাদ দিয়ে আমাদের তিনজনকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল, তারপর

NOT FOR SALE

দুটো হাত বুকের ওপর জড়ো করে বুথের দিকে চেয়ে প্রৌঢ় বলল, সিঙ্গি সাহেব। সিঙ্গি।

বুথ চমকালেন। মামা চমকালেন।

লোকটার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখে বুথ বললেন, সুণ্ডরবনে সিংহ? মিট্টা কঠা। টুমি প্রটারক।

লোকটা নীচু হয়ে আবার বুথের পা ছুঁল। বলল, দক্ষিণ রায়ের দিব্যি সাহেব। মা মনসার দিব্যি। মিথ্যা কথা বলি তো তোমার মাথা খাই। আমি এ-গাঁয়ের মোড়ল। পুলিশের কাছে ছাড়া আর কারও কাছে কখনও মিথ্যা বলি না।

কথা শেষ করে মোড়ল একবার দলের লোকেদের দিকে চোখ ফেরাল, তারপর বলল, সিংহটা নকুড় সামন্তর গোয়ালঘরের সামনে তিন রাত ঘোরাঘুরি করছে। প্রথম রাতে দেখে নকুড় আমাকে খবর দেয়। আমি দু'রাত নকুড়ের বাড়িতে ছিলাম। বাঁশের ফাঁক দিয়ে দেখেছি, ইয়া কেঁদো এক সিঙ্গি।

বুথ বললেন, টুমি ঠিক জানো উহা রয়েল বেঙ্গল বাঘ নয়?

এবার মোড়ল যেন একটু অপমানিত বোধ করল, কি বলছেন সাহেব? মাকে মাসী চেনাবার মতন সুন্দরবনের লোকেদের বাঘ চেনাচ্ছেন?

তবু নিজেকে সংযত করে কণ্ঠস্বরে বিনয় প্রকাশ করে মোড়ল বলল, আমরা ছেলেবেলা থেকে বলতে গেলে বাঘের কোলেই মানুষ। আমরা বাঘ চিনি না সাহেব!

এতক্ষণ পরে মামা কথা বললেন।

ও আর দেখতে হবে না। নিশ্চয়ই বাঘ। ওদের অসাধ্য কাজ আর নেই। কোথা থেকে পরচুলা যোগাড় করে সিংহ সাজার চেষ্টা করেছে। লোকের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা।

বুথ মাথা নীচু করে কি ভাবছিলেন, মামার দিকে ফিরে বললেন, এখান থেকে গির ফরেস্টের ডুরট্ট কট?

বুথের প্রশ্নের অর্থ মামা বুঝলেন। বললেন না, সেটা সম্ভব নয়, অনেকটা দূর। বেড়াতে বেড়াতে এতদূর আসবে, তা হতেই পারে না।

বুথ তবু ঘাড় নাড়লেন, কিছু বলা যায় না। আফ্রিকার এক সিংহ আমার পিছন পিছন টিনশো একুশ মাইল আসিয়াছিল। বুড়া সিংহ। হার্টের ট্রাবল দেখা দেওয়ায় আর বেশী অগ্রসর হইটে পারে নাই। এক ডিসপেনসারির সম্মুখে শুইয়া পড়িয়াছিল।

মামা বললেন, ঠিক আছে। বাঘ কি সিংহ বন্দুকের গুলিতে খতম হলেই ঠিক টের পাওয়া যাবে। এগোনো যাক।

সবাই এগোতে আরম্ভ করলাম।

NOT FOR SALE

নকুড় সামন্তর বাড়ি গ্রামের এক প্রান্তে।

তারপরই অজগর বন শুরু।

ঠিক হল বনের মধ্যে ঢুকে একটা ঝাঁকড়া গাছের ডালে মাচা বাঁধা হবে। আর নকুড়ের একটা গরুর গলায় দড়ি বেঁধে কাছাকাছি একটা গাছের গুঁড়িতে আটকানো থাকবে।

লোভ বড় মারাত্মক প্রবৃত্তি। পরপর তিন রাত যখন এসেছে, তখন আজ রাতেও সিংহ হোক বাঘ হোক বা ছদ্মবেশী সিংহ হোক, লোভে লোভে ঠিক আসবে, এসেই দেখবে গরু আর গোয়ালের মধ্যে নেই। হারেম ছেড়ে একেবারে বাইরে বেরিয়েছে।

তারপর পশুটির আর জ্ঞান থাকবে না, হয়তো প্রাণও নয়।

সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল।

নকুড় একটু ইতস্তত করছিল, কিন্তু বুথ তাকে অভয় দিলেন।

টুমি নিঃশঙ্ক হও। গো বধ হইবে না। গোরুর প্রাণ আমাদের প্রাণের সমমূল্য জানিবে। আমরা টোটা ভরিয়া টৈয়ারি ঠাকিব। তোমার গরু টোমার অণ্টরে আবার স্থান পাইবে।

বুথ অন্তর আর অন্দর এই দুটো শব্দ একটু গোলমাল করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাতে খুব অসুবিধা হল না। নকুড় শান্ত হল।

সন্ধ্যার একটু পরে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা মাচায় গিয়ে উঠলাম। আমরা তিনজন। ইলিশ আর সঙ্গে নেই। সেটির সৎকার করা হয়েছে।

অরণ্যের অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাছে দূরে নানা রকম শব্দ হ'তে আরম্ভ হল। ঝোপে-ঝোপে জোনাকির বাহার। ঝিঁঝির ঐকতান।

ঠিক হল প্রথম রাতে মামা জেগে থাকবেন, তারপর বুথ।আমার জাগবার দরকার নেই। স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যেতে পারি। অবশ্য শিকারের খেলা শুরু হলে ঠিক ঘুম ভেঙে যাবে। বন্দুকের শব্দে। শিকারের অন্তিম আর্তনাদে কয়েক মাইলের মধ্যে লোকেরা জেগে উঠবে।

বুথ গাছের ডালে হেলান দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে অচেতন। অরণ্যের নানা শব্দের সঙ্গে আর একটা শব্দের যোগ হল। বুথের নাকের আওয়াজ।

বুথ সাহেবের কথামতো মামা আমার কোমরের সঙ্গে গাছের একটা মোটা ডাল খুব কষে বেঁধে দিয়েছিলেন। না হলে নতুন লোকের পক্ষে বিপদের সম্ভাবনা। খোলা জায়গায় বাঘ সিংহের উদাত্ত কণ্ঠস্বর খানদানি খেয়াল গাইয়ের চেয়েও ভয়ংকর। অনেকেই কাঁপতে শুরু করে। নিজের হাতপায়ের ওপর জোর থাকে না। তার ওপর আহত জন্তু যদি মাচা লক্ষ্য করে লাফ দেবার চেষ্টা করে, তাহলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সত্যতা প্রমাণিত করে হস্তচ্যুত ফলের

NOT FOR SALE

মতন অনেকেই টুপ করে মাটিতে পড়ে যায়। তবে শক্ত মাটিতে বেশীক্ষণ কষ্ট পেতে হয় না। পশুর কোমল পাকস্থলীতে নির্বিঘ্নে জীর্ণ হবার যথেষ্ট সময় পায়।

এইসব বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবার জন্যই এই বাঁধাবাঁধির ব্যবস্থা।

মামা জোড়াসন হয়ে বসে গীতা পাঠ করতে লাগলেন টর্চের আলোয়।

চুপচাপ একলা একলা বেশীক্ষণ ভাল লাগলো না। মামার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললাম, মামা, ও মামা।

মামা মুখ তুলে বললেন, বল।

আসবে তো?

অন্য কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকে তো আসবে।

তার মানে?

মানে, রাস্তায় আর কোন খাদ্যদ্রব্যের সন্ধান পেয়ে গেলে আর আসবে না। অবশ্য যদি আসল সিংহ হয়। অরি যদি বাঘ হয় তো নিশ্চয় একবার ঘুরে যাবে। বাঘের স্বভাব বামুন-পাড়ার যমুনা দাসীর মতন।

যমুনা মাসী, তুলনাটা হজম করতে পারলাম না।

হ্যাঁ, যমুনা মাসীর যদি তিনটে নেমন্তন্ন থাকে তো তিনটেতেই যান। শাক ভাজা থেকে সন্দেশ পর্যন্ত গলাধঃকরণ করেন। তারপর অবশ্য বাড়ি এসে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করেন, কিন্তু নেমন্তন্ন ছাড়েন না।

উত্তর দেবার আগেই অনেকগুলো পায়ের সম্মিলিত শব্দ। চমকে মুখ ফেরালাম। আলো-অন্ধকারে স্পষ্ট কিছু দেখা গেল না। মনে হল অনেকগুলো জন্তু যেন পাশাপাশি ছুটে চলে গেল।

ওগুলো কি মামা?

মামা এবারেও গীতা থেকে মুখ তুললেন না। বললেন, হরিণের পাল।

ওরকম ভাবে ছুটছে কেন মামা? পিছনে কি বাঘ-টাঘ আসছে?

শেষদিকে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও গলাটা একটু কেঁপে উঠল।

না, না, তাহলে আরও জোরে ছুটত। এ বোধ হয় নিজেদের মধ্যে কিৎ-কিৎ খেলছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। ধারে কাছে ব্যাঙের ভজন শোনা গেল। বড় অস্বস্তি বোধ হল। এমন নিস্তব্ধ পরিবেশে নিজের কণ্ঠস্বর শুনলেও মনে অনেকটা সাহস হয়।

দুটো চোখ কুঁচকে নকুড় সামন্তর গরুটার দিকে দেখলাম। কোন চাঞ্চল্য নেই, ভীতি নেই, ভবিষ্যতের চিন্তা নেই, নির্বিঘ্নে ঘাস চিবোচ্ছে। একেবারে মধ্যবিত্ত মার্কা। যেটুকু নাগালেরর মধ্যে, তাতেই আনন্দ।

NOT FOR SALE

আচ্ছা মামা— প্রশ্ন করলাম। উত্তর পাবার উৎসাহ ততটা ছিল না, ঔৎসুক্য ছিল নিজের কণ্ঠস্বর শোনার। এমন অবস্থায় নিজের কণ্ঠস্বর যেন দ্বিতীয় ব্যক্তি হয়ে ওঠে। মনে সাহস জোগায়।

কী, বল?

তুমি তো শিকারের বই ছাড়া পড় না। তবে গীতা পড়ছ যে?

এবার মামা পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে আমার দিকে দেখলেন। বোধ হয় আমার অজ্ঞতায় একটু বিস্মিতও হলেন। হেসে বললেন, গীতার চেয়েও বড় শিকারের কাহিনী আর আছে নাকি? ক'দিনে কত অক্ষৌহিনী খতম বল তো?

বিরক্তিকর মনে হল। একদিকে বুথ সাহেবের এই প্রগাঢ় নিদ্রা আর অন্য দিকে মামার ঔদাসীন্য। কারো সঙ্গে কথা বলবার উপায় নেই।

সবচেয়ে রাগ হল নেপথ্যের জন্তুটার ওপর। জন্তুকে কাপুরুষ বলা ব্যাকরণসম্মত কিনা জানি না, তবে অরণ্যে সবাই নিপাতনে সিদ্ধ হয়। জন্তুদের পেটে গেলে সিদ্ধ করারও প্রয়োজন হয় না।

জন্তুটার এভাবে দূরে সরে থাকার কোন মানে হয় না। এ তো শিকার নয়, এ যেন পরীক্ষার খবরের জন্য অপেক্ষা করা। কবে খবর বের হবে, কিছুই ঠিক নেই। মাঝখানে দুর্যোগের দুস্তর পারাবার। কিছুই অসম্ভব নয়, হয়তো নিজেরই ইংরাজী সেকেণ্ড পেপারের ঠোঙায় মুড়ি খেতে খেতে ইংরাজীর নম্বরের কথা ভেবে ম্রিয়মাণ হচ্ছি।

সেই রকম শিকার গাছের নিচেই কিনা কে জানে?

জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে ফ্যাকাশে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। সবকিছু উজ্জ্বল নয়, কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে। আলো-অন্ধকারে আরো যেন রহস্যময়।

গাছের নীচে চোখ ফিরিয়েই চমকে উঠলাম। ডোরাকাটা পীত রঙের কি একটা পড়ে রয়েছে।

বাঘ নয়, বাঘের শাবকই হবে। আকারে একটু ছোট।

এবারে অরণ্যে বিবিধ শব্দের সঙ্গে আরো একটা শব্দ বাড়ল। আমার হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকির শব্দ।

কথা বলতে গিয়ে দেখলাম, দঁতে দাঁতেও জলতরঙ্গ শুরু হয়েছে। অনেক কষ্টে উচ্চারণ করলাম।

মা—মাম্মা—

এবার মামার কণ্ঠে বিরক্তি ফুটে উঠল।

উঁ।

নীচে বা-বা—।

মামা বিচলিত হলেন। আমার পিতৃদেবের এই অরণ্যে, বিশেষ করে

NOT FOR SALE

রজনীর এই প্রহরে আসবার কথা নয়। তবে পিতৃস্নেহ। সন্তানের জন্য সবই করা সম্ভব।

মামা আমার দিকে হেলে বসলেন। নীচু হয়ে বার দুয়েক দেখার চেষ্টা করেই হাতের টর্চ জ্বালালেন।

তার আগেই অবশ্য আমি ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিয়েছি।

বাঘের বাচ্চা নীচে এসে বসে আছে।

আলোয় ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হয়ে গেল।

বাঘ নয়, তার বাচ্চাও নয়, বুথের মাফলার। ঘুমের ঘোরে কখন গলা থেকে খুলে পড়েছে।

সর্বনাশ, এখন উপায়। কে নেমে মাফলার আনতে যাবে?

মামাই সমস্যার সমাধান করে দিলেন।

এখন আনবার কোন দরকার নেই। ভোর হলে আনলেই চলবে।

তারপর মামা নিজের হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, এক কাজ কর, এবার বুথকে ডেকে দে। তার জাগার পালা। আমি ঘুমাব।

নির্দেশ দিয়ে মামা আর অপেক্ষা করলেন না। দুটি চোখ নিমীলিত করলেন।

অনেক ধাক্কাধাক্কির পর বুথ জাগলেন।

জেগেই বন্দুক তুলে ধরে বললেন, এক গুলিটে শেষ করিয়া ডিটেছি। যেডিকে আছে সেডিকে শুধু টুমি আমার বন্দুকের নলটা ঘুরাইয়া ডাও।

আমি বহু কষ্টে তাঁকে থামালাম। বোঝা গেল, একেবারে জাত-শিকারী। বললাম, ধৈর্য ধরুন। শিকার এখনও আসেনি। এবার মামার ঘুমবার সময়, তাই আপনাকে জাগিয়ে দিলাম।

বুথ বুঝলেন।

আমি বললাম, আপনার মাফলার নীচে পড়ে গিয়েছে। আমি হঠাৎ বাঘের বাচ্চা ভেবে একটু ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম।

বুথ হাত দিয়ে নিজের গলাটা একবার দেখলেন, তারপর নীচের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন, সবশেষে আমার দিকে চেয়ে অমায়িক হেসে বললেন, সবই জানি। আমি ইচ্ছা করিয়া নীচে ফেলিয়া ডিয়েছিলাম।

আপনি ইচ্ছা করে?

হ্যাঁ, যাটে ছোট কোন জন্তুজানোয়ার ভাবিয়া বড় জন্তু কাছে আসে।

নিজের মূর্খতায় অনুতপ্ত হলাম। শিকার সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানও আমার নেই। অনেক কষ্টে মামার কাছে বন্দুক ছোঁড়াটা শিখেছি। তাও হুররা দিয়ে। পুকুরে ভাসন্ত ডাব ছাড়া আর কিছু ঘায়েল করতে পারিনি।

একবার উড়ন্ত একটা বক মারতে গিয়ে কুসুমপুর বালিকা বিদ্যালয়ের হেডপণ্ডিত দীনবন্ধু ভটচাযকে অল্পের জন্য আহত করিনি।

NOT FOR SALE

বসে বসে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবছিলাম। যাও বা কোন রকমে একটা যোগাযোগ হল, তা শিকারই অনুপস্থিত। এ যেন গোয়ন্দাকে বাদ দিয়ে ডিটেকটিভ কাহিনী রচনার অপচেষ্টা।

অদ্ভুত একটা শব্দে চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। রামকেলী রাগে ক্ল্যারিওনেট আর বেহালা শোনা গেল, কাছে-পিঠে বোধহয় কোথাও যাত্রা শুরু হয়েছে।

এত শব্দে শিকার আসার কোন সম্ভাবনাই নেই। তারপর খেয়াল হল। যাত্রার আসরে নয়, বেহালা আর ক্ল্যারিওনেট বাজছে আমার দু'পাশ থেকে। মামা ক্ল্যারিওনেট, বুথ সাহেব বেহালা।

বুথ সাহেবের জেগে থাকার কথা, কিন্তু সেটা তাঁকে জাগিয়ে মনে করে দিতে হবে।

প্রতিজ্ঞা করলাম, আর এঁদের সঙ্গে শিকার নয়। এখন যদি হঠাৎ কিছু আসে, তাহলে আমি একলা জেগে রয়েছি। আমার সামর্থ্য পরিমিত। দুটো হাতই এমন কাঁপছে যে গুলি ছুঁড়লেই হয় মামা, নয় বুথ ঘায়েল হবেন।

আর বেশীক্ষণ ভাবতে হল না।

সামনে ছোট ছোট গাছের ঝোপ। মাঝখান দিয়ে কাঠুরেদের পায়ে-চলা পথ। ঠিক সেই পথ দিয়েই আসছে।

এখন চাঁদের আলো বেশ জোর। দেখবার কোন অসুবিধা নেই।

খুব মন্থর গতিতে, রাজকীয় চালে এগিয়ে আসছে একটি প্রমাণ সাইজ সিংহ। চাঁদের আলোয় নীল দুটি চোখ জ্বলছে। জিভটা ঝুলে পড়েছে। পরচুলা নয়, নিজের কেশর বলেই মনে হচ্ছে।

আমি নিজেকে ডালপালার আড়ালে সরিয়ে নিলাম। হঠাৎ চোখাচোখি না হয়। চাক্ষুষ পরিচয় থেকেই হৃদ্যতা হওয়া স্বাভাবিক। তারপর সান্নিধ্য কামনা করতে চাইলে তো দোষ দেওয়া যাবে না।

প্রবাদ আছে, যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়, কিন্তু যেখানে সিংহের ভয়, সেখানেও মানুষের সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে।

হয়তো সিংহটা একটু অন্যমনস্কই ছিল। পারিবারিক ঝঞ্ঝাটে বিপর্যস্ত। কিংবা নকুড় সামন্তের গোরুটাকে স্বপ্নে দেখছিল। ভোরের দিকের স্বপ্ন সত্যি ভেবে বেরিয়ে পড়েছে। রোজকার মতন।

কিন্তু মামা আর বুথই বাদ সাধলেন।

সম্মিলিত কনসার্টে সিংহ আকৃষ্ট হল। এগিয়ে একেবারে গাছের তলায় দাঁড়াল।

আমার শরীরে তখন ডবল ম্যালেরিয়া। সারা মাচা ঠকঠক করে কাঁপছে। সেই কম্পনে মামা আর বুথের নিদ্রাভঙ্গ হবার কথা, কিন্তু তা হল না। বরং দোলনায় শোয়া শিশুর মতন নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোতে লাগলেন।

NOT FOR SALE

সিংহ এগোচ্ছে। মুখটা তুলে একবার ওপর দিকে দেখল— যন্ত্রসঙ্গীতের উৎসের সন্ধানে।

আমি প্রায় মরিয়া। পাশে রাখা বুথ সাহেবের বন্দুকটা দু'হাতে জাপটে ধরেছি। হাতটা ভীষণ কাঁপছে। যতবার ট্রিগারে হাত রাখবার চেষ্টা করছি, হাতটা কনুইয়ে বাঁধা মাদুলির ওপর এসে পড়ছে। একবার গীতাটা ছোঁবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। সেটা মামার আওতায়।

আবার সিংহের দিকে দেখলাম। দেখে এবার আর চোখ ফেরাতে পারলাম না।

এক হাত দিয়ে দুটো চোখ ভাল করে মুছে নিলাম। আজব কাণ্ড। ভুল দেখছি না তো!

সিংহটা পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে নাসিকা-ধ্বনির তালে তালে নাচছে। সেই সঙ্গে মাথাটাও দোলাচ্ছে!

বইয়ে পড়েছিলাম, নরখাদকরা মানুষ খাবার আগে এক ধরনের আনন্দনৃত্য করে। এও কি তাই! শুধু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নয়, ঘুরে-ঘুরে সিংহ নাচতে লাগল। ঠিক গাছটাকে কেন্দ্র করে।

ওর মধ্যে আমি বার দু'য়েক শিকারীদের জাগাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বৃথা। ধ্বনিতরঙ্গ আরও বিচিত্র হল।

মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে সিংহটা চার পায়ে ভর দিয়ে একটু বিশ্রাম করে নিল, আবার দু'পায়ে সেই মনোরম নৃত্য।

খট।

শব্দ হতেই সিংহ থেমে গেল।

কিসের শব্দ আমি বুঝলাম। আমার হাত থেকে বুথের বন্দুকটা মাটিতে পড়ে গেছে। বন্দুকের খুব দোষ নেই। সর্বশরীর ঠকঠক করে কাঁপছে। সারা দেহ, জামাকাপড় ঘর্মাক্ত। সিংহ ছুটে গিয়ে বন্দুকটা মুখে করে তুলে নিল, তারপর আবার নির্ধারিত জায়গায় ফিরে গিয়ে সেই নাচ। এবার একটু রকমফের ছিল। সামনের থাবা দিয়ে বন্দুকটা আঁকড়ে ধরে মনোহর ভঙ্গীতে নাচ।

আমার পক্ষে শুধু প্রাণ-মাতানো নয়, দেহ-কাঁপানোও।

ভোরের অল্প আলো এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সিংহ যে পথে এসেছিল, সে পথেই ফিরে গেল! একা এসেছিল, গেল বুথের বন্দুক নিয়ে— নাচের ভঙ্গীতে।

আড়মোড়া ভেঙে দু'জনে জাগলেন।

প্রথমে মামা, তারপর বুথ।

দুজনকেই ঘটনাটা বললাম। অবশ্য একটু ধাতস্থ হয়ে।

NOT FOR SALE

মামা হাসলেন। বললেন, ছেলেমানুষ স্বপ্ন দেখেছিস। জঙ্গলে এরকম অদ্ভুত স্বপ্ন অনেকেই দেখে। আমাদের বরাত, শিকার এলো না। রাত জাগাই সার হল।

বুথের বন্দুকের কথা বললাম।

মামা আর কিছু বললেন না। হয়ত আমার জন্য একটু চিন্তিতই হলেন। কিন্তু বুথ বললেন, বুঝিয়াছি, খুব চিন্তাগ্রষ্ট বৃদ্ধ সিংহ। পরিবার প্রটি পালন করিবার সামর্থ্য নাই। পরিবারের কাছে নিট্য অপমানিট হইটেছে, টাই আত্মহট্যা করার জন্য বণ্ডুকটি লইয়া গিয়াছে। কয়েকডিন পর আসিয়া উহার মৃটডেহ লইয়া যাইবো।

বেশ কিছুদিন ব্যাপারটা নিয়ে আমিও একটু চিন্তিত ছিলাম। একসময় মনে হল, সত্যিই হয়তো উত্তেজনার মুহূর্তে সমস্ত ব্যাপারটা স্বপ্নই দেখেছি।

কয়েকদিন বাদে সংবাদপত্রের এক কোণে ছোট একটি খবর সব সন্দেহের নিরসন করল।

রেমন সার্কাস হইতে যে বৃদ্ধ সিংহটি নিখোঁজ হইয়াছিল, তাহাকে এতদিন পর সুন্দরবনের প্রান্তে পলাশপুর গ্রাম হইতে পাওয়া গিয়াছে। সিংহটি হাটে একটি বাদ্য-যন্ত্রের দোকানে চুপচাপ বসিয়াছিল। পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে এই সিংহ কথাকলি, ভারত নাট্যম ও ইংরাজী নৃত্যেও বিশেষ পারদর্শী ছিল। বাজনার তালে তালে দুই পায়ে নাচিয়া দর্শকদের বিমোহিত করিয়া দিত।

সিংহটি পাওয়া গেল কিন্তু বুথের বন্দুকটির কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। বুথও লণ্ডনে ফিরে যাননি। শিকার করাও ছেড়ে দিয়েছেন।

এখন তিনি ক্যানিংয়েই বাস করেন। সেখান থেকে কলিকাতায় ইলিশ মাছ চালান দেন।

—সমাপ্ত—

NOT FOR SALE

উদ্বন্ধন

বিছানার ওপর উঠে বসলেন মহেশ চক্রবর্তী। কান পেতে শুনলেন।

না কেউ জেগে নেই। সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। পাশের তক্তপোশের দিকে একবার চোখ ফেরালেন। জানালা দিয়ে চঁদের আলো এসে পড়েছে।

সেই আলোতেই দেখলেন মেদপুষ্ট এক শরীর নিশ্বাস প্রশ্বাসের তালে তালে সঙ্কুচিত স্ফীত হচ্ছে। পানের রস ঠোঁটের পাশ দিয়ে বিছানার ওপর গড়িয়ে পড়ছে। দু আনা সাইজের সিঙ্গাড়া প্যাটার্ন নাক থেকে বিচিত্র ধ্বনি বের হচ্ছে। মুখ যখন বন্ধ থাকে, তখন নাক সরব হয়। এই মাংসপিণ্ডের ব্যবহারিক নাম যোগমায়া। সামাজিক পরিচয়, মহেশ চক্রবর্তীর স্ত্রী। তাঁর অর্ধাঙ্গিনী।

দারুণ বিরক্তিতে মহেশবাবু মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভবে বাঁচার কোন অর্থ হয় না। আজ তিন দিন ধরে গালাগালির স্রোত চলেছে। হেনস্তার শেষ নেই। ছেলেমেয়েদের সামনে পর্যন্ত রেহাই নেই। অথচ মহেশ চক্রবর্তীর দোষটা এমন কিছু ভীষণ নয়।

রিটায়ার করেছেন বছর তিনেক আগে।

মহেশ চক্রবর্তী সজোরে হাতটা আঁকড়ে ধরতেই শ্যামসুন্দর হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, দোহাই বাবু, এবারটা মাপ করুন, আর কখনও এমন কাজ করব না।

ছেড়ে দেব? শ্যামসুন্দরের কোঁচাটা খুলে তার হাত দুটো শক্ত করে বেঁধে নিয়ে মহেশবাবু বললেন, আমার এত কষ্টের আমগাছ। বছরে গোটা দশ বারোর বেশী আম কোনবার খেতে পাই না। সব তোমাদের পেটে যায়।

বয়স হলে হবে কি, মহেশবাবু এখনও বেশ শক্তসামর্থ। তাঁর হাতের গোটা কয়েক কিল খেয়েই শ্যামসুন্দরের অবস্থা কাহিল।

মহেশবাবু আমগুলো কুড়িয়ে নিয়ে নিজের কাপড়ে বাঁধলেন, তারপর শ্যামসুন্দরকে ধাক্কা দিতে দিতে চললেন থানায়।

দুজনে থানায় যখন পৌঁছলেন তখন ভোর হয়ে এসেছে।

পাশের কোয়ার্টার থেকে দারোগাকে টেনে তুললেন। হাঁকডাকে আশপাশের দু'একজনও উঠে পড়ল। গোঁফে মোচড় দিয়ে বলাই দারোগা বলল, ব্যাপার কি চক্রবর্তী মশায়?

NOT FOR SALE

মহেশ চক্রবর্তী ব্যাপারটা সবিস্তারে বললেন, জীবনভোর মামলা-মকদ্দমা করে এসেছেন।

নিজের জমিজমা ছিল। ব-কলমে তেজারতি ব্যবসা নিজের কিছু না থাকলেও পরের মামলার তদারকি করেছেন। কাজেই বুঝলেন, শুধু আম চুরির মামলাটা তেমন জোর হবে না। আর একটু যোগ করে দিলেন। রাত্রে বাগান থেকে ফিরছিলেন, হঠাৎ খস খস শব্দ শুনে যেমন কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, অমনি এই ছোকরা হাতে রামদা নিয়ে লাফিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। ভয় পাবার লোক নয় মহেশ চক্রবর্তী। ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটার হাত থেকে দা-টা কেড়ে নিয়ে তারই কাপড় দিয়ে তাকে পিছুমোড়া করে বেঁধে এনেছেন।

এদিকে ভোর হতেই চক্রবর্তীর ঘরে হৈচৈ পড়ে গেল। চক্রবর্তী-গৃহিণী ভোরবেলা স্নান সেরে ঠাকুরঘরে ঢোকে। পাশের তক্তপোশে নজর পড়তেই থেমে গেল। সাতসকালে গেল কোথায় মানুষটা? চটি জোড়াও পড়ে আছে তক্তপোশের তলায়, ফতুয়াটা আলনায় ঝুলছে। তবে? স্নান না সেরে গৃহিণী একবার বাড়ির এদিক ওদিক দেখে এল। না, কোথাও নেই।

গাড়ুটাও নীচের দাওয়ায় বসানো রয়েছে।

গোয়ালঘরে উঁকি দিয়েই চমকে উঠল, সর্বনাশ, রাঙী গরুটা গেল কোথায়? বাছুরটা ঠিক বাঁধা রয়েছে।

গৃহিণীর হাঁকডাকে ছেলেরা উঠে পড়ল। চোখ মুছতে মুছতে ছেলের বৌ বেরিয়ে এল।—হ্যারে রাঙী গরুটা গেল কোথায়?

গোয়ালঘরের খিল খোলা। গৃহিণী শোকাতুর। দুবেলা কম দুধ দেয় রাঙীটা! আর দুধ কি! যেমন ঘন, তেমনি মিষ্টি। রাতারাতি গোয়াল থেকে গরুটা উধাও। ছুটির দিন, ছেলেরা খুঁজতে বেরোল। ঘণ্টাখানেক এপাড়া ওপাড়া ঘুরে ফিরে এল দুছেলে।

গৃহিণী পরামর্শ দিল, এক কাজ কর। থানায় একবার লিখিয়ে দিয়ে আয়। রাঙীর চেহারার বর্ণনা দিয়ে। বলবি, কাল রাত নটা সাড়ে নটায় নিজে আমি গোয়ালঘরে খিল দিয়ে এসেছি।

বড় ছেলেই গেল থানায়। ছেলে একটু এগোতেই চক্রবর্তী-গৃহিণীর মনে পড়ে গেল। ছুটে রাস্তায় এসে বলল, ও তুলসী, ওই সঙ্গে কর্তার কথাটাও বলে আসিস। ভোর থেকে তাঁকেও তো দেখছি না।

সে কি, তুলসী অবাক হয়ে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল। আশ্চর্য কাণ্ড। একসঙ্গে রাঙী আবার বাবা নিখোঁজ। রাঙী কুকুর হলেও বা মানে হত একটা। বাড়ির কর্তা সঙ্গে নিয়ে বেরোতেন প্রাতঃভ্রমণে। কিন্তু সকালবেলা দড়ি হাতে গরুকে নিয়ে মর্নিং-ওয়াকের রেওয়াজ এখনও চলন হয়নি।

NOT FOR SALE

চিন্তিত হয়ে পড়ল তুলসী। নেশাখোর মানুষ। নেশাভাং করে কোথায় পড়ে আছে ঠিক কি।

থানার কাছ বরাবর যেতেই বাপের সঙ্গে তুলসীর দেখা হয়ে গেল। দারোগার পাশে এক চেয়ারে বসে আছেন। দুজনের মুখে দুটো ভুতো বোম্বাই। সামনে দাঁড়িয়ে কৈবর্ত পাড়ার শ্যাম। কোমরে দড়ি। রাঙী ধারে কাছে কোথাও নেই।

শ্যামসুন্দরকে দারোগার জিম্মায় রেখে বাপ আর ছেলে দুজনেই ফিরে এল।

গৃহিণী ঘর আর বার করছিল। স্বামীর দিকে আড়চোখে একবার দেখে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল, হ্যারে, রাঙীর কোন খোঁজ পেলি?

না, না। থানায় ডায়েরী করে এসেছি। খোঁয়াড়ে যদি এসে পৌঁছয় তো পুলিশ দিয়ে পাঠিয়ে দেবে বাড়িতে।

ছেলে পাশ কাটল। যোগমায়া মহেশবাবুর দিকে আর একবার চোখ তুলেই চেঁচিয়ে উঠল, এসেছে, এসেছে।

মহেশবাবু পিছন ফিরে দেখলেন, বাঁশের আগল ঠেলে রাঙী ভেতরে ঢুকছে। সারা গায়ে কাদা। বাইরে নিশাযাপনের নিশানা।

রাঙীকে গোয়ালঘরে পুরতে গিয়ে মহেশ-গৃহিণীর খেয়াল হল, হ্যারে সর্বনাশী, গলার দড়ি কোথায় ঘুচিয়ে এসেছিস? বাঁধব কিসে?

এতক্ষণ মহেশ চক্রবর্তী চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন।

তাঁকে বাদ দিয়ে গরুকে অভ্যর্থনার ভঙ্গী তাঁর মোটেই প্রীতিপদ ঠেকছিল না। এবার গম্ভীর গলায় বললেন, শোন।

গৃহিণী রাঙীকে গোয়ালে ঢুকিয়ে খিল দিয়ে দিলেন, তারপর স্বামীর কাছে এসে দাঁড়ালেন।

দড়ি কোথায় দেখবে এস।

মহেশবাবু আগে চললেন, স্ত্রী পিছনে পিছনে।

আমগাছতলায় এসে মহেশবাবু আঙুল দিয়ে দেখালেন, ওই দেখ দড়ি।

কিন্তু গরুর গলার দড়ি ওখানে এল কি করে? গৃহিণী ভ্রূ কোঁচকালেন।

মহেশবাবুর গলার স্বর গম্ভীর। আস্তে আস্তে বললেন। স্ত্রীর দিকে না চেয়ে।

আমি গরুর গলা থেকে খুলে ওখানে বেঁধেছি মাঝরাতে। কথার শেষে মহেশবাবু দীর্ঘঃশ্বাস ফেললেন। পাঁজর কাঁপিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে যোগমায়ার দুটি চোখ ছলছলিয়ে এল। আঁচল দিয়ে চোখ দুটো চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল।

NOT FOR SALE

সমস্ত ক্লেদ, সমস্ত অপমান, জ্বালা নিঃশেষে মুছে গেল মহেশবাবুর অন্তর থেকে। সংসার আবার উপবন মনে হল। এইটুকুই তিনি চেয়েছিলেন। এই সহানুভূতিটুকু আর দু ফোঁটা চোখের জল।

অনেক দিনের পুরোনো একটা নাম ধরে দরদী গলায় স্ত্রীকে ডাকতে গিয়েই মহেশবাবু থেমে গেলেন। যোগমায়ার কাংস্য কণ্ঠে।

আর গাছ পেলে না তুমি? বাগানে এত গাছ থাকতে এই আমগাছের ডালে সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলে? এ গাছে কিছু হলে, ভয়ে কেউ আর এ গাছের আম মুখে দিত? অলক্ষণে গাছ বলে তুলসী হয়তো কেটেই ফেলত গাছটা। শত্তুর না হলে এ গাছে এমন কাজ কেউ করতে যায়? গলায় দড়ি, গলায় দড়ি।

—সমাপ্ত—

NOT FOR SALE

মিঠুর কীর্তি

মীনাক্ষীকে চেন? যার ডাকনাম মিঠু।

মিঠুকে আমি কোনদিন দুপায়ে স্থির হয়ে কোথাও দাঁড়াতে দেখিনি। চঞ্চল প্রজাপতির মতন সর্বদাই যেন উড়ছে।

প্রথম দিন আমার সঙ্গে যখন দেখা, পরনে নীল একটা ফ্রক, বব করা চুল, ফর্সা মেয়ে সামনে এসে বলল, তুমি বুঝি গল্প লেখ?

আমি বললাম, হাঁ।

মিঠুর দ্বিতীয় প্রশ্ন, কি নিয়ে গল্প লেখ?

ভূত, প্রেত, দত্যি, দানা।

মিঠু বিস্ময়ে চোখ দুটি বিস্ফারিত করে বলল, ওমা, মানুষ নিয়ে লেখ না?

বললাম, তাও লিখি।

তাহলে আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখবে, কেমন?

উত্তর দিলাম, তোমার সম্বন্ধে তো আমি কিছুই জানি না। তুমি কোথায় পড়, তোমার কজন বন্ধু, সে সব আমাকে বল, তবে তো আমার গল্প লিখতে সুবিধা হবে।

মিঠু আমার সামনে থেকে সরে গিয়ে তরতর করে জানলায় উঠে পড়ে বলল, শোন, তা হলে আমার কথা। আমার খারাপ নামটা তো জানই, ভাল নাম হচ্ছে মীনাক্ষী ব্যানার্জী। আমি নিউ হরাইজনে পড়ি। আমার অনেক বন্ধু, তাদের মধ্যে তিনজন হচ্ছে খুব কাছের। তাদের নাম, উজ্জয়িনী, সুপর্ণা আর শ্রাবণী।

আমি কথা বলতে গিয়ে দেখলাম, মিঠু জানলায় নেই, উঠানে নেমে ঘুরপাক খাচ্ছে।

বললাম, কিন্তু তোমার বিশেষ বন্ধু তো আরও আছে?

নাচ থামিয়ে মিঠু দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করল, কে?

ওই যে, তোমাদের বাড়ির পাশে থাকে। দুজন হিন্দস্থানী মেয়ে— দুলারি আর লছমি।

NOT FOR SALE

মিঠু কোমরে দুটো হাত রেখে আমার দিকে কটমট করে দেখল। ওরা আমার বন্ধু? মোটেই নয়। ওরা এখন আমার শত্রু। ওরা কি করেছে জান?

বললাম, তুমি না বললে কি করে জানব?

মিঠু উঠান থেকে উঠে এসে আমার চেয়ার ধরে দাঁড়াল। আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, শোন, তবে বলছি। মিলিকে তো চেন, আমার পিসতুতো বোন?

ঘাড় নেড়ে বললাম, হাঁ, চিনি।

ওই দুলারি আর লছমি একদিন আমাদের দুজনকে বললে, এই, শরবত খাবি? এই গরমে কে না শরবত খেতে চায় বল? আমরা বললাম, হাঁ, খাব। লছমি বলল, তাহলে আমাদের ছাদে চলে আয়। আমি আর মিলি তখনই ওদের ছাদে গিয়ে হাজির।

ওদের বাবা সাদা সাদা বড়ি এনে দিয়েছেন। গ্লাসে জল দিয়ে এক একটা বড়ি ফেলে দিতেই কি চমৎকার লাল, হলুদ, সবুজ শরবত হয়ে গেল। চিনি মেশাতে হয় না। কি মিষ্টি! আমি আর মিলি পর পর চার গ্লাস শরবত খেলাম। আরও ইচ্ছা করছিল, কিন্তু পরের বাড়ি গিয়ে বেশি খাওয়া কি উচিত, বল?

নিশ্চয় নয়।

শোন, তারপর কি হল। দুলারি বলল, তোমরা এক একজন চার গ্লাস শরবত খেয়েছ। এক গ্লাসের দাম চার আনা। কাজেই তোমরা এক একজন এক টাকা করে দেবে। এখনই বরং নিয়ে এস। বাকীতে কারবার করলে ঠকতে হয়। শুনলে কথা!

শুনলাম বই কি।

এক টাকা আমি কোথায় পাব? মার কাছে গিয়ে যদি বলি, পরের বাড়িতে গিয়ে শরবত খেয়েছি, তার জন্য এক টাকা দাও, তাহলে মা আমাকে টুকরো টুকরো করে কাটবে। তাই মিলিকে বললাম, কি হবে ভাই?

মিলি বলল, ঠিক আছে। টিফিনের পয়সা থেকে পাঁচ টাকা জমিয়েছি। তা থেকে দু টাকা ওদের দিয়ে দেব। কিন্তু ওদের বাড়ি আর কোনদিন যাব না। আড়ি, আড়ি, আড়ি। বল, ঠিক করিনি আমরা?

এরপর মিঠুর সঙ্গে দেখা হল দিন পনের পর। সে স্কিপিং করছিল, আমাকে দেখে স্কিপিং থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি, আমার গল্প কতদূর লিখছ?

NOT FOR SALE

বললাম, আর বল না, লোড-শেডিং-এর জন্য লিখতেই পারছি না। খাতা কলম খুলে বসলাম, হঠাৎ সব অন্ধকার। ঘণ্টা তিন চারের মতন আলোর দেখা নেই।

মিঠু হেসে উঠল।

লোড-শেডিং-এর জন্য আমাদের বাড়ি যা কাণ্ড হয়েছে।

কি হল আবার?

দড়ি রেখে মিঠু আমার পাশে বসল। আমি ছাদে ঘুড়ি ওড়ানো দেখছিলাম, যদি একটা কেটে হাতের কাছে আসে। পিসী দুটো দাঁত তুলিয়েছিল, মা দেখতে গেছে পিসীকে। এমন সময় নীচ থেকে বাবার চিৎকার কানে এল। তুমি তো জান, রিটায়ার করার পর বাবা রোজ লাইব্রেরীতে যায়। সকালে যায় আর বিকেলে ফেরে। বাবা একদম চেঁচামেচি করে না। তাই আমি ভাবলাম, কি আবার হল?

ছাদ থেকে নেমে দেখি, সব অন্ধকার। কখন লোড-শেডিং শুরু হয়েছে। শোবার ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বাবা চেঁচাচ্ছে— ধন্য ঘুম বটে। কুড়ি মিনিট ধরে এক কাপ চায়ের জন্য চেঁচাচ্ছি, তা কানেই যাচ্ছে না। ঘর অন্ধকার, একটা মোমবাতি জ্বেলেও তো রাখতে পার। মিঠু, বাবলি, ওঠানামা করতে গিয়ে কখন পড়ে গিয়ে একটা কাণ্ড বাধাবে।

বাবলি আমার দিদির নাম। তার সঙ্গে আমার ভাব একটু কম। তবে অন্ধকারে সিঁড়িতে ওঠানামা করতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না, কারণ, সব ধাপ আমাদের মুখস্থ।

কি হল, ওঠ, সাড়ে ছটা বেজে গেছে। এখনও ঘুম! অন্ধকার না হলে আমি নিজেই চা তৈরি করে নিতাম। অন্ধকারে রান্নাঘরে কোথায় কি আছে, খুঁজে পাব না, তাই বলছি।

আমার নিজেরই আশ্চর্য লাগল, কারণ, মা দিনের বেলা একেবারেই ঘুমায় না। বই নিয়ে কিংবা সেলাই নিয়ে বসে থাকে।

আমি তাড়াতাড়ি পড়ার ঘরে ঢুকে হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে বাবার পাশে দাঁড়ালাম।

খাটের ওপর আলো পড়তেই বাবা বলল, দেখ দেখি কাণ্ড, এতক্ষণ আমি মিছামিছি চেঁচিয়ে যাচ্ছি।

আমিও দেখলাম। খাটের ওপর মা নয়, একটা পাশবালিশ।

অন্ধকারে মা ভেবে বাবা তার সঙ্গেই কথা বলে চলেছে।

ইতিমধ্যে পিসীর বাড়ি থেকে মা এসে হাজির। সব শুনে মা মহাখাপ্পা।

NOT FOR SALE

ওই পাশবালিশটাকে তুমি কি বলে আমি ভাবলে? আমার কি ওরকম বদখত সাইজ?

বাবা অপ্রস্তুত।

আরে লোড-শেডিং-এর অন্ধকারে কিছু কি ভাল করে দেখা যায়?

হাজার লোড-শেডিং হোক, তা বলে পাশবালিশের সঙ্গে আমাকে ভুল করবে?

মিঠুর কথা শুনে খুব হাসলাম।

মিঠু বলল, জান, আরও ব্যাপার আছে।

কিরকম?

ক্লাসে দিদিমণি রচনা লিখতে দিয়েছিলেন, কলকাতার বৈশিষ্ট্য। আমি অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম, কি লিখব। তুমি তো জান, আমি কার্শিয়াং-এ জন্মেছি। তারপর সেখান থেকে বাবা গৌহাটিতে বদলি হয়েছে। কলকাতায় তো আমরা সবে এসেছি। এ শহরের আর কতটুকু জানি। অনেক ভেবেচিন্তে লিখলাম, গর্তময়ী কলকাতার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য লোড-শেডিং। অন্ধকারে ধনী-দরিদ্র, সব ধর্মের লোক একাকার হয়ে যায়। জাতিভেদ, বর্ণভেদ মুছে যায়।

ভালই তো লিখেছ।

তুমি ভাল বললে হবে কি, দিদিমণি খুব কম নম্বর দিয়ে বললেন, পাকা মেয়ে।

মিঠুকে রাগাবার জন্য বললাম, তোমার দুটি বন্ধু দুলারি আর লছমি-র খবর কি?

মিঠু চোখ পাকিয়ে বলল, আবার তুমি ওদের আমার বন্ধু বলছ? বলেছি না, ওরা আমার শত্রু।

আমি বললাম, কিন্তু লোড-শেডিংয়ের যুগে তুমিই তো লিখেছ, মানুষে মানুষে সব প্রভেদ ঘুচে যায়। শত্রু-মিত্র এক হয়ে যায়।

ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রেখে মিঠু কিছুক্ষণ কি ভাবল। বোধহয় আমার কথার কি উত্তর দেবে, তাই মনে মনে ঠিক করে ফেলল। তারপর বলল, চিরশত্রুরা কখনও মিত্র হয় না। দেখ না, ওদের আমি কিরকম জব্দ করি।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে যেতে আমাকে প্রশ্ন করল, আমাকে নিয়ে গল্প লিখবে তো?

নিশ্চয় লিখব। লোড-শেডিং একটু কমলেই লিখতে শুরু করব।

দিনের বেলা তো লিখতে পার?

NOT FOR SALE

দিনের বেলা?

হ্যাঁ, সূর্যের তো এখন লোড শেডিং আরম্ভ হয়নি!

স্বীকার করলাম, তা অবশ্য আরম্ভ হয়নি। তবে কি জান, এই গরমে পাখা বন্ধ হলেও বড় কষ্ট হয়।

বিস্ময়ে মিঠু নিজের দুটো চোখ প্রায় কপালে তুলল। জান, একদিন আমি ক্লাসে চেয়ারে হেলান দিয়েছিলাম বলে দিদিমণি আমাকে কি বকুনিই দিলেন। বললেন, এই বয়েসে এত আরামপ্রিয় হয়েছ কেন? হেলান না দিয়ে বসতে পার না? এই জন্য বাঙালী জাতটার কিছু হল না। তোমার কথা শুনলে দিদিমণি কি করবেন তাই ভাবছি।

কি করবেন বল তো? ক্লাস থেকে বের করে দেবেন?

তুমি তো আর আমাদের ক্লাসে পড় না, কাজেই ক্লাস থেকে বের করে দেবেন কি করে? দিদিমণি নির্ঘাত অজ্ঞান হয়ে যেতেন।

অজ্ঞান?

হ্যাঁ, বাঙালীদের ভবিষ্যৎ ভেবে। কেন, তুমি একটা হাতপাখা কিনতে পার না? পাখা নাড়বে আর লিখবে।

মৃদুকণ্ঠে বললাম, পাখার দিকে মনটা চলে যায় তো, লেখাটা ভাল জমে না।

মিঠু একটা আঙুল তার গালে ঠেকিয়ে বলল, কি বলছ তুমি? রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষদ যখন লেখা হয়, তখন তো আর ইলেকট্রিক ফ্যান ছিল না। তালপাখাই তো সম্বল। রামায়ণ, মহাভারত বুঝি জমেনি!

মুশকিলে পড়ে গেলাম।

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, কার সঙ্গে কার তুলনা করছ মিঠু। বাল্মিকী, বেদব্যাসের সঙ্গে আমার তুলনা? তাঁরা সব মহাপুরুষ। মিঠু কিছুক্ষণ কিছু বলল না। স্কিপিং করতে শুরু করল।

আমি চলে যাচ্ছি দেখে বলল, তুমি কিন্তু আর দেরি কর না। গল্পটা আরম্ভ করে দাও। আমি ক্লাসের সব বন্ধুদের বলে ফেলেছি, তুমি আমাকে নিয়ে গল্প লিখছ। না লিখলে আমার অবস্থা তাদের কাছে কি হবে বুঝতে পেরেছ?

পেরেছি বই কি! তুমি নিশ্চিন্ত থাক, দশ বার দিনের মধ্যে আমি গল্পটা লিখে ফেলব।

লিখে কিন্তু আমাকে শুনিয়ে যাবে।

NOT FOR SALE

এরপর অফিসের কাজে দিল্লী গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, দিন সাতেকের মধ্যে কাজটা হয়ে যাবে। কিন্তু তা হল না। দিন কুড়ি লেগে গেল। ফিরে আসার দিন দশেক পরে মিঠুদের বাড়িতে গেলাম।

মিঠু বাড়িতে নেই। তাদের স্কুলে কি একটা উৎসব, সেখানে গেছে।

যখন নেমে আসছি, তখন মিঠু সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। মিঠু উঠছে, কিন্তু সিঁড়ির প্রত্যেক ধাপে পা দিয়ে নয়, মেল ট্রেন যেমন ছোট স্টেশনে থামে না, তেমনি মিঠুর পা সব ধাপে ঠেকছে না। আর একটু হলে আমার সঙ্গে ধাক্কা লেগে যেত।

কে? মিঠুর বিরক্ত কণ্ঠ।

আস্তে বললাম, আমি।

প্রথমে মিঠু অতটা বুঝতে পারেনি। দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর চোখ কুঁচকে আমাকে দেখে বলল, আরে তুমি কতদিন আসনি!

হ্যাঁ, অফিসের কাজে দিল্লী গিয়েছিলাম।

কথাটা মিঠু বিশ্বাস করল না।

বলল, অফিসের কাজে, না আমার গল্প শেষ করার ভয়ে?

মাথা নেড়ে বললাম, উঁহু, তোমার গল্প তো প্রায় শেষ।

ভেবেছিলাম, কথাটা শুনে মিঠু খুশী হবে। কিন্তু না, বরং একটু রেগেই গেল। ওই তোমার একটা দোষ। সব ব্যাপারে বড় তাড়াহুড়ো কর।

বিপদে পড়ে গেলাম।

মিঠু আবার জিজ্ঞাসা করল, একেবারে শেষ করে ফেলেছ? তলায় সমাপ্ত লিখে দিয়েছ?

অন্ধকারে আশার আলো দেখতে পেলাম। মাথা নেড়ে বললাম, না, না, তোমাকে জিজ্ঞাসা না করে শেষ করতে পারি কখনও? বললাম যে, প্রায় শেষ।

ভালই হয়েছে, ওপরে এস, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

মিঠু হাত ধরে আবার ওপরে নিয়ে এল। তার পড়ার ঘরে।

এই ঘরে সে আর তার দিদি বাবলি দুজনে পড়ে। বাবলি ডায়োসেসনের ছাত্রী। ইতিমধ্যেই সে পড়া শুরু করে দিয়েছে।

মিঠুকে আড়চোখে দেখে বাবলি বলল, এই আসা হল? কতক্ষণ সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

মিঠু দিদির কথায় বিশেষ ভ্রূক্ষেপ না করে আমাকে বলল, তুমি একটু বস, আমি মুখ-হাত ধুয়ে এখনই আসছি।

NOT FOR SALE

যেতে গিয়েও চৌকাঠ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সাবধান করে দিল, চুপ করে বস। আমার বইতে যেন হাত দিও না। ওর মধ্যে জলছবি আছে।

মিঠু ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বাবলি প্রশ্ন করল, তুমি বুঝি মিঠুকে নিয়ে গল্প লিখছ?

হ্যাঁ, সেই রকম ফরমাশ দিয়েছে।

সে গল্পে আমি আছি?

বিশেষ নয়। মিঠু বলে দিয়েছে তোমার নাম যেন বেশী না থাকে।

কি হিংসুটে মেয়ে দেখেছ? ভালই হয়েছে বাবা, ওর গল্পে আমার থেকেও কাজ নেই। কি করে আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে তার মতলব খুঁজছে। পান থেকে চুন খসলেই অমনি মার কাছে আমার নামে নালিশ। সেদিন কি করেছে জান—

বাইরে পায়ের শব্দ হতেই বাবলি তাড়াতাড়ি নিজের পড়ার বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

মিঠু ঘরে ঢুকল তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে।

বাবলি দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, এই, আমার তোয়ালে নিয়েছিস যে বড়? তোরটা লাল বর্ডার দেওয়া, আমারটা সবুজ।

মুখ মুছে তোয়ালেটা কোণের চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে মিঠু চোখ পাকিয়ে বলল, ছি ছি, এই জন্যই বাঙালী জাতের কিছু হল না। সামান্য একটা তোয়ালে নিয়ে ছোট বোনের সঙ্গে ঝগড়া করতে লজ্জা করে না?

বাবলি কিছু বলার আগেই মিঠু আমার কাছে এসে বলল, চল, আমরা বারান্দায় গিয়ে বসি। এখানে কথা বললে যদি ওর পড়ার ক্ষতি হয়!

আমি বললাম, কিন্তু মিঠু, এখন গল্প করলে তোমার পড়ার ক্ষতি হবে না তো?

মিঠু হাসল, না, না, স্কুলের স্পোর্টস-এর জন্য কাল-পরশু আমার ছুটি। চল।

বারান্দায় গোটা তিনেক বেতের চেয়ার পাতা ছিল। দুটোতে আমরা দুজন বসলাম। পাশাপাশি।

মিঠু বলতে শুরু করল, সেই দুলারি আর লছমির কথা বলেছিলাম, তোমার মনে আছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব মনে আছে। এই তো পাশের বাড়ির মেয়ে। যারা শরবত খাইয়ে তোমাদের কাছ থেকে পয়সা নিয়েছিল।

NOT FOR SALE

মিঠু খুব খুশী হল।— তোমার স্মরণশক্তি তো বেশ ভাল। সেই জন্যই লেখক হতে পেরেছ। তুমি খুব ভোরে ওঠ, তাই না?

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন বল তো?

বাবা রোজ আমাকে বলে কিনা, ভোরে উঠে পড়বি, তাহলে স্মরণশক্তি ভাল হবে।

যাক, তোমার গল্পটা বল।

আমি অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম, দুলারি আর লছমিকে জব্দ করতে হবে। শেষকালে আমি আর মিলি বসে বসে একটা মতলব ঠিক করলাম। অবশ্য কাজলদিও আমাকে খুব সাহায্য করেছে।

কাজল মিঠুর মেজদি। উপস্থিত পাইকপাড়ার এক স্কুলের শিক্ষিকা। জান, দিন পনের আগে আমি গিয়ে দুলারি আর লছমিকে বলে এলাম আমাদের বাড়ি আসার জন্য। ম্যাজিকের ব্যবস্থা হয়েছে। ওরা ছুটে এল। ওদের আমার পড়বার ঘরে বসালাম। ওরা খোঁজ করল, ম্যাজিক কখন শুরু হবে। আমি বললাম, দাঁড়া, সন্ধ্যা হোক। দিনের বেলায় কি ম্যাজিক জমে?

সন্ধ্যা হল। সঙ্গে সঙ্গে লোডশেডিং। আমরা জানতাম, সোম, বুধ আর শুক্রবার বাতি নিভে যায়। সব জানলা দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম, তাই একেবারে ঘন অন্ধকার।

এদিকের দরজা দিয়ে বের হয়ে পিছনের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছিলাম, যাতে ওরা বেরিয়ে না যেতে পারে।

সব ব্যবস্থা ঠিক হতে আমি গম্ভীর গলায় বললাম, এবার ম্যাজিক শুরু হবে। এ কিন্তু একেবারে অন্য ধরনের ম্যাজিক। ভূত-প্রেতের কারবার। তোমাদের মৃত কোন আত্মীয়ের সঙ্গে যদি কথা বলতে চাও, তাও পারবে। তবে সে আত্মীয় যদি এক বছরের মধ্যে মারা গিয়ে থাকেন। তার চেয়ে পুরোনো মৃতদের ডাকা সম্ভব নয়। কারণ তাদের আত্মা অন্য কোথাও জন্ম নিয়ে নেয়।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ওরা দুজনে খুব ভয় পেয়েছে। তবু লছমি বলল, সব বাজে কথা।

কিন্তু তার গলা বেশ কাঁপছিল।

দুলারি বলল, আমার ঠাকুমা মাস সাতেক হল মারা গেছে। তাকে আনতে পারবে?

নিশ্চয়। তোমরা দুজনে চুপ করে বসে তোমাদের ঠাকুমার কথা চিন্তা কর, আমি তাকে এনে দিচ্ছি।

NOT FOR SALE

মিনিট দশেক চুপচাপ। হঠাৎ ঘরের কোণে কালো পর্দার পিছনে আলো জ্বলে উঠল। খুব কমজোর আলো। আলো একদিক থেকে সরতে সরতে মাঝখানে স্থির হয়ে রইল।

খনা গলায় হিন্দুস্থানী ভাষায় শোনা গেল, এ লছমিয়া, এ দুলারিয়া, কেন ডেকেছিস আমায়?

অন্ধকারে লছমি আর দুলারির ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম।

ফিসফিস করে বললাম, কিছু জিজ্ঞাসা করবি তো কর। বেশিক্ষণ তোর ঠাকুমাকে আটকে রাখতে পারব না।

দুলারি বলল, ঠাকুমা কোথায় মারা গেছে জিজ্ঞাসা কর। ঠাকুমা কথাটা শুনতে পেয়েছিল। খিঁচিয়ে উঠল, কেন, জানিস না? আজেবাজে কথা জিজ্ঞাসা করিস কেন? মুঙ্গেরে মারা গেছি, দম আটকে। ছাতু খাবার সময়।

লছমি বলল, আশ্চর্য! ঠিক কথা। এ নিশ্চয় ঠাকুমার আত্মা। মিঠু তো এসব জানে না।

লছমিই বলল, তুমি আমাদের ভালবাস ঠাকুমা? আমাদের দুজনকে? ঠাকুমা চিৎকার করে উঠল, আলোটাও কেঁপে উঠল সেই সঙ্গে। ভালবাসি? তোরা ভালবাসার যোগ্য? দুপুরবেলা একটু চোখ বোজবার উপায় ছিল না। খাটিয়ার তলায় রাখা পেয়ারাগুলো দু-বোন মিলে চুরি করে খেতিস। খুটখাট শব্দে ঘুম ভেঙে যেত। ইচ্ছে করে তোদের দুটোর গলা টিপে ধরি।

পর্দাটা খুব জোরে দুলে উঠল।

আর দুলারি, তুই আমার কাঠের চিরুনি লুকিয়ে রাখতিস কেন? আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান হতাম, আর তুই হাসতিস দাঁত বের করে। তোদের ছাড়ব ভেবেছিস।

দরজায় দুমদাম শব্দ।

আমি ভাবলাম, এই রে, কেউ বুঝি বাইরে থেকে ধাক্কা দিচ্ছে। কিন্তু এ সময় তো কারুর আসার কথা নয়। মা আর বাবা দুজনেই গেছে মামার বাড়ি। রাত দশটার আগে ফেরার সম্ভাবনা কম। বাবলিও গেছে তাদের সঙ্গে।

একটু পরেই বুঝতে পারলাম।

লছমি আর দুলারি ভিতর থেকে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে বাইরে যাবার জন্য।

খুলে দাও, খুলে দাও, আমরা বাড়ি যাব।

দরজা আমি বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছি, কাজেই খোলার প্রশ্ন নেই। তাছাড়া এত সহজে ওদের দুজনকে আমি ছাড়তেও রাজী ছিলাম না। মিলি আমার কানে কানে বলল, এখন ছাড়া হবে না।

NOT FOR SALE

পর্দার পিছনে আবার খনা গলা বেজে উঠল, যেদিন আমি মারা গেলাম সেদিন কি ঝড়বৃষ্টি! আমার জন্য যখন সবাই কাঁদছিল, তখন তোরা দুটোতে তাকের উপর রাখা মাটির ভাঁড় থেকে খুচরো পয়সা সরাচ্ছিলি। সব আমি টের পেয়েছি। তোদের মা দেখতে পেয়ে ধমক দিয়ে ভাঁড় সরিয়ে রেখেছিল। আজ তোদের বাগে পেয়েছি। কিছুতেই ছাড়ছি না। দুজনের ঘাড় মটকে রক্ত খাব। তোদের স্বভাব এখনও যায়নি। আবার শরবত খাইয়ে পয়সা নেওয়া শুরু করেছিস। দাঁড়া, দেখাচ্ছি তোদের।

পর্দার আড়ালে আলোটা ছুটোছুটি করতে লাগল।

হঠাৎ দুম করে শব্দ। আর সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে উঠল। দুলারি অজ্ঞান হয়ে দরজার গোড়ায় পড়ে আছে। আর লছমি দু হাতে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে কাঁদছে।

সর্বনাশ, এ তো আচ্ছা বিপদ হল।

পর্দা সরিয়ে কাজলদি বেরিয়ে এল। ব্যাপার দেখে ছুটে বের হয়ে গেল বাইরে। একটু পরে ফিরে এল। হাতে স্মেলিং-সল্ট-এর শিশি।

মিনিট পনের পর দুলারির জ্ঞান হল, লছমির কান্না থামল। অনেক বুঝিয়ে তাদের বাড়ি পাঠানো হল।

বলে দিলাম, খবরদার, এসব কথা বাড়িতে একদম বলবে না। বললেই তোমার ঠাকুমা গলা টিপে ধরবে। কেউ বাঁচাতে পারবে না। দুলারি আর লছমি দুজনেই প্রতিজ্ঞা করল, জীবনে কোনদিন তারা আজকের কথা কাউকে বলবে না। প্রাণের মায়া তাদের কম নয়।

মিঠু হেসে উঠল।

কেমন জব্দ করেছি বল তো। তারপর থেকে ওরা দুজনে আর এদিকে আসে না। চোখে চোখ পড়লেই সরে যায়। কদিন আগে ওদের ছোট ভাইকে দিয়ে দুটো টাকা ফেরত দিয়ে গেছে। শরবতের দাম।

আমি বললাম, আমি জানি, কাজল খুব ভাল হিন্দী বলতে পারে। পর্দার আড়ালে টর্চ জ্বেলে সেই এসব কথা বলছিল। কিন্তু একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না।

কি?

দুলারি আর লছমি সম্বন্ধে এত কথা তোমরা জানলে কি করে?

মিঠু আমার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, কথাটা মা কিংবা বাবাকে বলে দেবে না তো?

উহুঁ, তা কখনও বলতে পারি।

NOT FOR SALE

তবে শোন। ওদের মা এক দুপুরবেলা আমার মায়ের কাছে এসেছিল সোয়েটারের প্যাটার্ন শিখতে। নিজের শাশুড়ির সঙ্গে ওদের মার একটুও বনিবনা ছিল না। বুড়ি নাকি ভারি খিটখিটে ছিল। সর্বদা ঝগড়া করত। তাই বসে বসে তার সব কথা মাকে বলছিল। আমি মার কাছে বসেছিলাম। কাজেই সব কথা আমার কানে গিয়েছিল। তারপর মিলি, আমি আর কাজলদি বসে এই মতলব বের করেছিলাম। কেমন মতলবটা বল তো?

আমি কিছু না বলে উঠে দাঁড়ালাম।

মিঠু আমার সঙ্গে সিঁড়ি অবধি এসে বলল, এবার তাহলে গল্পটা লিখে ফেলবে, বুঝেছ?

আমি ঘাড় নাড়বার আগেই ওপর থেকে মিঠুর মায়ের গলা শোনা গেল, এই মিঠু, পড়তে বসেছিস?

সঙ্গে সঙ্গে মিঠু উত্তর দিল, এইবার বসব মা, এতক্ষণ পিসেমশাই বকবক করছিল বলে বসতে পারিনি।

—সমাপ্ত—

NOT FOR SALE